বাংলাদেশের হৃদয়-বীণা

গৌরীশ মুখোপাধ্যায়

মধুমিতা প্রকাশন
4/H2/133 হো-চি-মিন্ সরণী
কলকাতা - 700 061

BANGLA-DESHER
HRIDAY HOTE

বাংলাদেশের হৃদয়-বীণা

প্রকাশক : গৌরীশ মুখোপাধ্যায়
মধুমিতা প্রকাশন
4/H2/133 হো-চি-মিন্ সরণী
কলকাতা - 700 061

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫ সাল

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রক : আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লি
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা - ৯

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, বুকফ্রেন্ড, দেবসাহিত্য কুটির,
চক্রবর্তী, চাটার্জি এন্ড কোং

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	(ক)
২।	এপার থেকে ওপার	১
৩।	যশোরে সাগড়দাঁড়ী	৯
৪।	রূপসা থেকে মধুমতী	২৩
৫।	টুংগীপাড়া হয়ে বাগেব হাট	৪৬
৬।	কুষ্টিয়া	৬৫
৭।	বাংলার প্রথম দুর্গোৎসব (নাটোব,-দিঘাপাতিযা-তাহেরপুব)	৮৯
৮।	বগুড়া-মহাস্থানগড-পাহাড়পুব	১০৮
৯।	ঢাকা	১৩৩
১০।	জয়াগ (নোয়াখালি)	১৬২
১১।	সীতাকুণ্ড	১৮৩
১২।	চট্টগ্রাম-কক্সবাজাব-মহেশখালি	২০১
১৩।	শ্রীহট্ট	২২২
১৪।	আবাব ঢাকা	২৪৭
১৫।	উপসংহাব	।

জনাব হোসেন মীব মোশার্‌বফ্‌	শ্রীবীরেশ চন্দ্র সাহা
এম. এ (ইবেজি), এম এ (বাংলা)	সেল্‌স্‌ ম্যানেজার
এম এস. এস (বাষ্ট্রবিজ্ঞান) এল এল বি	বাংলাদেশ বীমা কর্পোবেশন,
জেনারেল ম্যানেজাব, বাংলাদেশ	ঢাকা,
জীবনবীমা কর্পোবেশন, ঢাকা,	১০৩, জগন্নাথ সাহা বোড
শিশু সাহিত্যিক	ঢাকা - ১২১১, বাংলাদেশ

সাদর উৎসর্গ

পরম প্রীতি ও স্নেহভাজন,

মোশাব্‌রফ ও বীবেশ, তোমাদেব সাদর আমন্ত্রণে গিযেছিলাম আমাব বহু-আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশে। বাংলাদেশ দেখতে আমাকে তোমরা সর্বপ্রকাবে সহাযতা করেছো। বলতে গেলে তোমরাই আমাকে বাংলাদেশ দেখিযেছো। তোমাদেব উদ্‌যোগেব ফসল তোমাদেবই হাতে তুলে দিলাম।

গৌরীশ মুখোপাধ্যায

লেখকের সাহিত্য কর্ম

১। নিজেরে হাবাযে খুঁজি (নাটক)
(ভারত সবকাবেব পুরস্কার প্রাপ্ত)

২। সুদূবেব পিযাসী (নাটক)
(ভাবত সবকাবেব পুবস্কাব প্রাপ্ত)

৩। সেতু বন্ধ (নাটক)
(ভাবত সবকাবেব পুবস্কাব প্রাপ্ত)

৪। নব সর্দাব (শিশু নাটক)
জাতীয সাহিত্য পবিযদ

৫। কুলেব পাতায় ভাত (শিশু নাটক)
জাতীয সাহিত্য পবিষদ

৬। বামমোহন (কিশোব নাটক)
জাতীয সাহিত্য পরিযদ

৭। বিদ্যাসাগব (কিশোর নাটক)
জাতীয় সাহিত্য পবিষদ

৮। কিশোব নাট্য সংগ্রহ
জাতীয সাহিত্য পবিষদ

৯। বাজা বামমোহন বায (জীবনী)
কিশেবা সংস্কবণ

১০। মানসী (উপন্যাস)
মধুমিতা প্রকাশন

১১। কুন্তিবৌদি (গল্প চযন)
মধুমিতা প্রকাশন

১২। জাবালি (উপন্যাস)
মধুমিতা প্রকাশন

১৩। তৃষ্ণা (উপন্যাস)
মধুমিতা প্রকাশন

১৪। লিঙ্কনের দেশে (ভ্রমণ)
মধুমিতা প্রকাশন

১৫। পরশুরাম ক্ষেত্র (ভ্রমণ)
মধুমিতা প্রকাশন

১৬। বাংলাদেশের হৃদয়-বীণা (ভ্রমণ)
মধুমিতা প্রকাশন

১৭। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী (শিশুনাটক)
মধুমিতা প্রকাশন

ভূমিকা

ছেচল্লিশেব ষোলই আগস্টের কথা মনে আছে ? সেই ডাইরেক্ট এ্যাক্‌শানের কথা ! অবশ্য বর্তমান প্রজন্মের মানুষ·যাঁদের বয়েস ষাট বছর বা তার কম তাঁদের মনে থাকার কথা নয়। এই ঘটনা তাঁদের কাছে শোনা-কথা মাত্র। শুনেছেন তাঁবা বাবা, কাকা, দাদা অথবা মা-কাকীমার মুখে। কিন্তু আমাদের বয়েসের যাঁরা সত্তর ছুঁয়েছেন বা পার হয়ে গেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সেই বিভীষিকার দিনগুলির কথা ভুলতে পারেন নি। ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট কলকাতাব বুকে নেমে এলো মানুষের মানুষ-মারাব কলঙ্কিত হাত। এক মানুষ আরেক মানুষেব বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় আমূল, অথবা একজন আরেকজনের মাথাটা নামিয়ে দেয় ধর থেকে। ষোলই আগস্টের পব কয়েকটা সপ্তাহ ধরে কলকাতায় চললো হিন্দু মুসলমানেব সে কী বীভৎস হানাহানি। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কটা আছে আমার জানা নেই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবশ্য কলকাতার মাটিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়লো সারা পূর্ববঙ্গে। সব চেয়ে ভয়াবহ আকাব ধারণ করেছিলো পূর্ব-বঙ্গের দক্ষিণপূর্ব সীমায় নোয়াখালী জেলায়। তাবই প্রতিক্রিয়ার আগুন জ্বলে উঠলো বিহাবেব ভাগলপুরে।

আমি তখন গ্রামে-থাকা এক কিশোর মাত্র। তবু এই সব ঘটনা-পরম্পরা আমার তরুণ মনে ভীষণ একটা আলোড়ন তুলে ছিলো। মনে হোতো, আমার তো অনেক বন্ধু রয়েছে। তাদেব অনেকে হিন্দু, অনেকে আবাব মুসলমানও। কিন্তু আমাদেব নামটুকু আলাদা ধরনের হওয়া ছাড়া আর তো কোন তফাৎ ছিলো না আমাদের মাঝে। আমবা এক ভাষায় কথা বলি, একই স্কুলে একই মাস্টারমশাই-এব কাছে পড়ি। আমরা একই মাঠে হাডুডু খেলি, ফুটবল খেলি। চলাফেরা, ভাবনা চিন্তায় আমরা ছিলাম এক। তবু হঠাৎ কোন্ শয়তানের যাদুদণ্ডের স্পর্শে আমরা এতো কালের, আজন্মেব বন্ধুত্ব ভুলে নিমেষে আমরা পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠলাম ! কেন সেই সব বন্ধুদের অনেকে বলতে থাকলো, নারে ! তোরা আর আমবা এক নয় ! তোদের থেকে আমরা আলাদা। আমরা পৃথক একটা জাত।

হায ভাগবান ! হায় আল্লা ! হায় গড্ ! নামে তুমি আলাদা হলেও নিত্যতায়-সত্তায় তুমিতো এক। তাহলে তোমার, একই পিতার, সন্তান হয়ে আমরা কেমন করে আলাদা জাত হয়ে গেলাম। উর্ধ্ব-মূল ধর্ম-বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে কবিয়াল গোমানি শেখ গেয়েছিলেন, আপন আপন ডাল ধরে উঠে যা তোরা। মূলে গিয়ে দেখবি তোরা এক। বাউল লালন ফকির তো অনেক আগেই গেয়ে গেছেন—সব লোকে কয় লালন কী জাত্ সংসারে। সংসারে, জাতেব কী রূপ দেখলাম না এ নজরে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর কঠোর সাধনালব্ধ উপলব্ধি-বলে বলে গেলেন,—নানা উৎস থেকে উত্থিত হয়ে নদীগুলি

নানা দেশকে করে সুজলা-সুফলা-শস্য শ্যামলা। তারপর পতিত হয় গিয়ে একই মহাসাগরে। তাঁরই সাধনালব্ধ ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে স্বামীজী বললেন সকল ধর্মের মধ্যে সত্য নিহিত। আপন আপন ধর্ম-নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে চল। দেখবে অন্তিমে তোমরা একই গন্তব্যে উপনীত।

তবু কেন এতো হিংসা-দ্বেষ। এতো ভেদাভেদ, এতো মারামারি, এতো হানাহানি। এতো সাধকের দীর্ঘ সাধনা সমন্বয় সাধনের। তবু কেন মানুষে মানুষে মিলন সাধিত হয় না। এতো মহামানবের কঠোর তপস্যা, তবু খেপা বাউল কেন কেঁদে বেড়ায়। কেন তাকে বুক ভরা খেদ নিয়ে গাইতে হয়—

"তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মসজেদে।
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়
বলতো গুরু, দাঁড়াই কোথায়
অভেদ-সাধন মরল ভেদে।"

এই সব ভাবনা নিয়ে সেই কিশোর বয়েসেই যখন আমার খেদের অন্ত নেই তখন শুনলাম, অহিংসার অনুসারী মহাত্মা গান্ধী এসেছেন সোদপুরে সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয়ের খাদি প্রতিষ্ঠানে। তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সদলবলে যাবেন নোয়াখলী। শান্তির বার্তা বহন করে শান্তির দূত পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবেন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে। মানুষের হৃদয় থেকে হিংসার কলুষতা নাশ করে মানুষের অন্তরে প্রেমের বীজ বপন করবেন এই আশা, এই বিশ্বাস নিয়ে। শুনেই,

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে, হৃদয়
নাচ রে।"

সত্যিই আমার হৃদয় ময়ূরের মতো নেচে উঠলো। স্থির করে ফেললাম, আমিও যাবো মহাত্মাজীর পিছু পিছু নোয়াখালী। হলেই বা, কাঠ-বেরালি। কাঠ-বেরালির মতো সামান্য একটা তুচ্ছ প্রাণীও তো শ্রীরামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের কাজে যোগ দিয়েছিলো। তাই দেখে শ্রীরামচন্দ্র আদর করে তার পিঠে হাত বুলিয়ে ছিলেন। আমার কতামা বলতেন সেইজন্যেই তো শ্রীরামচন্দ্রের হাতের আঙুলের দাগ দেখা যায় কাঠ-বেরালির পিঠে।

কিন্তু হায়। মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর এক। আমার যাত্রাপথে কোথা থেকে এসে মূর্তিমান বাধা হয়ে দাঁড়ালো ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মহাত্মাজীর পিছু পিছু আমার নোয়াখালী যাওয়া হোলো না তখন। সেই দুঃখ আজও আমার বুকে সমানে বাজে।

তবে আশার ব্যাপারও ঘটলো একটা। তখনকার মতো মহাত্মাজীর পিছু পিছু নোয়াখালী যাওয়া হোলো না ঠিকই। কিন্তু আমার মতো ঘটির দেশের মানুষের মনের মধ্যে বাংলাদেশ দেখার সাধ বীজের মতো উপ্ত হয়ে গেলো। ঘুমন্ত সেই বীজ আমার মনের অতলে রয়ে গেলো।

তাবপর অনেক ব্রছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দেশ ভেঙে হয়ে গেছে দুভাগ। পবে আবও ভেঙে হয়েছে তিনভাগ—ভাবত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। যে পূর্ববঙ্গ দেখতে চেয়েছিলাম সে দেশ এখন আর আমাদেব দেশ নয। ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ যেন দেখছি আমাব দেহেব আধখানা এখন আব আমাব নয। সে এখন অপবের দেশ। সে এখন বিদেশ। সেই পরদেশ থেকে হাজাবে হাজাবে লোক আসতে থাকলো শবণার্থী হয়ে। এই দেশ থেকেও হাজাবে হাজারে লোক চলে গেলো পূর্ব পাকিস্থানে, এখনকাব বাংলাদেশে।

পূর্ববঙ্গ তখন আর পূর্ববঙ্গ মাত্র নয। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াব পবে তাব নাম হোলো পূর্ব-পাকিস্থান। ধীবে ধীবে সেখানে কতো সমস্যাই না গজিয়ে উঠলো। সমস্যায সমস্যায জর্জাবিত। আজ ভাষা আন্দোলন তো কাল অন্য কিছু। আজ ভাবতের সঙ্গে যুদ্ধ তো কাল স্বাধীনতা যুদ্ধ। এমনি কবে পাকিস্থানেব কবলমুক্ত হযে পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্থান ঘুরে হযে উঠলো স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশ অনেকটা যেন আপন দেশ। এখন পবদেশ হলেও খুব একটা পব বলে মনে হয না সেই দেশটাকে।

কিন্তু বাংলাদেশ ঘুবে ঘুবে দেখে বেড়াবাব ক্ষমতা যে আমাব ক্ষীণ হয়ে এলো। বার্ধক্য প্রায আমাব দ্বাবদেশে এসে হাজিব। এখনো বাধার মুখে অনুবণিত বিদ্যাপতিব পদখানি আমাব হৃদয জুড়ে গুঞ্জন তুলেছে। হৃদয আমাব গেয়ে উঠতে চায—

"অঙ্কুব তপন— তাপে যদি জাবব
কি কবব বারিদ মেহে
এ নব যৌবন বিবহে গোঙাযব
কি কবব সো পিযা-লেহে ॥"

এমনি হতাশা যখন আমাব মনে, তখন একখানি আমন্ত্রণ পত্র পেলাম বাংলাদেশেব এক শিশু সাহিত্যিক এবং বাংলাদেশ বীমা কর্পোরেশনেব জেনাবেল ম্যানেজাব মোশার্‌বফ মীব হোসেন সাহেবেব কাছ থেকে। তাব সঙ্গে তখন আমার চাক্ষুষ পবিচয়ও হয়নি। মোশাব্‌বফ্ সাহেব আমাব "লিঙ্কনেব দেশে" পড়ে লিখলেন, "আপনাব গদ্য খুবই সুন্দর এবং অনুপম—পাঠকেব হৃদয ছুঁয়ে যায। আমাব বিশ্বাস আপনাব জানবাব মন আছে, অনুভব করাব হৃদয আছে এবং প্রকাশ করাব ভঙ্গী আছে। আপনি বাংলা সাহিত্যের গতিধাবাকে আবো এগিযে নিযে গেছেন। আপনি আমার আন্তবিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" মোশাব্‌বফ্ সাহেব আবো লিখলেন, "ঢাকায আসার কোন পবিকল্পনা আছে কিনা জানাবেন।"

তাঁব কিছু দিন পব কলকাতায় এলেন শ্রীবীরেশ চন্দ্র সাহা, বাংলাদেশ বীমা কর্পোরেশনের সেল্‌স্ ম্যানেজার। তিনি খোঁজ করে করে এলেন আমাব কাছে এবং জানিয়ে গেলেন বাংলাদেশে যাবার আন্তরিক আমন্ত্রণ। বলে গেলেন আবও, আপনি একবার ঢাকায় আসুন। তারপরেব সব ভার আমাদের। তাঁরা, মোশার্‌বফ্ সাহেব ও বীবেশ, সত্যি সত্যিই অনেক গুরুভার বহন কবে আমাকে বাংলাদেশ দেখিয়েছেন। কিন্তু সে কথা যথাস্থানে হবে।

এমন আমন্ত্রণের পর আর স্থির থাকা যায়! কবে সেই কৈশোরকালে পূর্ববঙ্গ যাবো স্থির করেছিলাম। যাবো যাবো করে আপেক্ষাই করে এলাম জীবনভর। এতোদিনেও যাওয়া আর হয়ে উঠলো না। এদিকে জীবন-রবি যে অপরাহ্ন বেলাও পার হতে চললো। অতএব, না ! আর অপেক্ষা নয়, ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি।

বাংলাদেশের হৃদয় বীণায় যে সুর শুনেছি তাই দিয়ে পরম শ্রদ্ধায় সাজিয়েছি এই গ্রন্থখানি। সাজাতে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারা চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দাস এবং শ্রীমান নিরঞ্জন দত্তের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে। নানাগ্রন্থ ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্রদ্ধাভাজন শ্রী হীরেন চক্রবর্তী। প্রীতিভাজন শ্রী মনীশ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র ভাণ্ডার থেকে গ্রন্থের নামটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। আর গ্রন্থখানিকে অর্থ বাহীরূপে রূপায়িত করেছেন প্রীতিভাজন শ্রীপূর্ণেন্দু রায়। অনুজপম শ্রী রথীন বিষ্ণুও অনেক মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ দেওয়ায় বর্তমান গ্রন্থটিকে তথ্য সমৃদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

আমি সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

গ্রন্থকার

প্রথম অধ্যায়

এপার থেকে ওপার

এপার থেকে ওপার যাবাব দুয়াবটুকু পার হতে তোমাব মনে কোনে সংশয় ছিলো না কবিগুরু। জীবন থেকে জীবনের ওপারে যাওয়া তোমার কাছে যেন ছোট্ট একটা নদীব এপাব থেকে ওপাবে যাওয়া। তুমি নিঃসংশয় পারাপাবেব মাঝি তোমাকে ঠিক পৌছে দেবে ওপারে। কিন্তু আমি তো তোমার পাযের ধূলিকণাটিও নই। তাই সামান্য এপাবের বাংলা থেকে ওপাবেব বাংলা যাওযার দুযাবেই আমি যেন পড়লাম মাঝ-দরিয়ায। আকুল হযে চেযে আছি কূলেব পানে। কে পৌছে দেবে সেখানে। এখানে তো খেযা মাঝিকে দেখি না।এখানে সবাই যে নজবদার। তাদেব অন্তর-ভেদী নজব পাব হয়ে যাবো কেমন করে।

ব্যাগ থেকে পাসপোর্ট-ভিসা হাতে নিতেই বুকে যেন বল পেলাম একটু। ভীতু মনটাকে কষে একটা ধমক দিয়ে বললাম, তুমি তো 'বেলাক'-এ যাচ্ছো না হে, বাপু। আর সঙ্গে তোমাব নিষিদ্ধ কোন বস্তুও নেই। তবে তোমাব এতো ভয়টা কীসেব। আব নজরদাব-বা-ই বা কববে টা কী। ছোট বেলায় মুখস্থ-করা কবিতাব সেই লাইনটি শোনাতে বললাম "বাবণ আমাব কী কববে মা নেই তো আমাব সীতা।" কিন্তু সীতা খুঁজতে যদি আমার বহু যত্নে গোছানো সুটকেশটি উলঢাল কবে দেয । না। সে সব কিছুই করলো না। আমার আপাদ-মস্তক নজর বুলিয়ে নজর-দার-ভাই ট্রাফিক পুলিশেব ভঙ্গিতে হাত দেখালো বাংলাদেশের পানে। আমি ভাবতের মাটি থেকে পা তুলে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম।

অমনি কোথা থেকে এক রিকসাঅলার আবির্ভাব হোলো। এই রিকসাঅলা-ই আমাকে তাবৎ বাংলাদেশ ঘুবিযে দেখাবে নাকি। সে এক মুখ হাসি নিযে বললে. আপনারে যশোর যাওনেব বাসে তুলি দেবানে।

এখানে কি বিকসা ছাড়া গতি নেই। বর্ডারের এপার-ওপাব কবার পারের-নেয়ে কি কেবল বিকসাঅলা ! ভেবেছিলাম বনগাঁযে ট্রেন থেকে নেমে দু'পা ফেললেই বুঝি ভারত-বাংলাদেশেব বর্ডার পেয়ে যাবো। বনগাঁযের রিকসাঅলাকে পঁচিশটি টাকা গুণে দিযে সেই ভুলটি ভাঙাতে হয়েছে আমাকে। আবার বর্ডাব পার হয়েও সেই বিকসা । বারোটি টাকা বিকসা ভাড়া গুণে তবে যশোর-খুলনাব বাস।

কিন্তু এ কি দেখছি ! এ কোন বাস ! এ বাস তো আমাদের দেখা বাস নয় ! বেশ গাঁট্টা-গোঁট্টা, ছোটো-খাটো সাইজ। বাসে উঠেই ভিতরে মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে ড্রাইভারের কাছ থেকে পিছন পর্যন্ত। বাসের ভিতর সেই পথের দুপাশে দু'খানি করে গদি-আঁটা চেযার মখমলের ঢাকনায় মোড়া। জানালায় দামী কাপড়ের পর্দা। কানের পর্দা-ফাটানো আওয়াজ তুলছে না। অথচ ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। আর রাস্তার কথা যদি ওঠে তাহলে বলতেই হবে কোথাও পাথর-চটা গর্ত নেই। বেশ চওড়া রাস্তাটি হলুদ রঙের

দাগ কেটে আপ-ডাউন ভাগ কবা। কোথাও বা দাগেব বদলে ইট-বাঁধানো সরু কেযাবিতে সুদৃশ্য ফুলেব গাছ লাগিযে বাস্তাকে আপ-ডাউনে ভাগ কবা। এবা কি বাসেব সঙ্গে বাস্তাও কিনে এনেছে ইউবোপ আমেবিকা কিংবা জাপান থেকে।

এই বাস্তা আব বাসেব কল্যাণে ঘণ্টা দেডেকেব মধ্যেই পৌঁছে গেলাম যশোবে। যশোব সেন্ট্রাল বাস-স্ট্যান্ডে। কিন্তু বাস থেকে নেমেই চক্ষু চবকগাছ হবাব উপক্রম। বাস-স্ট্যান্ড থেকে বেরুবো কীভাবে। যেতে হবে মাইকেল মধুসূদন কলেজে। সেই কলেজেব অধ্যাপব শেখ মোহম্মদ ইলিযাসেব কাছে যিনি আমাব বাংলাদেশ দেখাব প্রোগ্রাম ছকে দেবেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন কলেজ কোথায। আব সেই কলেজে যাওযাই বা কীভাবে।

এইসব ভেবে যখন আকুল এক বিকসাঅলা এসে দাডালো সামনে। বললে কো'নে জাবেন (যাবেন) কত্তা। বললাম, বা'জান। তুমি মাইকেল মধুসূদন কলেজ চেন? একগাল হেসে বিকসাঅলাটি বললে, তা আব চিনুম না। উঠেন কত্তা উঠেন। বলেই তাব বিকসাখানিব সিট্-এ একটি চাপড মাবলো আলতো কবে।

বিক্সাঅলা তাবপব নানা পথ ঘুবে শহবটাব একপাশ থেকে আমাকে নিযে অন্যপাশে হাজিব কবলো। বড়ো একটা গেটেব সামনে এসে বললো, নামেন কত্তা। আগে পডছি। বিকসায বসেই গেটেব মাথায লেখাটি পডে দেখি মাইকেল মধুসূদন কলেজ ছাত্রাবাস। বিকসাঅলাকে বললাম, আবে এ তো ছাত্রাবাস, হস্টেল। আব আমি তো যাবো কলেজে। বিকসাঅলা বললে তাইলি আপনে এম এম কলেজ না বলে মাইকেল মধুসূদন কলেজ বললেন ক্যান।

এমন সময হস্টেল থেকে দুটি ছাত্র বেবিযে এলো এবং বিকসায বসা আমাকে দেখে থমকে দাঁডালো। বললাম, ভূগোলেব অধ্যাপক শেখ মোহম্মদ ইলিযাস সাহেবেব বাডিব ঠিকানা কি জানো তোমবা।

এখানে বলে বাখি, আমি বাংলাদেশ দেখতে যাবো শুনে "মিত্র ও ঘোষ' এব প্রধান পবিচালক শ্রী সবিতেন্দ্র নাথ বায আমাকে অধ্যাপক ইলিযাসেব ঠিকানা দিযে বলেছিলেন' অধ্যাপক ইলিযাস আপনাকে বাংলাদেশ দেখাব ব্যাপাবে নানা ভাবে সাহায্য কবতে পাববেন।

আমি অধ্যাপক ইলিযাস সাহেবেব বাডিব ঠিকানা জানতে চাইলে ছেলে দুটি বললো, আমবা তাঁব বাডিব ঠিকানা জানি না। তবে স্যাব-এবা বলতে পাববেন নিশ্চযই এই কম্পাউন্ডেব মধ্যেই স্যাবদেব হস্টেল আছে। আপনি আমাদেব সঙ্গে আসুন, দেখিযে দিচ্ছি। আমি বিকসাঅলাব প্রাপ্য মিটিযে দিযে ছেলে দুটিব পিছু ধবলাম এবং অবিলম্বে প্রভাষক (Lecturer)-দেব হস্টেলে এলাম।

আমাকে দেখেই হস্টেলেব বিভিন্ন ঘব থেকে বেডিযে এলেন কযেক জন তরুণ প্রভাষক। আমি কলকাতা থেকে এসেছি এবং আমাব আসাব উদ্দেশ্য শুনে তাঁবা বললেন আপনি আমাদেব হস্টেলে এসে উপস্থিত বিশ্রাম করুন। তাঁদেবই একজনেব নাম জোলজাব বহমান্। তিনি ইলিযাস সাহেবেব ভূগোল বিভাগেব-ই প্রভাষক। জোলজাব বহমান বললেন,

স্যার (অধ্যাপক ইলিয়াস) সাতক্ষীরা গেছেন পরীক্ষা নিতে। আগামী কাল তাঁর ফিরে আসার কথা। সুতরাং আগামী কাল সন্ধ্যায় আপনি তাঁর বাড়ি যাবেন। ছোল্‌জার রহমানের বন্ধু খলিলুর রহমান বললেন, সেই ভালো। আপনি তো আমাদের হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা দেখছেন। যদি নিতান্ত অসুবিধে বোধ না করেন তাহলে আপনি আমাদের হস্টেলেই থাকুন।

আমি এতোক্ষণে কথায়-বার্তায় ওদের সঙ্গে সহজ হয়ে উঠেছি। ওরা আমার ছেলের বয়েসী। তাহলে কাঁহাতক ওদের সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলা যায়। এক সময় 'আপনি' থেকে নেমে এলাম 'তুমি'তে। আমি বললাম, যশোর এবং যশোরকে কেন্দ্র করে তার চারি পাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে আমার কম হলেও চার-পাঁচ দিন লাগবে। এতোদিন এখানে থেকে তোমাদের ওপর চাপ দিতে সঙ্কোচ বোধ করছি। তাই বলছিলাম যদি নির্ভরযোগ্য একটা হোটেল . আমার কথা আর না শুনে ছোল্‌জার বললে আপনি নিজের চোখেই আমাদের এখানকার সব ব্যবস্থা দেখছেন। এই ব্যবস্থায় আপনার যদি নিতান্তই অসুবিধে না হয় তাহলে আপনি এখানেই থাকুন। আপনি হোটেলে থাকতে যাবেন কেন। আমরা তো আপনার ছেলের মতোই।

এরপর আর কথা চলে না। তা সেই ব্যবস্থাই হোলো। আমি প্রভাষকদের হস্টেলেই থাকবো ঠিক হোলো। ওরা আমাকে একটা সিট (খাট) ছেড়ে দিলো। রাতে খেলাম হস্টেলের খাবার ঘরে। ওদের রান্না করার জন্যে একজন রাঁধুনী আছে। সে রান্না করে খাবার-দাবারগুলো খাবার ঘরে টেবিলের ওপর রেখে দেয় বড়ো বড়ো চিনামাটির গামলায়। পাশে থাকে হাতা চামচ ডাবু ইত্যাদি। ঘরের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বেসিন ও জলের কল। তার পাশে একটা টেবিলে চিনামাটির প্লেট বাটি ইত্যাদি। প্রত্যেকে এক একটা প্লেট ও বাটি নিয়ে এসে বসলাম। হাতা চামচ ও ডাবু করে ভাত ডাল ও তরকারি নিলাম নিজে নিজেই, নিজের প্রয়োজন মতো। খানিকটা 'বুফে' ব্যবস্থা আর কি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে শুয়েছি। ওপাশে খলিলুর তার বিভাগে প্রবেশার্থীদের পরীক্ষার খাতা দেখে চলেছে। ছোলজার ও তার বন্ধু-বান্ধবেরা চাপাগলায় খানিক হাসি মস্করা করে ক্লান্ত। সারাদিনের শ্রম উদ্বেগ আমার শরীরে মনে লেগে আছে। আমি অবসন্ন। তবু আমার ঘুম আসছে না। যতোটুকু ক্লান্তিতে দ্রুত ঘুম আসে চোখে, ক্লান্তির পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেছে বোধ হয়। হঠাৎ অদ্ভুত একটা অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসলো। মনে হোলো হাজার-কোটি বছর পিছিয়ে গিয়ে সুদূর এক অতীতকালে এসে হাজির হলাম। দেখি, উত্তরের হিমালয় পশ্চিম থেকে এসে পূর্বে চলে গেছে। তারপর হঠাৎ দক্ষিণদিকে মুখ ঘুরিয়ে পটকই নাগা লুসাই ইত্যাদি নামে চলে গেছে বঙ্গোপসাগরে। তারপর লম্বা একটা ডুব-সাঁতার কেটে হুস্‌ করে মাথা তুলে হয়েছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ওদিকে পশ্চিম থেকে ছোটনাগপুরের মালভূমি ক্রমাগত এগিয়ে এসেছে আজকে যেখানে দুর্গাপুর সেখান পর্যন্ত। তিনদিকে পর্বত ও মালভূমির পাঁচীল দিয়ে ঘেরা বঙ্গোপসাগরের বিশাল খাঁড়ি। সেই বিশাল খাঁড়িতে জল ঢালছে পশ্চিমদিক থেকে বয়ে আসা গঙ্গা-

ভাগীরথী, উত্তরদিক থেকে আসা ত্রিস্রোতা এবং পূর্বদিকের ব্রহ্মপুত্র। আর তাদের জলের সঙ্গে বয়ে আনা পলিমাটি হাজার-কোটি বছর ধরে জমা হতে থাকলো। বিশাল খাঁড়িটা এলো বুঁজে। সাগরের জল গেলো আরো দক্ষিণে সরে। স্থলভূমি মাথা তুলে দাঁড়ালো। সেই স্থলভূমি নানা যুগে নানা নামে ভূষিত হয়ে, রাজনীতির নানা উত্থানপতন পার হয়ে আজ হয়েছে বাংলাদেশ।

এই পলিময় ভূমির পরিবর্তনও কম হয়নি। অসংখ্য নদী ও তাদের শাখানদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে গড়ে ওঠা খাঁড়িময় ভূভাগের রূপ বদলে গেছে কতোভাবে। এই ভূ-ভাগের দক্ষিণ অংশে বর্তমান যশোর-খুলনা-সাতক্ষীরা-বাগেরহাট-নড়াইল প্রভৃতি অঞ্চল কতোবার এলোমেলো হয়ে গেছে। প্রাচীন যুগে এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ কতো জনপদ গড়ে উঠেছে। আবার কখনো বা সেইসব জনপদ নদীগর্ভে গেছে বিলীন হয়ে। কখনো সাগব-খাঁড়ি ভরাট হয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন ভূভাগ। তার উপর সৃষ্টি হয়েছে গভীর অরণ্য। বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগ বলে পবিচিত সময়ে এই পরিবর্তনগুলো হযেছে সবচেযে বেশি করে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রযোদশ শতক পর্যন্ত সময়ে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা বহু সমৃদ্ধ জনপদেব ধ্বংসাবশেষ নিত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। এই অঞ্চল ছিলো উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত এবং নাম ছিলো ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল। এখানকার সমুদ্র-উপকুল অঞ্চলে এখনকার সুন্দববনের মতোই গভীর অরণ্য ছিলো এবং সেই সব অরণ্য ছিলো ব্যাঘ্র অধ্যুষিত। ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল নামটি সেই ইঙ্গিতই বহন করছে।

সুলতানী আমলে এই অঞ্চলে আবার বসতি স্থাপন শুরু হয়। যুসুফ্‌শাহ, সৈযদ হোসেন সাহ, নসরৎ সাহ প্রভৃতি সুলতানগণ সমুদ্র উপকুলের বনভূমি পরিষ্কাব কবে বর্তমান খুলনা যশোব সাতক্ষীবা বাগেরহাট নড়াইল অঞ্চলে নতুন চাষ আবাদের ব্যবস্থা কবেছিলেন। তখন থেকেই নতুন করে আবার জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। অবশ্য তাবপব যে আবার ধ্বংশেব তাণ্ডবলীলা চলেনি তা নয়। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রবল বন্যায় খুলনা-যশোব অঞ্চলে অসংখ্য ঘববাড়ি এবং নৌকা ধ্বংস হয়। প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয। তাব ওপর ছিলো মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদেব তাণ্ডব। ফলে এই অঞ্চলের অনেকখানি আবাব জনশূন্য হযে গভীব অবণ্যে পরিণত হয়। পবে এই পলিমাটির উর্বর ভূমিতে আবার মানুষ এসেছে। বন কেটে বসত করেছে তাবা। মোগল আমল থেকেই এই অঞ্চল আবাব ধনে জনে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই স্থানে বঙ্গভূমির মানুষজনদেব একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকাব অধিবাসীবা তথা রাজশক্তি বরাববই স্বাধীনতা প্রিয। গৌড়-বঙ্গেব প্রাচীন রাজারা প্রবলপ্রতাপ মৌর্য এবং গুপ্তসম্রাটদের কাছে সামবিক শক্তিতে পরাভূত হয়ে অনেক সময় তাঁদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সুযোগ পেলেই বাইরেব বাজশক্তিব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। রাজা শশাঙ্ক তো একহাতে থানেশ্বর বাজ হর্ষবর্ধনকে ঠেকিয়েছেন, অন্যহাতে কাম-রূপরাজ ভাস্করবর্মাকে দূবে রেখেছেন। আব পালরাজাদের তো কথাই নেই। তাঁরা গৌড়বঙ্গেব আধিপত্য বিস্তার কবেছিলেন সাবা উত্তব ভারতে।

অবশ্য সুলতানী বা মুঘল আমলে গৌড়বঙ্গে কেন্দ্রীয় কোন রাজশক্তি ছিলো না। তখনকার বঙ্গভূমি অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। সেইসব ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের রাজা না বলে বড়ো জমিদার বলাই ভালো। তবু এইসব রাজা বা জমিদাররা, তা তাঁরা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, দিল্লীর সুলতান অথবা মুঘল সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করতে চাননি। বারে বারেই তাঁরা বিদ্রোহ করে দিল্লীর রাজশক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে ঈশা খাঁ মুশা খাঁ, চাঁদ রায়, কেদার রায়, রাজাপ্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বার ভুইঞাদের বিদ্রোহের উল্লেখ করা যেতে পারে।

আজ আমি যেখানে এসেছি সেই যশোরকে কেন্দ্র করে যশোর, খুলনা, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা প্রভৃতি জেলার দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবো। মুঘল আমলে এই অঞ্চলের উত্তরাংশে ছিলো ভূষণা। এই ভূষণার রাজা ছিলেন কেদার রায়। তখন দিল্লীর মসনদে সম্রাট আকবর। রাজা কেদার রায় দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে সম্রাট আকবর কেদার রায়ের বিদ্রোহ দমন করতে সুবে বাংলার সুবেদার করে পাঠালেন রাজা মানসিংহকে। মানসিংহ খুব সহজে এই বিদ্রোহ দমন করতে পারেননি। অনেক বেগ পেতে হয়েছিলো তাঁকে।

মানসিংহের কথা মনে হতেই বছর কয়েক আগে দেখতে যাওয়া আম্বের দুর্গের কথা মনে পড়লো। বর্তমান রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের কয়েক মাইল দূরে এই আম্বের দুর্গ মানসিংহ নির্মাণ করেছিলেন। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই দুর্গে যেতে হলে অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়। তারপর পর পর দুটো বিশাল তোরণ পার হলে পাওয়া যায় সুন্দর একটি পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের অপর পারে আবার একটি সোপান শ্রেণী যার মাথায় যশোরেশ্বরীর মন্দির। এই মন্দিরের দরজার পাশে বিরাট এক মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে—

This image was brought by Maharaja Mansingh from the eastern part of Bengal in the last quarter of the 16th century A D While in an encounter with the rular Kedar Maharaja Mansingh did not get success for the first time and he prayed for success to the Goddess Kali The Goddess gave him a vision in dream and took from him a promise for her salvation from the lot She was then subjected to as a slab (Shila) As a result of the promise given by Maharaja the Goddess blessed him with the victory in the forthcoming battle This stone image lying in the sea in the form of a slab was taken out and brought by the Maharaja at Amber There it became popular by the name of Shila Devi

Some say that the Ruler Kedar (of Bengal) after his defeat had married his daughter to Maharaja Mansingh and presented this image to him

' The Goddess is named locally as 'Shila Devi', but called Jessoreswari' by the Bengalees

উপরি উক্ত মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ কাহিনীটির সঙ্গে মহারাজা মানসিংহের বাংলা জয়ের ইতিহাসের অনেক মিল আছে। কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটিতে বর্ণিত কাহিনীটি সংশয়াতীত

নয। ঐতিহাসিক প্রভাস চন্দ্র সেনের 'বাংলার ইতিহাস'-এ মানসিংহেব ভূষণা (যশোব) দখলেব কাহিনী এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায। প্রভাস চন্দ্র সেন লিখেছেন—

"বাজা মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দেব ৪ঠা মে সুবে বাংলাব সুবেদার এবং সুবে বাংলাব জায়গীব পাইয়া তাঁহাব নতুন সুবেদাবী-কার্যে যোগ দিলেন। ইতিপূর্বে ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দেব ১১ই ফেব্রুয়ারী উত্তর উড়িষ্যার নেতা কতলু খাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেমান ও ওসমান ভূষণায (যশোব জেলায়) তাহাদেব আশ্রয় দাতা কেদার বাযের পুত্র চাঁদ বাযকে হত্যা করিযা ভূষণা দখল কবে। .

"মানসিংহেব পুত্র হিম্মত সিংহ ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল ভূষণা দূর্গ অধিকাব করেন। তার কিছু দিন পর খাজা সুলেমান লোহানি ও কেদার বায় ভূষণা দুর্গ পুনবায় দখল করেন। কিন্তু ১৫৯৬ খ্রীস্টচাব্দে ২০শে জুন মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ভূষণা পূনর্দখল করেন। সুলেমান নিহত হন এবং কেদার রায় আহত হইয়া ঈশাখাঁর নিকটে পলাযন করেন। .

"১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে কেদার রায তাঁহাব বিপুল নৌবহর লইযা মগেদেব সহিত যোগদান করেন এবং শ্রীনগবের মোগল সেনানিবাস আক্রমণ কবেন। মগেবা ঢাকাব জলপথ অবরোধ কবিয়া মোগল শিবিব আক্রমণ কবে। বিক্রমপুবেব নিকট ভীষণ যুদ্ধে কেদাব বায স্বযং আহত ও বন্দী হন। কিন্তু তাঁব আহত দেহ মান সিংহেব নিকট নীত হইবামাত্র তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।"

এই তথ্য অনুযায়ী, কেদার বায় মানসিংহেব সঙ্গে কন্যার বিবাহ এবং সেই উপলক্ষে রাজাকে যশোবেশ্বরী-প্রতিমা উপহাব দেবাব সুযোগ পান নি। আবার ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে দুর্জন সিংহের নিকট পরাজিত হযে যদি কেদার রায রাজা মানসিংহেব সঙ্গে কন্যাব বিবাহ এবং তাঁকে যশোরেরশ্ববী প্রতিমা উপহার দিতেন তাহলে তাঁব ঈশা খাঁর নিকট পলাযনেব কারণ থাকে না। এই তথ্য থেকে আরও একটা বিষয জানা যায়। যশোরেব বাজা কেদাব রায় দিল্লীর অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যু বরণকেও শ্রেয মনে কবেছেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবে বাংলার সুবেদার হয়ে এলেন প্রসিদ্ধ দববেশ সেলিম চিস্তির পৌত্র ইছলাম খাঁ ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর সুবেদারীব সময় এই যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রবল হয়ে ওঠেন রাজা প্রতাপাদিত্য যাঁব কাহিনী সমসাময়িক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ইতিহাস ছাড়াও প্রতাপাদিত্যের নাম অক্ষয় হযে আছে সমসামযিক কাব্য-উপন্যাসে। এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে সম্পৃক্ত অংশ উদ্ধৃত করা যায়।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নামি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তাঁয়
ভযে যত নৃপতি দ্বাবস্থ ।।

বরপুত্র ভবানীব প্রিযতম পৃথিবীব
বায়ান্ন হাজাব যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হল্‌কা হাতি অযুত তুবঙ্গ সাদী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ।।
তাব খুড়া মহাকায আছিল বসন্ত বায
রাজা তাবে সবংশে কাটিল।
তাব বেটা কচুবায বানী বাঁচাইল তায়
জাহাঙ্গীবে সেই জানাইল ।।
ক্রোধ হইল পাতশায় বাঁধিযা আনিতে তায়
বাজা মানসিংহে পাঠাইল।
.. ..
পাতশাহি ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মাবে।
বিমুখী অভযা কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হাবে ।।
শেষ ছিল যারা পলাইল তারা
মান সিংহে হইল জয়।
পিঞ্জব করিযা পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপ আদিত্যে লয ।।
. ...
প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহাবে ।।

কবি ভাবত চন্দ্র বায়গুণাকর রচিত 'অনন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকে উপবি-উদ্ধৃত অংশের পর ঐতিহাসিক প্রভাস চন্দ্র সেন মন্তব্য কবেছেন, "খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের ঘটনা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে জনশ্রুতিতে কিরূপ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, কবি ভারত চন্দ্রের বিবরণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহেব নাম বামচন্দ্র। তিনি সপ্তগ্রামে কানুনগো দপ্তরে কাজ করতেন। তাঁর তিনপুত্র—ভবানন্দ, গুণনন্দ এবং শিবানন্দ। তাঁরাও পিতার ন্যায় কানুনগো দপ্তবে কাজে নিযুক্ত হন। ভবানন্দেব পুত্র শ্রীহরি এবং গুণানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ দাউদ খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। দাউদ খাঁ পরে গৌড়েব অধিপতি হলে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ তাঁর উজির নিযুক্ত হন। পরে শ্রীহবি বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। দাউদ খাঁ তাঁর প্রিয় উজিব বিক্রমদিত্য (শ্রীহবি) কে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন অঞ্চলে অবস্থিত যশোরেব জায়গীব দান করেন। তখন যশোব অঞ্চল ছিল অরণ্যময়। বিক্রমাদিত্য

সেই অবণ্য পরিষ্কার করে রাজ্য স্থাপন করলেন। এই রাজ্যের পূর্বে মধুমতী নদী, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী। বিক্রমাদিত্য তাঁর এই নতুন স্থাপিত রাজ্যে নূতন একটি নগর নির্মাণ করলেন। বিক্রমাদিত্য প্রতিষ্ঠিত সেই নগরটিই কি যশোর, আজ প্রায় চাব শতক পরে যেখানকার মাইকেল মদুসূদন কলেজের প্রভাষকদের হস্টেলে আমি রাত্রি যাপন করছি!

গৌড়েশ্বর দায়ুদের মৃত্যু হলে বিক্রমাদিত্য ও জানকীবল্লভ টোডব মলের কাছে যান এবং সুবে বাংলার জরীপ সংক্রান্ত কাগজপত্র টোডরমল্লকে বুঝিযে দেন। তাহলে এই জানকীবল্লভ-ই কি পরে রাজাবসন্ত রায নামে পরিচিত হন৷ যাই হোক, টোডব মল্লের সুপারিশে সম্রাট আকবর বিক্রমাদিত্যকে যশোব রাজ্যের জমিদারী দান করেন।

বিক্রমাদিত্যেব পুত্র প্রতাপাদিত্য পিতাব মৃত্যুব পর আগ্রা যান। তিনি পারসী ভাষা ভালো করেই জানতেন। অস্ত্র বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এইসব কাবণে প্রতাপাদিত্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশেষ প্রিযপাত্র হয়ে উঠলেন। সম্রাট তাঁকে যশোবেব জমিদারী সনদ দান কবলেন।

প্রতাপাদিত্য দীর্ঘকাল রাজত্ব কবে অপবিমিত ধন সঞ্চয কবলেন। তাঁর সৈন্যবলও অপবিমিত ছিলো। আবাব নিজেও ছিলেন বণপণ্ডিত। তবু এতো ধনবল, সৈন্যবল এবং গুণাবলী থাকলেও পরবর্তীকালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁব প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন। সম্রাট আকবব তখন পরলোকে। মসনদে জাহাঙ্গীর। আর বাংলার সুবেদার ইছলাম খাঁ। এই ইছলাম খাঁব সঙ্গে যুদ্ধ বাধে বার-ভূইঞাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ঈশা খাঁব পুত্র মুশা খাঁর।

মুশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের সাহায্য চাইলেন ইছলাম খাঁ। কিন্তু মিত্র মুশা খাঁব বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবতে রাজি হলেন না প্রতাপাদিত্য। ফলে সুবেদার ইছলাম খাঁব শত্রুতে পরিণত হলেন তিনি৷ কিন্তু ইছলাম খাঁ খুব সহজে দমন করতে পারেননি শক্তিমান ও রণপণ্ডিত প্রতাপাদিত্যকে। দীর্ঘকাল ধবে নানাস্থানে যুদ্ধ চলেছিলো। অবশেষে সেনাপতি জামাল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করে মোগল বাহিনীতে যোগ দিলে প্রতাপাদিত্য ইছলাম খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

ইছলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য বাজেয়াপ্ত করলেন। তারপর বন্দী প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে তাঁর পুত্রগণকেও বন্দী করে দিল্লি পাঠানো হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীব প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যে কী ঘটেছিলো জানা যায় না। লোকপ্রবাদ, দিল্লী নিয়ে যাবার সময় কাশীতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃতদেহ ঘিয়ে ভেজে জাহাঙ্গীরের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এতো সব রাজা-বাদশার বিবাদ-সুবাদের কথা আমার মতো এক উলুখাগড়ার ছোট্ট মাথায় ধরবে কেন। তাই ধারণ করতে না পেরে মাথাটি আমার কখন যে বালিসে এলিয়ে পড়েছে টেরও পাইনি। টের পেলাম সকাল হলে। ঘুম ভাঙলে জানতে পারলাম কাল রাতে কখন আমি আমার অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"যশোরে সাগর দাঁড়ী ..."

যশোরে দেখছি, পবে বাংলাদেশেব অন্যসব শহবেও দেখেছি, বাস্তাব মোড়ে মোড়ে, বাস্তাব তেমাথায়-চৌমাথায়, বেশ 'সাজু-গুজু' করে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাফিক পুলিস। বিচিত্র তাদের পোশাক। আমাদেব দেশেব পুলিসেব মতো সেই আদ্দিকালেব খাঁকি আর সাদা জিন-কাপড়ে তৈরি একঘেয়ে পোশাক নয়। বিচিত্র এই পোশাক-পরা পুলিসের পানে পথ-চাবীব চোখ পড়বেই।

পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামবুটেব মতো কালো বঙের জুতোয় তার পা-দুটো ঢাকা। তফাতের মধ্যে গাম-বুট খোলামেলা। কিন্তু ট্রাফিক পুলিসের জুতো পায়ের সঙ্গে টাইট কবে আঁটা। পবনে অবশ্য খাঁকী কাপড়েব প্যাণ্ট। গায়েব জামাটি কিন্তু বিচিত্র। জামাব ধরনটি সব শহরে এক রঙের নয়। কোন শহবে আকাশী নীল, কোন শহরে পাঁশুটে, আবাব কোন শহবে অন্য কিছু বঙের। জামার হাতা দুটি কিন্তু সর্বত্র সাদা। বোধ হয ট্রাফিক পুলিসের বাড়ানো হাতদুটি যেন গাড়িব চালকেবা সহজেই দেখতে পায় সেইজন্যেই সাদা রঙের হাতা বানানো হয়েছে তাদের জামার। মাথায নেপালীদেব মতন টুপি। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ট্রাফিক পুলিসের পোশাক মন্দ নয় দর্শনে ও কাজে।

আমাদের দেশে পুলিসেব পোশাক ইংবেজ আমলে যেমন ছিলো স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও তেমনি আছে। অনেকে বলবেন তাতে কি এমন ক্ষতি হয়েছে। একটু তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায ক্ষতিটা কোথায হযেছে। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে পোশাকের মিল থাকে। এটা কেবল ব্যক্তি ক্ষেত্রেই সত্য নয সমষ্টির ক্ষেত্রেও সত্য। তাই আজও দেখা যায় ইংরেজ আমলে জনসাধারণেব সঙ্গে যেমন আচরণ করতো পুলিস আজও তেমনি আচরণ করে চলেছে। পুলিস যে সাধারণ মানুষের সেবক, তাদের বক্ষক, এবং তাদের ভক্ষক নয়, আচরণেব দ্বারা আমাদের পুলিস আজও তা দেখাতে পারেনি।

অবশ্য পুলিসের এই আচরণের গভীরে আবও একটা বিষয কাজ করে। আমাদের দেশের পুলিস স্বাধীনতা যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের হয়ে কাজ করেছে। স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন কবেছে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। তাই পুলিস যেমন দেশের মানুষের আপন হতে পারে নি, জনসাধারণও তেমনি পুলিসকে নিজের বলে ভাবতে পাবে না। দেশের মানুষ এবং পুলিসের মধ্যে বিস্তব ব্যবধান থেকেই গেছে।

কিন্তু বাংলাদেশের পুলিস পাকিস্থানের কবল থেকে মুক্তি যুদ্ধে জনসাধারণের হয়ে যুদ্ধ করেছে। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই দেশের মানুষও পুলিসকে নিজের করে নিতে পেরেছে। আর তাদের পোশাকের পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে হলেও তাদের মনে একটা পরিবর্তন

আনে। এখন আর তারা বিদেশী শাসকের বাহিনী নয়, স্বাধীন দেশেব বক্ষক এই বোধটি গাঁথা হয় পুলিসের অন্তবে।

রিকসাঅলা বললো, আমরা বাসের ইস্‌ট্যান্ডে আসে পড়ছি বাবু। রিকসা থেকে নামতে নামতে বললাম, আসে তো পড়ছ। অহন সাতক্ষীবে যাওনেব বাস পাই কো'নে। এযে দেহি বিচুলির গাদা। এহানে সুই খুঁজি পাওযা কি মুহের কথা। ঝামরুকুলিব বউকে খুঁজে পেতে বিনুর স্বামীকে দার্জিলিং খসরুবাগ কিংবা আবাকানেব কথা শুনতে হয়েছিলো। সাতক্ষীবাব বাস খুঁজতে আমাকে কোন্ কোন্ জাযগার কথা শুনতে হবে কে জানে। না, সে সব কিছু শুনতে হোলো না। বাসস্ট্যান্ডেব এদিক থেকে ওদিক বার দুই যাওয়া-আসা করে আর জনা-পাঁচেক বাস কন্‌ডাক্টবকে জিজ্ঞেস কবে পেয়ে গেলাম আমাব বাঞ্ছিত বাস। এমনকি কপাল গুণে বসাব সিট্‌ও পেযে গেলাম একখানি।

নামতে হবে কেশবপুরে। যশোর জেলাব একটা থানা কেশবপুর। প্রশাসনিক সুবিধের জন্যে যেমন আমাদেব পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকে সতেরাটি জেলায, জেলাগুলোব মহকুমায এবং মহকুমাগুলোকে আবার থানায ভাগ করা হয়েছে। এদেশেব ভাগ কিন্তু তেমন নয। বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গের মতো কোন একটা রাষ্ট্রের প্রদেশ মাত্র নয। বাংলাদেশ নিজেই এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীন প্রদেশ মাত্র নয়। পাকিস্থানেব কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাংলাদেশেব সবকাব এই দেশের জেলাগুলোব অন্তর্গত যতো মহকুমা ছিলো সেই মহকুমাগুলোকে জেলাস্তরে উন্নীত কবে দিয়েছে। মহকুমা বলে এখন আব কোন প্রশাসনিক বিভাগ নেই। তাবা পেয়েছে জেলাব মর্যাদা। তার ফলে বাংলাদেশে এখন মোট চৌষট্টিটি জেলা আছে। জেলাগুলি আবাব থানায বিভক্ত। অর্থাৎ থানাগুলি এখন জেলাব ঠিক নীচেব স্তব। আমার উপস্থিত গন্তব্য কেশবপুব সেইরূপ একটি থানা।

লোকাল বাস। প্রতি লোকালযে থামছে আব উঠানামা করছে যাত্রীবা। জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম। চোখ অমনি আটকে গেলো। দেখি, ডালে ডালে লালফুলেব পসবা সাজিযে দাঁডিযে আছে আমার কতোকালেব চেনা গাছটা। পলাশগাছ। পলাশগাছ আমার মোটেই অচেনা নয। বাংলাব পশ্চিম সীমান্তে কাটিযে এসেছি দীর্ঘকাল। আমার জীবনেব সর্বোত্তম দিনগুলি। সেই বাংলা-বিহাবী-মেলামেশাব রুক্ষ পাথুবে মাটি দিযে গড়া পল্লী ও প্রান্তবে শাল মহুয়া পলাশ-এর ঝোপ পড়ে থাকে অযত্নে। সারাটা বছব অবহেলায কাটিয়ে কন্‌কনে শীতেব শেষে যেই সেজে ওঠে লাল সাদা ও বেগুনী ফুলে, মহুয়ার গন্ধে ম ম কবতে থাকে শ্রীহীন প্রান্তর, অমনি সবাব চোখ আটকে যায় বিশেষ করে থোকা থোকা পলাশ ফুলের দিকে। এমন নযন-ভোলানো, মনমাতানো রং কী কবে বার হয়ে আসে ছাই বঙের গাছগুলো থেকে। এতো দিন ডালের অভ্যন্তবে বসন্তের অপেক্ষায় ছিলো। শীতের শেষে বসন্ত আসাব খবব পেলেই ডালেব ভিতর থেকে বেবিয়ে আসে। মরা গাঙে বান আসাব মতো ডালে ডালে উপচে পড়ে ফুলের গোছা।

যশোরে সাগর দাঁড়ি

লোকালয় ছাড়িয়ে আমাদের বাস আবার মাঠে পড়লো। রাস্তার দুপাশে কতো গাছ। কতো রঙের ফুল তাদের ডালে ডালে। এইসব গাছ রাস্তার দুপাশে লাগানো, সযত্নে লালিত। কিন্তু তাদের তো নাম জানি না আমি। চেয়ে আছি যদি চেনা কোন গাছের দেখা মেলে।

আবার একটা গ্রামের ধারে এসে বাস থামলো। গ্রামের পাশ দিয়েই বাস-রাস্তা। গ্রামের বাড়িগুলোর অধিকাংশ ছাওয়ানো করোগেটেড শিট্ অথবা টালি দিয়ে। হোগ্‌লাপাতার ছাউনিও রয়েছে কিছু। বাড়ির সীমানা নারকেল বা সুপুরি গাছের।

পথের ধারে গ্রামে গ্রামে ইস্কুলের দেখা মিলছে খুব। ছাত্রছাত্রীরা উৎসুক চোখে চাইছে। তাদের বয়েস দেখে ধরে নিচ্ছি ইস্কুলটা প্রাথমিক না মাধ্যমিক। গ্রামে গ্রামে ইস্কুলের সংখ্যা দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার কতো কম সময়ে দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারে তার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে যেন। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে এরা ঠিক জায়গায় ধরেছে। দেশের উন্নয়নে দেশজ সবরকম সম্পত্তির ব্যবহার তো করতেই হয়। কিন্তু মানব সম্পদের উন্নয়নে হাত দিতে হয় সবার আগে। জ্যাঠাইমা বলতেন রমেশকে: রমেশ। তোর কাজ হোলো গাঁয়ের মানুষগুলোকে লেখাপড়া শেখানো। তুই আলো জ্বেলে দে। অন্ধকার দূর হলে গাঁয়ের লোকেরা নিজেরাই বুঝবে সমাজের কোনখানে অন্যায় আর কীসে ন্যায়।

চলন্ত বাসের মধ্যে হঠাৎ "কেশবপুর। কেশবপুর" বলে হাঁক জুড়ে দিলে কনডাক্টর। আর তার হাঁকডাক শুনেই বোধ হয় ভয়ে ভয়ে বাসটা এসে কেশবপুর বাজারে থেমে পড়লো। নামতে-থাকা যাত্রীদের পিছু ধরে আমি নেমে পড়লাম কেশবপুর বাজারে।

আমাকে নামতে দেখে এগিয়ে এলো এক রিকসাভ্যানঅলা। বললো, কোনে জাবেন (যাবেন) বাবু। আমি সাগরদাঁড়ি যাবো শুনে সে বললে, সাগরদাঁড়ি জাওনের ভাড়া লাগবে বাবু পঁচিশ টাকা। বললাম, কেন গো। এতো বেশি ভাড়া বলছো কেন। ভ্যানঅলা বললে, এই ভ্যানে পাঁচজন জাতি (যেতে) পারে। তা, আপনে আর চারজনেরে লইয়া আসেন। অহন সাগরদাঁড়ি জাওনের পাঁসিনজার পামু কোনে। বললাম, আমার ও তো সেই কথা। একা একা এসেছি কলকাতা থেকে তোমাদের মধুসূদনের জন্মভূমি দেখতে। এখন এই 'বিদেশ-বিভূঁই'-এ আর চারজনকে পাই কোথা। তাই শুনে পাশে দাঁড়ানো আর এক ভ্যানঅলা মধ্যস্থতা করে দিলে। বললে, বাবু। আপনি পরদেশী মনিষ্যি। অবে আপনে পনেরোটা টাকা দিবেন। আর পথে যদি যাত্রী পায় অ তুলি নেবানে। খাসা ব্যবস্থা। মেনে নিলাম। কিন্তু মনটায় বড়ো খচ্‌খচ্ করতে থাকলো পরদেশী কথাটা শুনে। সত্যি বটে আমি 'বিদেশ-বিভূঁই' কথাটা বলেছি। সে তো একটু দূরের গাঁয়ে গিয়েও লোকে বলে। তা বলে পরদেশী আমি। পঞ্চাশ বছর আগের একই বাংলার একপাশের মানুষ অন্য পাশে বিদেশী

হয়ে গেল। রাজনীতির প্যাঁচ কাছে টানে না, মানুষকে কেবল দূরেই ঠেলতে জানে। দূর ছাই ! ওসব আর ভাবতে পারিনা। এই নিয়ে অনেক রক্তপাত অনেক অশ্রুপাত ঘটে গেছে। পুরানো ঘায়ে খোঁচা দিলে যন্ত্রণাই বাড়বে কেবল।

যশোব-সাতক্ষীরা বাস রাস্তার তুলনায় সংকীর্ণ একটা রাস্তার ওপব দিয়ে ভ্যান চলেছে। অবশ্য সংকীর্ণ হলেও এই রাস্তার ওপর দিয়ে অনায়াসে বাস যেতে পাবে। রাস্তাটা বাঁধানোও। কোথাও পিচ্ ঢালা, আবাব কোথাও ইঁট বসানো।

সংকীর্ণ বলেই বোধ হয় পল্লী বাংলা বাস্তাটার আবো কাছে এসে পড়েছে। হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগণার পল্লী পরিবেশের সঙ্গে এখানকার পল্লীর কোন তফাৎ নেই, কি গাছপালায়, কী মানুষজনে, কি বাড়ি-ঘরে, কি জমিজায়গায়। বট-অশত্থ-আম-জাম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা গ্রাম। পুকুর পাড়ের বাঁশবন থেকে বাতাসেব দোলায় উঠছে ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ। আমার সেই আবাল্য পবিচিত বাংলা মায়ের অপরূপ রূপ। দুই চোখ ভবে এই রূপ দেখছি আর মনে মনে আবৃত্তি কবছি —

"বাংলাব মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবাব রূপ
খুঁজিতে যাই না আব , অন্ধকাব জেগে উঠে ডুমুবেব গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটিব নিচে ব'সে আছে
ভোরেব দোয়েলপাখি—চাবিদিক চেয়ে দেখি, পল্লবেব স্তূপ
জাম বট-কাঁঠালেব-হিজলের-অশত্থের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে তাহাদেব ছায়া পড়িয়াছে'

দূর ছাই । চোখ দুটো বাব বাব ঝাপসা হয়ে আসছে: দুচোখ ভবে দেখবো আমাব বাংলা মাকে তাব কি উপায আছে। বয়েস যতো বাড়ছে ততোই যেন বেশি করে ছিঁচ কাঁদুনে হয়ে উঠছি।

এই সময ভ্যানঅলা আমাব মনটাকে কান্না থেকে তুলে নিয়ে এলো বিস্ময়ে। বললে খাজুবগাছ দ্যাক্‌বেন না, বাবু।

--খেজুবগাছ। খেজুবগাছেব আবাব দেখবো কী গো। সে তো তোমাব জয়নগব মাজিলপুব বসিবহাট--- তোমাব খেজুবগাছ নেই কোথা । খেজুবগাছ তোমাব ভ্যানঅলা আমবা কথার মাঝখানে বলে উঠলো, হ্যা সব খাজুবগাছ না বাবু। এ্যাই খাজুবেব গাছটাব পাঁচটা মাথা।

আমি বললাম, সে আবাব কি কথা। খেজুব গাছেব আবাব পাঁচটা মাথা হয না কি ।

ভ্যানঅলা বললে, অয বাবু অয়। ওপবঅলাব মর্জি হলি খাজুর গাছেব পাঁচটা ক্যান দশটা মাথা হতি পারে। কথাগুলো বলতে বলতে ভ্যানঅলা ডানপাশের একটা সরু মেঠো পথে নামালো তাব ভ্যান। ভ্যানটা সেই পথের ওপর দিয়ে খুব সাবধানে চালিয়ে নিয়ে এলো একটা প্রাথমিক ইস্কুলের মাঠে। ভ্যান থামিয়ে বললে, নামেন বাবু।



অয়বাবু অয। ওপবঅলাব মুর্জি হলি খাজুরগাছের পাঁচটা ক্যান্‌, দশটা মাতা হতি পাবে।

নামলাম ভ্যান থেকে। ভ্যানঅলা বললে, আসেন বাবু। বলে সে চষা জমিব আলের ওপর দিযে হাঁটতে শুরু করলো। আমিও তাকে অনুসবণ করতে থাকলাম। খানিক গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে ঐ দ্যাহেন বাবু পাঁচ-মাথাব খাজুরগাছ।

এগিযে গেলাম গাছটার দিকে। একটা চষা জমিব ওপব দাঁডিযে আছে গাছটা। গাছটাব চারপাশে জমি। জমিতে কোন ফসল লাগাবে বলে মাটি চষা হয়েছে। জমির মাটি থেকে উপরে গাছটাব দিকে চোখ তুলে দেখি গাছটাব দুটো মাথা। ইতিমধ্যে ইস্কুল থেকে দুজন মাস্টারমশাই এগিযে এসেছেন আমার কাছে। তাঁরা জানালেন, সত্যি সত্যিই গাছটার পাঁচটা মাথা ছিলো। ১৯৩১ সালের প্রবল ঝড়ে তিনটে মাথা গাছ থেকে ভেঙে পড়ে গেছে। বাকি দুটো মাথা তুলে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে আজও। কিন্তু নামটা তার পাঁচ-মাথা খেজুবগাছ থেকেই গেছে।

পাঁচমাথা-খেজুরতলা থেকে ফিরে এসে উঠলাম কেশবপুর-সাগরদাঁড়ি রাস্তায়। খানিক যেতেই রাস্তাটা ধরলো ছোট্ট একটা নদীর তীর। নদীটা ছোট্ট ঠিকই। তবে কাঁদর বা নালার মতো ছোট নয়। নদীটি স্রোতস্বতী এবং তাব ওপর দিয়ে মাঝাবি আকারেব নৌকোগুলো

অক্লেশে ভেসে চলেছে। ভ্যানঅলাব কাছে নদীটাব নাম জানতে চাইতেই সে বললে, এ নদীটিই তো বাবু কপোতাক্ষ। অবিলম্বে সাগবদাঁড়িতে এসে উপস্থিত হলাম।

সাগবদাঁড়ি গ্রামের মাঝখান দিযে চলে গেছে প্রধান পথটা একবারে কপোতাক্ষেব তীবে ঘাট পর্যন্ত। সাগবদাঁড়িকে অবশ্য এখন গ্রাম বলা চলে না। মাইকেল মধুসূদনেব স্মৃতি বিজড়িত এবং স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরি সংস্থা সমুহের কল্যাণে সাগব দাঁড়িকে এখন ছোটখাটো একটা শহবই বলা চলে।

ভ্যান থেকে নেমে প্রধান সড়কটা ধবে হাঁটতে থাকলাম। থামলাম এসে কপোতাক্ষেব ঘাটেব মাথায। সড়কটাও এখানে এসে শেষ হযেছে। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম জলের কাছে। এক আঁজলা জল নিযে মাথায় দেবো কি। যেমন গঙ্গায় নামাব আগে অথবা না নেমেও লোকে গঙ্গাজল মাথায দেয়। অবশ্য গঙ্গাব কাছে কপোতাক্ষ নিতান্তই ক্ষুদ্র, শিশু মাত্র। তা হোক, ক্ষুদ্র হোক, শিশু মাত্র হোক, কী সুন্দর নাম। কপোতাক্ষ। মন্ত্র উচ্চাবণের মতো এই সুন্দব নামটিও বাব বার উচ্চাবণ কবতে ইচ্ছে হচ্ছে। তাছাড়া, বলতেই হবে কপোতাক্ষ অতি সুন্দব। আব কপোতাক্ষেব সৌন্দর্য তার ক্ষুদ্রতাব জন্যে।



কপোতাক্ষ

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথাভাবি এ বিরলে।

বিশাল নদী তার শক্তি প্রদর্শন করে। পদ্মা ব্রহ্মপুত্র যমুনা মানুষের ঘরবাড়ি, এমনকি, গ্রামকে গ্রাম গ্রাস করে। তাই পদ্মার মত নদীর নামের আগে বিশেষণ জুড়ে বলা হয় কীর্তিনাশা পদ্মা। অবশ্য বিশাল নদীরও সৌন্দর্য আছে। কিন্তু সে সৌন্দর্য বড়ো ভয়ঙ্কর। বাঘ সুন্দর, গোখরো সাপ সুন্দর কিন্তু তারা ভয়ঙ্কর সুন্দর। কপোতাক্ষ ভয়ঙ্কর নয়। কেবলই সুন্দর। সুন্দর এই নদী।

মধুসূদনের সঙ্গে কপোতাক্ষের পরিচয় আশৈশবের। সেই পরিচয় গাঢ় হবার আগেই, মাত্র সাত বছর বয়েসেই, মধুসূদন চলে গেছেন কলকাতার খিদিরপুরে বাবার কাছে। তবে পূজোর সময় এবং পারিবারিক কাজেকর্মে মধু মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে সাগরদাঁড়ি কি আসেন নি? মধুসূদনের সাগরদাঁড়ির বাড়িতে দুর্গাপূজো হোতো। কালের করাল হস্তকে তুচ্ছ করে সমুন্নত পূজো মণ্ডপ আজও তার সাক্ষী হয়ে আছে। আর পূজোর সময় কর্মস্থল থেকে দেশের বাড়িতে ফিরে আসা তো বাঙালির চিরকালের রীতি।

তাই শৈশব কৈশোরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা যে নদীর সঙ্গে তাঁর সখ্য, পরবর্তী জীবনে মহাকবি ভুলতে পারেন নি সেই কপোতাক্ষকে। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে গাঁথা ছিলো এই নদী। তাঁর মানস জগতে কপোতাক্ষ বাস্তব জগতের মতোই কলতান তুলতো। তাই সুদূর ইউরোপে কর্মব্যস্ত, ঋণ-ভারে জর্জরিত থেকেও কবির মন কিন্তু চলে আসতো সাগরদাঁড়িতে কপোতাক্ষ-তীরে। আর সেই কারণেই ইউরোপে বসে লিখেছিলেন—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি স্তনে।
আর কি হে হবে দেখা ? ... "

কে জানে। মধুসূদন ইউরোপের প্রবাস থেকে ফিরে আর কোনদিন সাগরদাঁড়ি এসেছিলেন কিনা, আর কোনদিন এই কপোতাক্ষ-তীরে বসে কলকল ধ্বনিতে তাঁর কান জুড়িয়েছিলো কিনা!

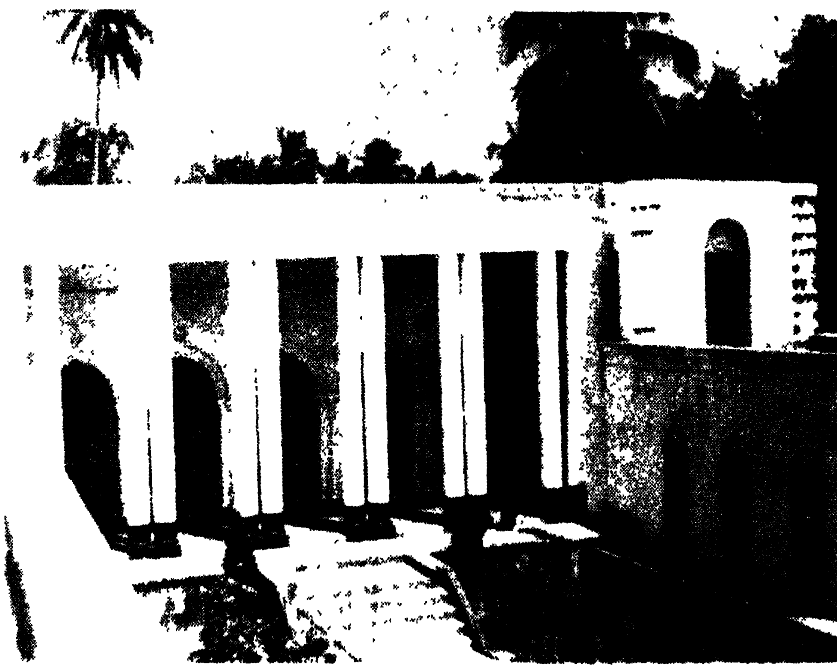
আবার আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় যখন মহাকবি, যখন তাঁর দৃষ্টি পরপারের পানে, তখনো জন্মভূমি সাগরদাঁড়ির সঙ্গে কপোতাক্ষকে মনে পড়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর সমাধির ওপর বসানো স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ করার কবিতাটি নিজেই রচনা করে গেছেন মৃত্যুর পূর্বে। লিখে গেলেন—

"দাঁড়াও, পথিক-বর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোবে সাগবদাঁড়ি কবতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্তমহামতি
রাজনারাযণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

অঞ্জলি ভরে কপোতাক্ষের জল নিয়ে মাথায় দিলাম। দাঁড়িয়ে উঠে পিছন ফিরে দেখি সাত বছরের ছেলেটি সিঁড়িতে পা রেখে ঘাটের মাথায় বসে আছে। দুটি হাতের তালুতে তার চিবুক রেখে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে কপোতাক্ষের পানে। না, তা কী করে হবে! আসলে চোখ বুঁজে কল্পনার নেত্র মেলে দৃশ্যটি দেখতে চেয়েছিলাম আমি।

ঘাট থেকে উঠেই পিচ ঢালা পথটা চলে গেছে সোজা দক্ষিণ মুখে। সেই পথ ধরে হাঁটতে শুরু কবলাম। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে বসত বাড়ি, ইস্কুল, ব্যাঙ্ক, লাইব্রেরি,



এই ঠাকুবদালান মধুসূদনের পিতামহ মহারাজ রামনিধি দত্ত নির্মাণ কবেছিলেন।

হোটেল, আরো কতো কী। সে সবের পানে না চেয়ে সোজা এসে উঠলাম মধুসূদনের পৈত্রিক ভিটেয। ঢুকেই দেখি, প্রায় দোতলার সমান উঁচুতে মাথা তুলে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে পুজোর দালান। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ শেষে, দীর্ঘ সিঁড়ির সারি উঠে গেছে পূজো দালানের বিশাল বোযাকে। বোয়াকের পরে পঙ্খের কাজ করা গোল গোল থামগুলো দোতলা-সমান উঁচুতে ছাদটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়িযে আছে। দালানের ভিতবে বিস্তৃত মেঝে ; তাব তিন পাশে পঙ্খেব কাজ করা দেওয়াল। অনুমান করা হয় মধুসূদনের পিতামহ মহাবাজ রামনিধি দত্ত এই ঠাকুর-দালান নির্মাণ করেছিলেন। দেখে সহজেই বোঝা যায়, গ্রামখানির আবালবৃদ্ধাবনিতা পুজোর সময় যাতে সমবেত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ঠাকুর দালানটিকে এতো বড়ো করে তিনি নির্মাণ কবিয়েছিলেন।

পুজো দালানেব ডান দিকে দীর্ঘ একটা দালান। তার মধ্যে পরপব তিনটে বড়ো বড়ো ঘব। পুজো মণ্ডপের সবচেয়ে কাছের ঘরটিতে একটা পালঙ্ক ও আলমারি রয়েছে। তাবপবেবটিতে একটা আলমাবি ও কাঠেব সূক্ষ্ম কাজ কবা সিন্দুক বয়েছে। আব সব



মাইকেল মধুসূদনের পৈত্রিক পারিবাবিক আসবাব — সিন্দুক ও আলমারি — পাশে লেখক

শেষের ঘরের একটা দরজা বাইরের দিকে। মনে হয় এই ঘরটি ছিলো বৈঠকখানা। গ্রামের ভদ্রজন ও অতিথিসজ্জনদের আপ্যায়ন করা হোতো এই ঘরে। এইসব ঘরের পিছনে ছিলো অন্দর মহল। পড়ে থাকা ভাঙ্গা ইটের স্তূপ এবং দাঁড়িয়ে থাকা ভাঙা দেওয়াল তার স্মৃতি বহন করছে। অনুমান করতে কোন অসুবিধে নেই, সাগর দাঁড়ির সম্পন্ন গৃহস্থ দত্ত পরিবারে ছিলো আরও অনেক আসবাবপত্র ও বাসন-কোসন। মহাকালের রুদ্রলীলা অন্দর মহলের ঘরে-দোর, বাসনকোসন ও আসবাবপত্রকে নিক্ষেপ করেছে বিলুপ্তির গর্ভে। হারিয়ে যাওয়া সেই সব সম্পদ বাদ দিয়ে যেগুলি কোনক্রমে টিকে আছে সেগুলি কেবল বাংলাদেশ সরকার এবং মধুসূদনপ্রেমী জনসাধারণের অমূল্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসেই বেঁচে আছে।

বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ করেছে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-বিজড়িত সাগরদাঁড়ির ঘরবাড়ি। সেই ঘর বাড়িকে সারিয়ে ও পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে জনসাধারণের দর্শনীয় করে তুলেছে।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের প্রতি বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের যে কি সুগভীর শ্রদ্ধা রয়েছে তার পরিচয় পেলাম তাঁর পৈত্রিক বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে। দেখি, বাড়ির বাইরের মাঠে খানপাঁচেক বাস দাঁড়িয়ে। আর সেই বাসগুলি থেকে পিল পিল করে নেমে আসছে ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। ওরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসেছে শিক্ষামূলক ভ্রমণে। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান মহাকবি মাইকেল মধুসূদন ও তাঁর সৃষ্ট চির-ভাস্বর বাংলা সাহিত্যকে। সেই কালজয়ী সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে সত্যের উপর। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়গত ধর্মের আঘাতে বিভক্ত 'ভেদ'-এর উপর তার আসন পাতা হয়নি। সকল ধর্মের উপর যে মানবধর্ম তারই উপর মহাকবির সৃষ্ট সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এই সত্যটি আগামী দিনের মানুষদের মনে গেঁথে দিতে চান আজকের দিনের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

মাইকেল মধুসূদনের পৈত্রিক বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণের একপাশে মধুসূদন একাডেমি। সেখানে রয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষদের এবং কিছু উত্তর পুরুষের পরিচয়। পরিচয়টি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান।

মাইকেল মধুসূদনের জন্ম ১৮২৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি। জন্ম হয় বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে। আর এই মহাকবির মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালের ১৯শে জুন ভারতের অন্তর্গত আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

মাইকেল মধুসূদনের পূর্বপুরুষদের যতদূর পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রথম পুরুষের নাম শ্রী রাম দত্ত। তাঁর আদিনিবাস ছিল ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার বালিতে। পরে তিনি কার্য উপলক্ষে আসেন বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার গোপালপুরে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র শ্রী রাম কিশোর দত্ত বৈবাহিক সূত্রে গোপালপুর থেকে আসেন সাগরদাঁড়ি গ্রামে। রাম কিশোরের পুত্র ছিলেন মহারাজ

রামনিধি দত্ত। রামনিধির চারপুত্র। তাঁদের নাম রাধামোহন মদনমোহন দেবীপ্রসাদ ও রাজনারায়ণ। মধুসূদনের পিতা ছিলেন মহামতি রাজনারায়ণ এবং মাতা ছিলেন খুলনা জেলার বাড়ুলি-কাঠিপাড়া গ্রামের গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা জাহ্নবীদেবী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, স্যার প্রফুল্ল কুমার রায়-এর পৈত্রিক নিবাস ছিলো এই বাড়ুলি-কাঠিপাড়া গ্রামে। মহামতি রাজনারায়ণ দত্তের তিনপুত্র সন্তান ছিলো। মধুসূদন ছিলেন সবার বড়। অন্য দুই ভাই এর নাম মহেন্দ্র নারায়ণ দত্ত এবং প্রসন্ন কুমার দত্ত। অল্প বয়সেই মহেন্দ্রনারায়ণ ও প্রসন্নকুমারের মৃত্যু হয়। রাজনারায়ণের কোন কন্যা সন্তান ছিলো না।

মধুসূদন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে এক নীলকরের কন্যা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে বিবাহ করেন। রেবেকার গর্ভজাত চার সন্তানের মধ্যে দুই জন জীবিত ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে রেবেকার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিবাহ করেন এক ফরাসী কন্যা এমিলিয়া হেনরিয়েটাকে। হেনরিয়েটার গর্ভজাত এক কন্যা ছিলো। তাঁর নাম ছিলো এলিজাবেথ শর্মিষ্ঠা দত্ত। হেনরিয়েটার গর্ভজাত দুইপুত্রের একজনের নাম ছিলো মেঘনাদ মিল্টন দত্ত এবং আর একজনের নাম ছিলো অ্যালবার্ট নেপোলিয়ন দত্ত। মেঘনাদ মিলটন দত্ত অল্প বয়েসেই মারা যান।

মাইকেল কন্যা এলিজাবেথ দত্তের একমাত্র পুত্র-সন্তানের নাম ছিলো মিঃ উইলিয়াম হোইটম্যান স্যামুয়েলসন্স্। মিঃ স্যামুয়েলসিসের পুত্র কন্যা মিলিয়ে সর্বমোট দশজন ছিলো। আলবার্ট নেপোলিয়ন দত্তের পুত্র কন্যার সংখ্যা ছিলো সর্বমোট পাঁচজন।

মধুসূদন একাডেমিতে মধুসূদনের সাহিত্য কর্মেরও বিশদ পরিচয় রয়েছে। শিক্ষামূলক ভ্রমণে আসা ছাত্রছাত্রীরা এইসব জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে চাইছে তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে। একাডেমি কর্তৃপক্ষও তাদের সাহায্য করছেন।

একাডেমির পাশেই সুন্দর উদ্যান (পার্ক) একটা। চারিদিকে ছোট বড় নানা ফুলের গাছ। নানা জায়গা থেকে আসা ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যেন প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। উদ্যানে ফুলের কেয়ারি ও গাছের অবকাশে সিমেন্টের বেদি। তার ওপর বসে বসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপভোগ করছেন ছাত্রছাত্রীদের হুটোপুটি। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে চলে গেছেন বাল্যকালে ফিরে। আবার কেউ বা আক্ষেপ করছেন, কেন আমি এই খোলামেলা যুগে জন্মালেম না।

উদ্যানের অপর পাশে মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাগার খুব বড়ো আকারের না হলেও স্থানীয় লোকের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বলা চলে গ্রন্থাগারটিকে। মাইকেল রচিত সমস্ত গ্রন্থই আছে। আর আছে মহাকবির ওপর ও তাঁর সাহিত্যের ওপর রচিত সমস্ত বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থ। নানা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং শিক্ষামূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষকগণ আসেন মাইকেল সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করতে।

গ্রন্থাগার থেকে বার হতেই চোখের সামনে ভেসে উঠলো রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা "সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন ইনস্টিটিউশন।" মেছুনীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যদি হয়

মাছের চুপড়িটি তাহলে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরে মাস্টারি করে আসা আমার কাছে ইস্কুলটি প্রিয় হতে পারবে না কেন ! ঢুকে পড়লাম ইস্কুলে।

ঢুকতেই প্রধান শিক্ষক সাহেবের ঘর। করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে আত্মপরিচয় দিলাম এবং কলকাতা থেকে সাগরদাঁড়ি আসার উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করলাম। আরও বললাম, "সাগরদাঁড়ী মাইকেল মধুসূদন ইনস্টিটিউশন" দর্শন আমার মতো প্রাক্তন শিক্ষকেব পক্ষে উপরি পাওনা।

আমার কথা ক'টি ধৈর্য ধরে শুনে প্রধান শিক্ষক শেখ মোহম্মদ আলী সাহেব উৎসাহে যেন ফেটে পড়তে চাইলেন। তখন বোধ হয় লাস্ট পিরিয়ড সবে শুরু হয়েছে। আলী সাহেব সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাঁক দিয়ে ডেকে বললেন, খুব পড়িয়েছো সব। আর পড়িয়ে কাজ নেই। ছেলেমেয়েদেব ছুটি দিয়ে আমার ঘবে চলে এসো সব।

ছুটির আনন্দ চোখেমুখে মেখে ছেলেমেয়েদের ইস্কুল থেকে বেরিযে যাওয়ার সেই চিরপরিচিত দৃশ্য দেখছি। এবই মধ্যে নানা ক্লাশ থেকে এসে উপস্থিত হলেন জনা সাতেক শিক্ষক এবং একমাত্র শিক্ষিকা মিসেস মঞ্জুয়ারা খাতুন। মনে হেলো, এখুনি হয়তো মঞ্জুযারা বলে উঠবেন, সাত-ভাই চম্পা। আব শিক্ষকেবা সমস্বরে সাড়া দিয়ে বলবেন, কেন বে বোন পাকল!

শিক্ষক-শিক্ষিকাদেব কাছে আমাব পরিচয় দিয়ে আলী সাহেব চায়ের ব্যবস্থা কবতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে শিক্ষক।শিক্ষিকাগণ আমার কৌতূহল মেটাতে জানালেন ইস্কুলটি মাধ্যমিক স্তরের এবং যশোর 'মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড' কর্তৃক অনুমোদিত। ইস্কুলটি সহশিক্ষা (co-educational) মূলক। ছাত্রীদেব জন্যে আলাদা করে বালিকা বিদ্যালয় করার যথেষ্ট পয়সা নেই সবকারেব হাতে। অথচ এখুনি বিপুল সংখ্যক বালিকার শিক্ষাব ব্যবস্থা করা দরকার। কবে সরকারের হাতে পয়সা হবে তাব জন্যে তো বালিকাদের শিক্ষা বসে থাকবে না। তাছাড়া অতো শিক্ষিকাই বা পাওয়া যাবে কোথায় এই মুহূর্তে। দেশে নারীশিক্ষার প্রসাব তো ছিলো না আগে। তাই শিক্ষিকার পদ পুরণের জন্যে অতো শিক্ষিতা মেয়ে কোথায় পাবো আমরা। ইস্কুল পিছু একজন, বড়োজোর দুজন শিক্ষিকা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আমাদের। তবে, তাঁদের মতে, এই অভাব থাকবে না। বছব কয়েক বাদে শিক্ষিতা মেয়েতে ভরে উঠবে দেশ। তা ঠিক। দেশে যেমন ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা কম নয় ক্লাশে ক্লাশেও তেমনি ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা কম হচ্ছে না। সাধারণ মানুষেব মনে ছেলে মেয়ে উভয়কে শিক্ষা দেওয়ার একটা তাগিদ এসেছে।

বর্তমানে "সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন ইনস্টিটিউশানে" ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারশো। মাতৃভাষা বাংলা এই ইস্কুলে শিক্ষার মাধ্যম। এই কথাটা বলার সময় প্রধান শিক্ষক আলী সাহেবের সঙ্গে অন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও গর্ব ফুটে উঠলো চোখে মুখে।

বললাম, আলী সাহেব এবং আমার অতি প্রিয় ভাইবোনেরা, মাতৃভাষাকে আপনারা মায়েরও অধিক সম্মান করেন। আর সেইজন্যেই মাতৃভাষার সেবা করে যাঁরা মাতৃভাষার

গৌরব বৃদ্ধি করেছেন তাঁরা হিন্দু, মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সে বিচার করার দরকার মনে করেন না আপনারা। সাগরদাঁড়ি এসে তাই মাইকেল মধুসূদনের প্রতি আবালবৃদ্ধবনিতা, এমন কি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে অসীম শ্রদ্ধাব প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।

একজন শিক্ষক বললেন মাতৃভাষা বাংলা-ই তো আমাদের বাঙালি জাতির ভিত্। বাংলা ভাষার গৌরব গাইতে গিযে আমাদের দেশের ছেলেবা জীবন দিয়েছে। তাদের রক্তে বাঙা হয়েছে আমাদেব জাতির ভিত্তি। সুতবাং বাংলা ভাষাব গৌবরে আমবা গর্ব বোধ করবো না কেন। তাই আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাধককে শ্রদ্ধা কবি। তিনি হিন্দু, মুসলমান, না খ্রীস্টান, সে প্রশ্ন অবান্তর।

প্রধান শিক্ষক সাহেবকে বললাম, বলুন আলী সাহেব ! মহাকবি মাইকেল মদুসূদনেব স্থান আপনাদেব কাছে এতো উঁচুতে কেন! তাঁর সাহিত্য জুড়ে আছে রামাযণ মহাভারত বৈষ্ণবকাব্য। সাহিত্যের এই বিষয়বস্তুকেই বা আপনারা কীভাবে মূল্যায়ন কবেন।

আলী সাহেব বললেন, সম্রাট সাহাজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নী মমতাজেব ভিতব দিয়ে পবিত্র পত্নীপ্রেম অনুভব করেছিলেন। এই অনুভবটিকে চিবন্তন রূপ দিতে তিনি যমুনার তীরে মর্মব প্রস্তব দিয়ে নির্মাণ করলেন অপূর্ব এক স্মৃতিসৌধ যাব নাম তাজমহল। এই তাজমহল কেবল মাত্র সম্রাট সাহজাহানেব পত্নী-প্রেমেব নিদর্শন নয। এই বিশ্বেব সকল মানুষেব অন্তবে আছে যে প্রেম এই স্মৃতিসৌধ সেই প্রেমেরই প্রতীক। বিশ্বজোড়া এই প্রেম-ই জগতে কল্যাণ নিয়ে আসে, শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করে শিল্প ও সাহিত্যের মধ্য দিযে। সেই দিক থেকে বিচাব করলে সাহিত্যিকও শিল্পীব ন্যায প্রেম অনুভব কবে বিশ্বেব সকল মানুষেব জন্যে।

বাংলাব ভাষা ও সাহিত্যে চিবভাস্বর উজ্জ্বল-জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ ছিলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন। তাঁব অন্তরে ছিলো বিশ্বপ্রেম। তাই তিনি বিশেষ ব্যক্তি বা পরিবাব বা সমাজের কথা না ভেবে ভাবলেন বিশ্বেব সকল মানুষের কথা। তাঁর এই ভাবনাকে রূপ দিতে তিনি উপকরণেব অনুসন্ধান করতে থাকলেন। প্রথম জীবনে মধুসূদন উপকরণ খুঁজে ছিলেন ইংরেজিব মধ্যে। পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন। দেখলেন তাঁর মাতৃভাষা জননীস্বরূপা রত্নগর্ভা বাংলাব মধ্যেই রয়েছে নির্মাণ সামগ্রী। এই বিষয়টিকে সুন্দব একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন মধুসূদন। কবিতাটি হোলো—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন. –
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ

মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে ববি;—
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে বতনের বাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোব আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যাবে ফিবি ঘবে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

আবৃত্তি থামিয়ে আলীসাহেব আবাব বললেন, এইভাবে মাতৃভাষাব মধ্যে নির্মাণ-সামগ্রী লাভ করে মধুসূদন তাঁব কাব্য-সৌধ গড়তে থাকলেন। এই সৌধ গড়তে গিয়ে, এই সত্য সাধনা কবতে গিয়ে, দেখলেন মানুষেব সমাজে বয়েছে অন্যায। সেই অকল্যাণকব অন্যাযকে তিনি মেনে নিতে পাবলেন না। বামাযণে বাবণকে, বাক্ষস জাতিকে নিকৃষ্ট স্তবেব মানুষেব জাতি হিসেবে দেখানো হযেছে। মধুসূদন কিন্তু বাক্ষসজাতিকে সসম্মানে উচ্চে স্থান দিলেন। 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য বচনায় মধুসুদনেব বিদ্রোহী মন তাই মূল বামাযণকে অনুধাবন করেন নি।

আমাব ফেবাব সময এগিযে আসছিলো। তাই আলীসাহেব ও অন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদেব বললাম, আপনাদেব অনেক ধন্যবাদ। আমাব মুখেব কথা কেড়ে নিযে আলী সাহেব বললেন, না! ধন্যবাদ দিযে এখুনি আমাদেব আলোচনাব পালা চুকিয়ে দিলে চলবে না। আপনাকে পেযে আমাদেব যে কী আনন্দ হচ্ছে তা তো ভাষায ব্যক্ত কবতে পাববো না। আজ আপনাকে আমাদেব এখানে থাকতে হবে।

বললাম, আলীসাহেব' আপনাদেব ছেড়ে যেতে আমাব-ই কি মন চাইছে। তবু যেতে হবে। আমাব বাংলাদেশেব মেযাদ মাত্র তিবিশ দিনের। এই তিবিশ দিনে যতোটা পাবি আমাব বাংলা-মাকে দেখতে হবে।

বিষণ্ণ মনে বিষণ্ণ আলীসাহেবদেব বিদায জানালাম।

তৃতীয় অধ্যায়

রূপসা থেকে মধুমতী

প্রভাষক ছোলজার-খালিলুরদের হস্টেল থেকে সকালবেলায় বেরিয়ে এসে আবার বাসে চড়ে বসলাম যশোর বাসস্ট্যান্ডে। বাসটা যাবে যশোর থেকে নড়াইল। আমি অবশ্য নড়াইল পর্যন্ত যাবো না। মাঝপথে রূপগঞ্জে নেমে পড়বো। আমার আজকের ভ্রমণ তালিকা একটু দীর্ঘ। তালিকায় আছে রূপগঞ্জ কালিয়া ও গোপালগঞ্জ।

গতকাল সাগরদাঁড়ি থেকে ফিরতে সন্ধে উৎরে গিয়েছিলো। ছোলজার-খলিলুররা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো উদ্বেগের সঙ্গে। কি জানি, নতুন জায়গা। চিনে-জেনে সব দেখে-শুনে আসতে পারবো কি না, এইসব ভাবনা তাদের মনে পাক খাচ্ছিলো। আমি ফিরতেই আমাকে ঘিরে বসলো সকলে। তারপর যা দেখে শুনে এসেছি সাগরদাঁড়িতে তার সবিস্তার বিবরণ শুনলো ওরা। তখন নিশ্চিন্ত হোলো সকলে।

ওদের কাছে শুনলাম শেখ মোহম্মদ ইলিয়াস সাতক্ষীরা থেকে ফিরেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইলে ছোলজার বললে আপনি একা একা যেতে পারবেন কি তাঁর বাড়ি? বললাম, খুব পারবো একা একা যেতে। এখন আমি বড়ো হয়ে গেছি না। একা একা সব জায়গায় যেতে পারি। বাবার হাত ধরে যাওয়ার কি বয়েস আছে আমার! শুনে ওরা হাসলো খুব। তারপর একটা রিকসা ডেকে রিকসা-অলাকে বুঝিয়ে দিলো কীভাবে কোথায় যেতে হবে।

বাড়িতেই ছিলেন অধ্যাপক ইলিয়াস। মিত্র ও ঘোষ'এর শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়, যিনি ভানুবাবু নামেই সমধিক পরিচিত, আমাকে অধ্যাপক ইলিয়াস সাহেবের কথা বলেছিলেন এবং তাঁর ঠিকানাও দিয়েছিলেন। ভানুবাবুর কথা বললাম এবং আমার পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্যের কথা বললাম। অধ্যাপক ইলিয়াস আমাকে তাঁর বসার ঘরে আহ্বান জানালেন এবং তাঁর মিসেসকে ডেকে আমার সঙ্গে পরিচয় করালেন।

পরিচয়ের আদান-প্রদানকালে বার হয়ে এলো দেশ-বিভাগের আগে অধ্যাপক ইলিয়াসের বাড়ি ছিলো পশ্চিম-বঙ্গের কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে। সেখানেই তাঁর বাল্য ও কৈশোরের অনেকখানি কেটেছে। ঐ অঞ্চলটা আমারও খুব পরিচিত। একসময় মহাপ্রভুর স্মৃতি-বিজড়িত নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, দাঁইহাট-আজিগ্রাম উদ্ধারণপুর প্রভৃতি স্থান দেখে বেড়িয়েছিলাম। দাঁইহাটের লাগোযা কাশীরাম দাসের জন্মভূমি সিঙ্গি এবং তার পাশের গ্রাম মূলটি, ওকড়সা চাণ্ডুলি প্রভৃতি আমার পরিচিত। অধ্যাপক ইলিয়াসও ঐ বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলির সঙ্গে পরিচিত। ওখানকার কোন একটি গ্রামের ইস্কুলে তিনি পড়তেন। তাই গ্রামগুলির কথা বলতেই অধ্যাপক ইলিয়াস খানিকটা যেন নস্টালজিয়া বোধ করছিলেন।

ভানুবাবুব কথায় বললেন, ভানুবাবু এসে এখানে ছিলেন। আমার বাড়িতেই। তিনি বলেছিলেন এটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি। অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে তিনি আপন বোন কবে নিযেছেন। আরো বলেছেন তিনি, আমি যদি ঘরের একপাশে নমাজ পড়ি এবং তিনি যদি অন্য পাশে জপ-আহ্নিক করেন তাতে আমাদের অসুবিধেটা কোথায়। তাহলে একই ঘবে একই বাডিতে এবং একই দেশে কেন আমরা মিলে মিশে থাকতে পারবো না।

পারি এবং পারছিও। ভাবতেও পারছি আবার বাংলাদেশেও পারছি। কিন্তু হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক ধর্মমতগুলি মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে এতোই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগত করে তোলে যাতে সাধারণ মানুষের হৃদয দ্বিধাবিভক্ত হয। সংকীর্ণ হয়ে আসে। আর সংকীর্ণ-হৃদয় মানুষ ধর্মনীতিকে ছেড়ে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্ধ-অনুগত হয়ে পড়ে। এই অন্ধ-বিশ্বাসের ফলে মানুষ তাব বিচাব ক্ষমতাকে, মানুষেব প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে, নিমজ্জিত করে বাখে ঘোর তিমিরে। তখন সে আর ধার্মিক থাকে না: হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক। কিন্তু হৃদয় থেকে যখন এই অন্ধকার দূর হয় তখন উপনিষদের ঋষিব কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পাবি—"যদাহতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।" যখন তোমাব অন্ধকারের অবসান হয় তখন কোথায় দিন কোথায় বা রাত্রি, কোথায় সৎ আর কোথায় বা অসৎ তখন সবই শিব, কেবল মঙ্গল।

দেশ-ভ্রমণের কথায় এসে যশোব-কেন্দ্রিক কোন কোন স্থানে যাবো জানতে চাইলেন। আমি ছোলজারদের তৈরি করে দেওযা ভ্রমণ সূচীব কথা বললাম। সবটা শুনে অধ্যাপক ইলিয়াস মন্তব্য করলেন ভ্রমণসূচী নিখুঁত। তার ওপর আমাব সামান্য যা বলাব আছে তা হোলো রাতের বাসে ভ্রমণ করা যতোখানি সম্ভব এড়িয়ে চলবেন। রাতের বাসে প্রায়ই ছিনতাই ডাকাতি ইত্যাদি হচ্ছে। আব টাকাপয়সা নিজের সঙ্গে, কিন্তু এক সঙ্গে রাখবেন না। প্রবাদ আছে. একই ঝুড়িতে সব ডিম রাখতে হয় না। আব আপনি যে তিরিশ দিন ধরে বাংলাদেশ ভ্রমণ কবে বেড়াবেন একথা অচেনা-অজানা লোককে নাই-বা বললেন। যারা শুনবে, তারা ধরেই নেবে আপনার কাছে নিশ্চয়ই অনেক টাকা-পয়সা আছে। কাব মনে কী মনোবৃত্তি কাজ করছে বলা যায় না তো!

রূপগঞ্জ রূপগঞ্জ করে কন্ডাকটব হাঁক-ডাক কবতেই আমি রূপগঞ্জ বাজাবে এসে বাস থেকে নেমে পড়লাম। নেমেই মনে হোলো, খাসা নামটি তো রূপগঞ্জ ! রূপের হাট। রূপবান আর রূপবতীরা কি এই রূপের হাটে রূপ বিকোতে আসে! কেমন সে রূপ। যে রূপ জীবনভর দেখেও আশ মেটে না ! যে রূপ দেখে কবিবল্লভ বলেন—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

অথবা, যেরূপের বর্ণনায় "বলিহারি যায় বংশীদাস"! বলেন—

"হেন রূপ কবহুঁ না দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সেই অঙ্গ হৈতে মুঞি
ফিরাইয়া লৈতে নারি আঁখি ।।"

না। কবিবল্লভের অথবা বংশীদাসের দেখা রূপ এই হাটে বিকোবার নয়। তবে এই হাটে, এই রূপগঞ্জে, মাত্র এই সেদিন বিকিয়েছিলো কবির গাওয়া রূপ নয়, শিল্পীর তুলিতে আঁকা পটেব রূপ। সেই রূপ এঁকেছিলেন শিল্পী শেখ মোহম্মদ সুলতান। কিন্তু সেই কুঞ্জ কোথায় যেখানে বসে পটে রূপ সৃষ্টি করতেন শিল্পী সুলতান!

একটা দোকানেব সামনে গাছের ছায়ায ক্যাবাম খেলছিলো জন কয়েক যুবক। শিল্পী শেখ মোহম্মদ সুলতানের বাড়ি যাবার পথ জানতে চাইলে একটি যুবক ক্যারাম-বোর্ড থেকে চোখ না ফিরিয়ে, শুধু হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলো একটা পিচ ঢালা পথ। খেলায় মত্ত যুবকটি একবার চেযেও দেখলো না আমার পানে। আমার কপাল ভালো যে ক্যারাম-খেলুড়েটি গল্পের দাবাখেলুড়ের মতো 'কার সাপ' জিজ্ঞেস করলো না।

তাই তার দেখানো পথ ধরে মিনিট পনেরো হাঁটলাম। এই সময় আর কাউকে শিল্পীর বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস করা দরকার। এমন সময় বাঁ-পাশের শাখাপথ থেকে সাইকেলে এসে মূল পথে উঠলো একটি কিশোর। তার কাছে শিল্পী সুলতানের বাড়িটা কোথায় জানতে চাইলে কিশোরটি নেমে পড়লো সাইকেল থেকে। বললো, আমার সঙ্গে আসুন। আমাদের বাড়ির কাছেই শিল্পী সুলতানের বাড়ি।

ছেলেটির সঙ্গে এসে শিল্পী এস. এম সুলতানের বাড়িতে উঠলাম। কিন্তু একি ! পুলিসে পুলিসে ছযলাপ কেন শিল্পীর বাড়ি ! পুলিসগুলি অবশ্য মাবমুখী নয। বাবুরাম সাপুড়ের সাপেব মতো "করে নাকো ফোঁস্ ফাঁস্, মাবে নাকো ঢুঁশ ঢাঁশ।" লাইন দিযে ঘুমুচ্ছে সব। মাত্র একজন বাইফেল হাতে বেঞ্চিব উপব বসে আছে চোখবুজে। কে জানে, সদ্য সাদী করে ঘবে রেখে আসা বিবিটি তার মনের পটে আঁকা হচ্ছে কি না।

কিশোবটি বললো ওরা পাহারা দিচ্ছে। বললাম, সে তো ওদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কী পাহারা দিচ্ছে পুলিসরা! কিশোরটিব মুখে উত্তর না পেয়ে রাইফেলধারী পুলিসটির কাছে জানতে চাইলাম, তারা এখানে কী পাহাবা দিচ্ছে। পুলিসটি বললো, তাতো জানিনা, স্যাব! আমাদেব এখানে পাঠিয়েছে তাই এখানে এসেছি আমরা। এসে আমাদের যা কাজ তাই করছি। বলেই নিদ্রাবত পুলসিগুলির দিকে চোখ ফেরালো।

শিল্পী সুলতানের বাড়ির ঠিক পাশটি দিয়ে বয়ে চলেছে রূপসা নদী। কুলুকুলু রবে বয়ে যাওয়ার মতোই ছোট্ট নদীটি। তবে কবি নই বলেই হয়েতো সেই রব কানে এলো না। নদীর জল খুব পবিষ্কার নয়। একটু ঘোলা। বাড়িটার চারিপাশে চোখ বোলালাম। চোখে দেখে যতোখানি আন্দাজ কবতে পরলাম তাতে মনে হোলো গৃহসংলগ্ন চারিপাশের জমির পরিমাণ



ৰূপসা নদী

অন্তত নয দশ একব হবে। জমিব মাঝখানে বাড়ি। বাড়িব **চাবপাশে**ব জমিতে ছোট বড নানা ফুলেব গাছ। মাঝে মাঝে লালচে পাথব বেছানো পথ। পথেব দুপাশে কেযাবিতে কতো বকমেব মবসুমী ফুলেব গাছ।

এলাম বাড়িব ভিতবে। কিশোবটিব ডাক শুনে বেড়িয়ে এলেন এক প্রবীণা। পবনে তাঁব থান। গলায তুলসী-মালা। হাতে চুবি নেই। সিঁথিতে সিঁদবও নেই। তাকে আত্মপবিচয দিতে বললাম, কলকাতা থেকে এসেছি বাংলাদেশ দেখতে। তা দেশ তো কেবল জমিব সমষ্টি নয। দেশ হোলো মানুষেব। আব শিল্পী সুলতানেব মতো মানুষ দেশে কযজন থাকে। তাই এলাম তাঁব স্মৃতি বিজডিত ৰূপগঞ্জেব বাড়ি দেখতে।

ভদ্রমহিলা ঘব থেকে একটা চেযাব এনে বসতে দিলেন আমাকে। বললেন, আমাব স্বামী ছিলেন শিল্পী সুলতানেব একনিষ্ঠ বন্ধু। আব চিবকুমাব শিল্পীব তো সংসাবে ছিলো না কেউ। তাই তিনি আমাদেব সংসাবকেই বেছে নিযে ছিলেন আশ্রয হিসেবে। তাবপব একে একে দুই বন্ধুই চলে গেলেন পবপাবে। আব আমি পডে আছি তাঁদেব গডা সংসাব

আঁকড়ে আর তাঁদের স্মৃতি বহন করে। প্রবীণার কথা শুনে মনে পড়লো "স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি। ভারমুক্ত সে এখানে নেই।"

বললাম আপনারা, মানে আপনার স্বামী এবং সুলতান সাহেব, সম্প্রদায়গত ধর্মে পৃথক ছিলেন। আপনারা হিন্দু আর সুলতান সাহেব ছিলেন মুসলমান। দুই পৃথক সম্প্রদায়ের হয়েও আপনারা এক যৌথ পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। তাতে আপনাদের কোন অসুবিধে হোতো না !

প্রবীণা বললেন, অসুবিধে কেন হবে। আমার গলায় দেখছেন তুলসী মালা। তার মানে অন্তরে আমি বৈষ্ণব। তা বৈষ্ণবের তো কোন জাত বিচার চলে না। অন্তরের হরিভক্তিই জাত। আর হরিভক্তি না থাকলে চণ্ডাল। সেই যে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে না—

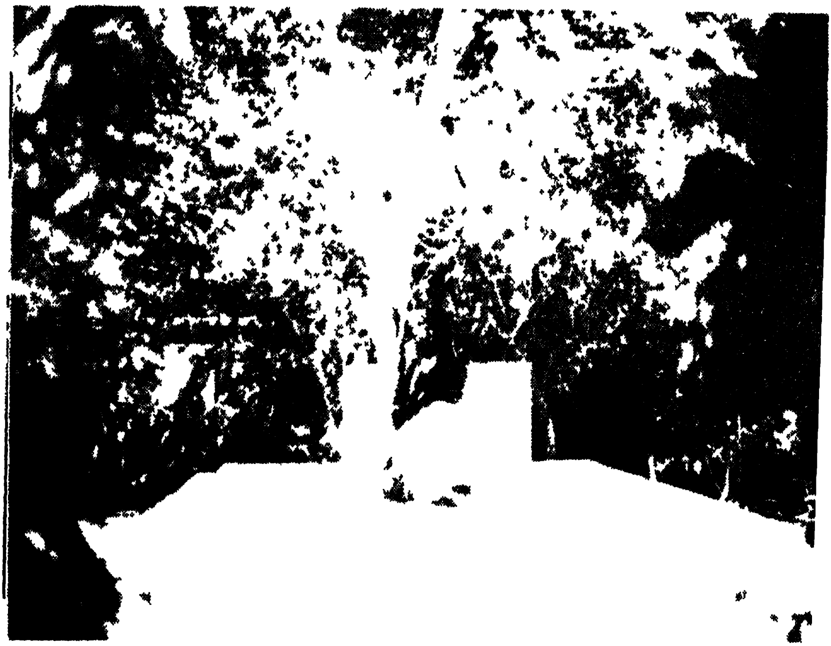
"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য, সর্বশাস্ত্রে কয় ।।
উত্তম কুলেতে জন্মি শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ।।"

আমার স্বামী ছিলেন খুব বন্ধু-বৎসল। তাঁর কাছে জাতের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলো বন্ধু। আর সুলতান তো ছিলেন জাত-শিল্পী। শিল্পীর কাছে হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, বৌদ্ধ নেই, খ্রীস্টান নেই। আছে কেবল সকল ধর্মের উপর যে ধর্ম সেই মানবধর্ম। মানুষই ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো। সেই যে চণ্ডীদাসের গানে আছে না, "শুনবে মানুষ ভাই / সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই প্রবীণার চেহারা-ছবিতে, সাজে-পোশাকে কথাবার্তায় উচ্চারণে মনে হয় না তিনি বিএ -এম.এ. পাশ করা মহিলা। নিশ্চয়ই তিনি কোন স্কুলে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি অর্জন করেননি। কিন্তু শিক্ষার যে আলোকে মানুষের অন্তর হয় আলোকিত, স্বয়ং স্রষ্টা সেই আলোকে আলোকিত করেছেন এই উদার-স্বভাবা মহিলার হৃদয়কে। সেইজন্যেই তিনি অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, মানুষের ধর্ম মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, যুক্ত করে মানুষের সঙ্গে। ভেদ আনে না। অভেদ সৃষ্টি করে মানুষে মানুষে।

শিল্পীর বাড়িতে কিশোরটি আমার গাইড হয়ে উঠলো। তার নামটি গেছি ভুলে। তাই বার বার কিশোরটি বলে কাজ চালাতে হচ্ছে। তবে কিশোরটিকে ভুলিনি। তার মুখের ছবি আঁকা আছে আমার মনে। কিশোরটির সঙ্গে এলাম বাড়ির পিছনদিকে। এখানে সুলতান সাহেবের মাজার। মাজারের উপর দূর্বাঘাস। চারিপাশের কেয়ারিতে কতো রকমের ফুলের শোভা। চারিপাশে নানাপুষ্প শোভিত বৃক্ষ তাদের ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে মাজারের ওপর। শিল্পীর সমাধির ওপর অবিরত পুষ্পবৃষ্টি করছে তারা। শিল্পীর শুধু দেহ নয়, তাঁর সাধনাও যেন এখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। আমি ক্ষণকালের জন্যে যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম।

ছেলেটির ডাকে ফিরে এলাম নিজের কাছে। তাকে জিজ্ঞসা করলাম কার কাছে শিল্পী সুলতানের পরিচয় জানতে পারবো।



রূপগঞ্জ   শেখ মোহম্মদ সুলতানের মাজার

কিশোরটি বললো, মামার কাছে জানতে পারবেন

জানতে চাইলাম, মামা! সে আবার কে?

কিশোর বললে, সেই যে মাসী, বাড়িতে যার সঙ্গে কথা বললেন আপনি, তাঁর ভাই।

বললাম, তাঁর ভাই! কিন্তু তিনি তো বাড়িতে নেই এখন।

ছেলেটি কিছু বললো না। বোধ হয়, এই সমস্যাটির কীভাবে সমাধান করা যায় সেই কথা ভাবতে থাকলো। খানিকপরে বললো, বাড়ির সামনের দিকে যেখানে পুলিসেরা রয়েছে সেখানে শিল্পীর কথা কিছু লেখা আছে।

সেখানে এসে দেখি, সামান্য হলেও শিল্পী শেখ মোহম্মদ সুলতানের কিছু পরিচয় লেখা রয়েছে একটা বোর্ড-এ। লেখা রয়েছে শিল্পীর নাম শেখ মোহম্মদ সুলতান। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট নড়াইল জেলার মাছিমদিয়া নামক স্থানে। তাঁর ডাকনাম ছিলো লাল মিঞা। তাঁর বাবা ছিলেন দরিদ্র এক রাজমিস্ত্রি।

বাবাকে বাজমিস্ত্রিব কাজে সহাযতা কবতেন লাল মিঞা এবং কাজের ফাঁকে ইঁটের টুকবো খড়িমাটি ইত্যাদি যা পেতেন তাই দিয়ে ছবি আঁকতেন। ১৯২৮ সালে নড়াইল ভিক্টোবিযা কলেজিযেট স্কুলে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয। ১৯৩৩ সালে যখন শেখ মোহম্মদ সুলতান পঞ্চম শ্রেণীব ছাত্র তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায ভিক্টোবিযা কলেজিয়েট স্কুল পবিদর্শনে আসেন। এখানে বলে বাখা ভালো শ্যামাপ্রসাদ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব ভাইস চ্যান্সেলাব এবং সাবা অবিভক্ত বাংলা, বিহাব এবং আসামেব বিদ্যালযসমূহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব অনুমোদনাধীন ছিলো। তখন মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড জাতীয কোন সংস্থা ছিলো না।

শ্যামাপ্রসাদ ইস্কুল পবিদর্শনে এলে সুলতান তাঁব একখানি চিত্রপট (portrait) আঁকেন। সেই চিত্রপট দেখে শ্যামাপ্রসাদ মুগ্ধ হন এবং বাংলাব তৎকালীন গভর্ণমেন্টকে অনুবোধ করে সবকাবী আর্ট কলেজে সুলতানেব অংকন-শিল্প শিক্ষাব ব্যবস্থা কবেন। পববর্তীকালে ধাপে ধাপে শিল্প শিক্ষায এগিযে যান সুলতান এবং শিল্পী হিসেবে সাবা জগতেব শিল্পী সমাজে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে স্বীকৃতি লাভ কবেন।

বোর্ডেব লেখাটি লিখে নেওযা শেষ করলাম। তাব কিছু পবেই কিশোবটির মামা অর্থাৎ শিল্পী সুলতানেব বন্ধুপত্নীব ভাই বাড়ি ফিবলেন। এমন কিছু বযেস নয় তাব। যুবক বলা চলে তাকে। আমি আমাব পবিচয দিযে বললাম, শিল্পীব বাসভূমি ও কর্মভূমি দেখতে এসেছি। জানতে চাই, শিল্পীকে ও তাঁব শিল্পকর্মকে। যুবক সাগ্রহে আমাকে নিযে গিযে তুললেন একেবাবে তাঁব শোবাব ঘবে। বললেন, এই ঘরখানিই আমার শোবার ঘব, আমাব বসাব ঘব, আমার লেখাপড়া কবাব ঘব, আমাব ছবি আঁকাব ঘব এবং আমাব অতিথি-আপ্যাযনেব ঘব। আপনি বসুন দযা কবে।

বসতে বসতেই বললাম, বযেসে তুমি আমাব এতোই ছোট যে তোমাকে আপনি-আজ্ঞে কবতে পাবছি না। সুতবাং তোমাকে তুমিতে নামিযে এনে আমাদেব মধ্যেব দূবত্বটা খাটো করতে চাই। এখন বলো, তোমাব নাম কী! যুবক বললো, তাব নাম দুলাল সাহা।

আমি ঃ তুমি কীভাবে শিল্পী শেখ মোহম্মদ সুলতানের সংস্পর্শে এলে?

দুলাল ঃ সুলতান সাহেব তো বাউলজীবন যাপন কবতেন। আমাব দিদি, যে বৃদ্ধার সঙ্গে আপনি কথা বলেছেন, তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার জামাইবাবু ছিলেন সুলতান সাহেবেব বন্ধু। আমার ছেলেবেলা থেকেই ওঁদের সঙ্গে আমাব পবিচয।

শিল্পী দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। অবশ্য তখন এই দেশেব নাম ছিলো পূর্ব-পাকিস্থান। এই দেশেব তখনকার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পী নিজেকে মানিযে নিতে পাবতেন না। সমসামযিক সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাউল জীবন যাপন করতেন। সেই সময় তিনি আমার দিদিব বাড়িতে দাদাবাবুব সঙ্গেই থাকতেন। এইভাবে কিছুকাল থাকাব পরে আমাব দাদাবাবু মাবা গেলেন। তার ফলে দাদাবাবুব সংসারের দায-দাযিত্ব সুলতান সাহেবের ওপর চেপে গেলো।

এই সময় আমি এলাম। এসে দেখি দিদির এই অবস্থা। এইভাবে জীবনযাপন করছে দিদি তার সন্তানসন্ততি নিযে। আমি আসার পর কাকু, মানে সুলতান সাহেব (আমি সুলতান সাহেবকে দাদাবাবুর বন্ধুব হলেও কাকু বলতাম।) আমাকে বললেন, তুমি তো লেখাপড়া করো। তা লেখাপডা করার সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকাও শেখো। আমাকে দেখে নাকি তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো। তাই বলেছিলেন তুমি আমার কাছে থাকো। এইভাবে আমি কাকুর সংস্পর্শে আসি এবং আমাব লেখাপড়া ও চিত্রাঙ্কনেব জীবন শুরু হয় এখানে। আর্ট স্কুল থেকে পড়াশুনো করে আমি আর্ট কলেজে ভর্তি হই এবং ডিগ্রী লাভ করি।

তুমি : কোথাকার আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রি কোর্স পাস করেছো?

দুলাল : খুলনার আর্ট কলেজ থেকে। সেই আর্ট কলেজে পড়াশুনো করলাম। তারপব ঐ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করে বেরোলাম। তারপর তো কাকু রওনা হয়ে গেলেন, মানে পরপারে চলে গেলেন। এখন এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর বাসভবনেই বসবাস কবছি এবং তাঁব শিল্প সাধনাকে এগিয়ে নিযে যাবার চেষ্টা করছি।

আমি : শিল্পী সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় কী ছিলো?

দুলাল : তাঁর সমগ্র চেতনাব মধ্যে ছিলো শিশুরা। শিশুদেব কথা সব সময তিনি ভাবতেন। এই জন্যে 'শিশুস্বর্গ' নামে একটা ইস্কুল তিনি গড়ে তুললেন। তাবপর আমাদেব বললেন, তোমরা শিশুদের নিযে থাকবে। তাহলে তোমাদের মন সব সময সুন্দর থাকবে। তোমবা অনেক বড়োও হতে পারবে। শিশুদের কাছে তোমাদেব অনেক কিছু শেখার আছে। সেইসব শিখবে। আমি শিশুদের জন্য "শিশুস্বর্গ" নামে যে স্কুলটা গডে দিচ্ছি সেই ইস্কুলকে ঘিরে তোমবা থাকবে। সেই 'শিশুস্বর্গ'কে তিনি লালন পালন করতে থাকলেন। আমবাও সেখানে সবসময তাঁব কাছে থাকতাম। তাঁব নির্দেশমত যাবতীয় কাজ কর্ম ক্লাশ নেওয়া ইত্যাদি আমবা করতাম।

আমি : নয়নের কাছে শুনলাম, এই বাড়িতে আসার পথে বাঁদিকে একটা বাড়ি তৈবি হচ্ছে। সেই বাড়িটা কি এই 'শিশুস্বর্গ'-এর জন্যেই কবা হচ্ছে?

দুলাল : হ্যাঁ! ঐ বাড়িটা হবে 'শিশুস্বর্গ'-এব মূল ইস্কুল। আর এই যে বাড়িটা যেখানে বসে আমরা কথা বলছি, এটা হচ্ছে তাঁর বাসভবন।

আমি : তোমার পরিবারে কে কে আছেন? দিদিতো বয়েছেন দেখছি।

দুলাল : দিদি আছেন। আর আছে আমার দুই ভাগ্নী। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাবা চলে গেছে শ্বশুরবাডি। ছোট ভাগ্নীর নাম পদ্ম। তার ছেলের নাম নয়ন। ওরা মাবে মাঝে এখানে বেড়াতে আসে। এখন আমাদেব সংসার বলতে দিদি আব আমি।

আমি ঃ বাংলাদেশেব সবকাব সুলতান সাহেবেব এই শিল্প সাধনাকে বাঁচিযে রাখার কি কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন?

দুলাল ঃ বাংলাদেশ সবকার আমাদের এখানে শিল্পী সুলতানের প্রতিষ্ঠানের জন্যে একটা আর্টগ্যালাবি করতে চান। এটা আমাদেরও দাবী। কাকু যেভাবে তাঁব 'শিশুস্বর্গ'কে গড়তে চেয়েছিলেন সরকার সেইভাবে গড়ে তুলুক। তাঁর অঙ্কিত যে ছবিগুলি এখন আমাদের কাছে আছে সরকার সেই ছবিগুলি আমাদের এই বাসভবনেই সিল্ করে রেখেছে। এখানে একটা মিউজিয়াম করা হবে। যাবা দূব-দুরান্ত থেকে আসবেন তাঁর ঐ সব ছবি দেখবেন। আমবা চাই, কাকুর আসবাবপত্র ব্যবহৃত জিনিসপত্র একটা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা হোক যাতে দর্শনার্থীরা সেইগুলি দেখার সুযোগ পায়। শিশুদের জন্যে একটা শিশুভবন করা হবে। এমনি করে পুরো একটা শিল্প-সম্মত সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হবে যাতে একজন মহান শিল্পীর স্মৃতিরক্ষার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়। সরকার তাই করবে বলেই শুনেছি।

আমি ঃ আমি দক্ষিণ-ভারতের কেরলেব রাজধানী থিরুবনন্তপুবমে গিয়ে সেখানকার বাজপবিবাবের একজন মহান শিল্পী ববিবর্মার শ্রীচিত্র আর্টগ্যালারি দেখে এলাম। শ্রীচিত্র আর্টগ্যালারিতে রবিবর্মার অঙ্কিত ছবি দর্শনার্থীসাধারণকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হযেছে। এখানেও কি সেইবকম কোন ব্যবস্থা করা হবে যাতে দেশ-বিদেশেব দর্শনার্থীবা এখানে এসে শিল্পী সুলতান সাহেবের শিল্প-সম্পদ দেখতে পাবেন?

দুলাল ঃ হ্যাঁ। সেইবকমই একটা আর্ট গ্যালাবি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সবকাবের সেইবকমই একটা পরিকল্পনা আছে।

আমি ঃ শিল্পী সুলতান সাহেবের আঁকা ছবিগুলো, যা শুনলাম, বাংলাদেশ সরকার ঘরের মধ্যে সিল্ করে বেখে দিয়েছে যাতে সেই অমূল্য সম্পদগুলি নষ্ট না হয। পুলিস পাহারাব ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে চুবি না হয় বা অন্যকোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পরে আর্টগ্যালারিব বাড়ি তৈরি হলে সেইসব ছবি সাজানো হবে। তবে আমার দুর্ভাগ্য যে শিল্পী সুলতান সাহেবের আঁকা ছবি দেখতে পেলাম না তার বাড়িতে এসেও।

দুলাল ঃ তাঁর প্রতিচিত্র (Portrait) রয়েছে দেওয়ালে টাঙানো ঐ দেখুন। অবশ্য ওটা তাঁর আঁকা নয়। আমার আঁকা। এখানে একটি সুন্দব কথা আপনাকে বলি। আপনি একটা সুন্দব নৌকো দেখেছেন নিশ্চয়ই। সেটি রূপসাব ঘাটে নোঙর করা আছে।

আমি ঃ না, আমি এখনো সেই নৌকোটি দেখিনি।



রূপগঞ্জ — সেখ মোহম্মদ সুলতানেব তৈবি বজবা

দুলাল ঃ রূপসাব ঘাটে একটি সুন্দব নৌকো বাঁধা আছে। এই নৌকোটি নির্মাণেব পিছনে সুন্দব একটি দর্শন আছে। সুলতান সাহেব বলতেন, আমরা যে শিশুস্বর্গ করলাম সেই শিশুস্বর্গ আমরা তো জমির ওপর কবলাম। শিশুরা বাসে বা অন্য কোন যানে এক জাযগা থেকে অন্য জাযগায যেতে পাববে। তাহলে এই যে নৌকোটি বানানো হোলো এটি কোন কাজে লাগবে? এটি তৈবি কবা হোলো কেন? এটি হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ শিশুস্বর্গ। এই নৌকো কবে আমাদেব ছেলেমেয়েরা দূর-দুবান্তেব গ্রামে যেতে পারবে। নদীর ধারে যেখানে যেখানে ইস্কুল আছে সেখানে নেমে সেখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পবিচয় করতে পারবে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গেও ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটবে। অন্য ইস্কুলগুলির ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে ছবি আঁকাব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এই আদর্শেব ওপব ভিত্তি করেই শিল্পী এই শিশুস্বর্গ তৈরি করেছিলেন।

আমি দুলালকে বললাম, তোমবা শেখ মোহম্মদ সুলতানেব স্মৃতি জনসমক্ষে তুলে ধবছো এবং তাঁব আদর্শ নিযে শিশুদেব সঙ্গে কাজ কবছো দেখে ভালো লাগলো। তোমাদেব প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা কবি। এখন আমি শিল্পীর তৈবি নৌকোটি দেখে আসি।

দুলাল, তাব দিদি এবং আমাব গাইড কিশোবটিব কাছে বিদায নিযে বাব হলাম পথে যে পথ ধবে এখানে এসেছিলাম। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই পেযে গেলাম একটা বিকসা-ভ্যান। সে অন্য একটা পথ ধবে বাজাবেব ভিতব দিযে নিয়ে এলো। বাজাবে দেখি সাব বেঁধে বই-এব দোকান। কপগঞ্জ একটা ছোট্ট শহব। এই ছোট্ট শহবে বই-এব এতো দোকান! এতো বই বিকোয এখানে! এতো বই কেনে কাবা! তাহলে বাংলাদেশে বই-এব পাঠক-পাঠিকাব সংখ্যা বিপুল পবিমাণে বেড়েছে!

এদেশে আমাদেব পশ্চিমবঙ্গেব মতোই, জনসংখ্যা বৃদ্ধিব হাব বাঁধনছাড়া ঠিকই। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়লেই কি পাঠক-পাঠিকাব সংখ্যা বাড়ে। কই, আমাদেব দেশে তো বাড়েনি। কলকাতাব কলেজ স্ট্রিট ও তাব সংলগ্ন এলাকা নিযে পবিচিত যে বইপাড়া তাব বাইবে থাকা বই-এব দোকানেব সংখ্যা নিতান্তই কম। পশ্চিমবঙ্গেব জেলা শহব ও মহকুমা শহবে যে দু চাবটে কবে বই-এব দোকান আছে সেগুলো সাবা বছব চলে টিম টিম্ করে। কোনবকমে টিকে আছে তাবা।

গ্রন্থ ক্রেতাদেব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রশ্ন জাগে লোকে বই কেনাব অর্থ কোথায পাবে। আব পেলেও লোকে এতো জিনিস থাকতে বই কিনবে কেন! চরম ভোগবাদের (consumerism)-এব দিনে নিত্য নূতন ভোগপণ্য কিনতেই ফতুর হচ্ছে লোকে। তাবপর বই কেনাব মতো টাকা কি আব অবশিষ্ট থাকে! তাছাড়া, আধুনিক নানা ভোগ্যপণ্য ভোগ কবতে কবতে বইপড়াব বোগটা গেছে সেবে। ইস্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয থেকে বার হতেই সেই যে মা-সবস্বতী ছাত্রছাত্রীদেব ফেযাব-ওযেল্ জানালেন তাবপব সেই তরুণ-তকণীবা তো আব মাযেব মুখ দর্শনের ফুবসুত পাযনি। ভোগের উপকবণেব সংস্থান কবতে টাকা বোজগাবেব ধান্ধায কাটে সারাটা দিন। বইপড়াব সময় কোথায় পাবে তারা!

কিছু দিন আগেও বেওয়াজ ছিলো বিয়ে-সাদীতে বই উপহাব দেওয়ার। তার ফলে উপহার দাতা ও গ্রহীতা বইগুলি অন্ততঃ উল্টে-পাল্টে দেখতেন। চাই কি দু'চার পাতা পড়েও ফেলতেন। এখন, ভুলেও কেউ বই উপহাব দেয় না। উপহাব দেয় ভোগ্যবস্তু।

আমাকে তাব বিকসা-ভ্যানেব ওপব আনমনে চুপটি করে বসে থাকতে এবং নামার নাম নেই দেখে ভ্যানঅলাটি বললে, বাবু, নদীর ঘাটে আসে পড়লাম আমরা। তাইতো! সম্মুখে দেখি নদী। কাকেব চোখেব মতো পরিষ্কার তার জল। এই জলেব ওপব দিয়ে তো আর বিকস্যাভ্যান যাবে না। নামতে নামতে জানতে চাইলাম এই নদীটার নাম কী ভাই। ভ্যান-অলাভাইটি বললে, হ্যার নাম চিত্রা নদীবাবু।

বাঃ! সুন্দর নামটি তো! এখানকার নদীদেব এতো শ্রুতিমধুর নাম কারা বেখেছে। এই এক অদ্ভুত প্রশ্ন দেখা দিল মনে। ছেলেমেযেদেব নাম বাখে বাপমায়ে। কিন্তু নদীর নাম

কারা রাখে। কেন, লোকে রাখে! যারা নদীকূলে বাস করে সেই লোকেরা বাখে। এতসব উদ্ভট প্রশ্নও কিলবিল করে ছোট্ট মাথাটার মধ্যে।

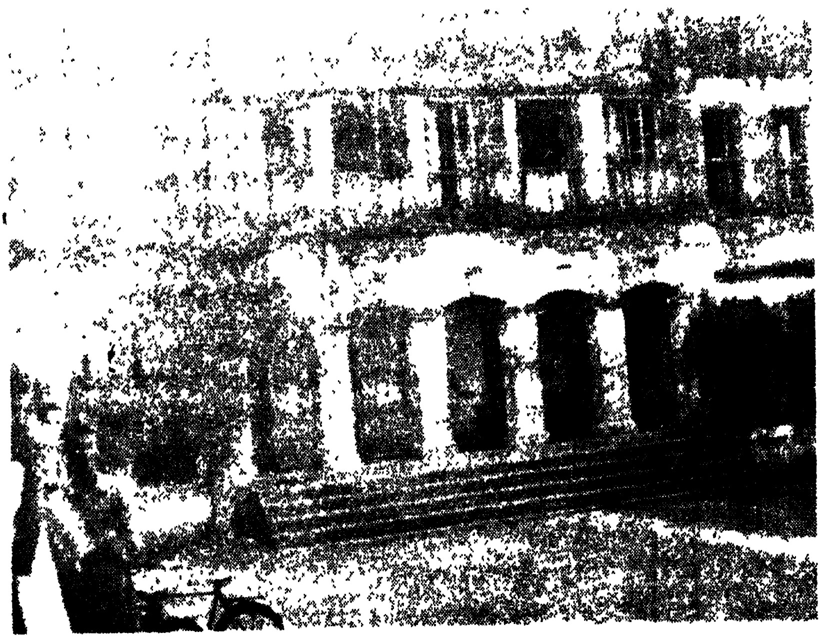
যাঃ! ছেড়ে দিলো খেয়া নৌকোটা আমি জলের ধারে আসার আগেই। হাঁক পাড়লাম ফিরে এসে আমাকে তুলে নেবার জন্যে। শুনে মাঝ-দরিয়া থেকে মাঝি হাত তুললো। অর্থাৎ একটু ঠাড়েন কত্তা। মানুষগুলানে ওপাড়ে লামাইয়া দিয়া আইতাছি। অগত্যা। তাই এসো বাপ্‌জান। আমি ততোক্ষণ "তুমি এপার ওপাব কবতে গো, ওগো পারের নেয়ে।' গান খানার মনে মনে সুর ভাঁজি। গলায় তো সে সুর আসেনা !

তা এলো। পারের নেয়ে তার খেয়া তরীখানি নিয়ে এসে তুলে নিলো আমাকে। তারপর নদীপার হতেই বাসস্ট্যান্ড। আধঘণ্টার মধ্যেই বাসখানি পৌঁছে দিলো আবার এক নদীর ধারে। এই নদীর নাম নবগঙ্গা। দক্ষিণবঙ্গে এতো নদীও আছে ! দু'পা যেতে না যেতেই আবার নদী। কিন্তু নবগঙ্গায় সেতু নেই। যাত্রীসমেত বাস পার করার জন্যে আছে বিশাল্ ফেরি। ফেরিগুলো একসঙ্গে পাঁচসাতটি বাস ও লরি নদীপার কবে দিতে পারে। কিন্তু ফেরিটা যে এখন ওপারে। তাব ওপর বাস, লরি, মোটরগাড়ি, এইসব উঠছে। অতএব অপেক্ষা করো, ঘাটে বসে নবগঙ্গার ঢেউ গোনো।

না, বেশি ঢেউ গুনতে হোলো না। দেশি একটা খেয়ানৌকো লাগলো ঘাটে। মাঝি বললে উঠে পড়েন কত্তা। আমার পিছু পিছু তিনজন যুবকও উঠলো দেশি নৌকোটায়। পারের পথে মাঝদরিয়ায় খেয়া নৌকোতেই পরিচয় হোলো যুবক তিনটিব সঙ্গে। ওরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বার হয়েছে। আমি কলকাতা থেকে বাংলাদেশ দেখতে এসেছি জেনে খেয়ার কড়ি আমাকে দিতে দিলো না। ওরাই মেটালো।

এপারে নদীর চর বেয়ে বেশখানিক হেঁটে এসে উঠলাম অশত্থ তলায়। যেখানে যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করছে রিকসাভ্যান। ছেলে তিনটি বললে উঠে পড়েন, স্যার। আমরা সেইভ্যানে চড়ে মিনিট পঁচিশের মধ্যে পৌঁছে গেলাম কালিয়া। যুবক তিনটি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলো।

কালিয়াকে গ্রাম বলবো না শহর বলবো! এখন নড়াইল জেলার একটা থানা হয়েছে এবং সেই সুবাদে কালিয়া একটা শহরে পরিণত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু কালিয়া আগে ছিলো একটা গ্রাম। অবশ্য খুব প্রাচীন আর বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিলো কালিয়া। এই গ্রামে বাস করতো সেন গোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার। শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতি-সভ্যতায় সরকারীপদ-গৌরবে, ধনসম্পদে উন্নত পরিবারগুলি ছিলো কালিয়ার গৌরব। সেইসব পরিবারের উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি এখন কালিয়ায় বাস করেন কিনা জানতে পারলাম না। শুনলাম, তাঁদের কেউ এখানে নেই। কিন্তু তাঁদের বিশাল বাড়িগুলো পড়ে আছে এখানে একান্ত অবহেলায় অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে। বাড়িগুলো যেন মৃতের রাজ্যের বাড়ি। যেন কোন রাক্ষসীর মরণ-কাঠির স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে আছে বাড়িগুলো। কোন বাড়ির কোন এক নিস্তব্ধ



কালিয়া --- সেন পরিবারের বাড়ি।

কক্ষে মৃতরাজকুমারী পালঙ্কে পড়ে আছে কি। রাজপুত্র এসে জীয়ন-কাঠি ছুঁইয়ে দিলেই বেঁচে উঠবে রাজকুমার!

অতীতের গৌরব-বাহী বাড়ির একটা মোহ আছে। সেই মোহতেই আমি যেন মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই অতীত দিনের রীতি অনুসারে পূজোর সময় সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কালিয়ায় ফিরে এসেছেন সেন পরিবারের খ্যাতিমান মানুষেরা। তাঁদের সাজপোশাক, রূপের জৌলুস, ব্যাক্তিত্বের মহিমায় কালিয়া গ্রামের মানুষেরা বিস্ময়াবিষ্ট। বাড়িগুলি নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে, লোকজনে পূর্ণ হয়ে, জীবনদীপ্ত হয়ে উঠেছে। এইরকম একটা বাড়ির ফোটো নেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা তাক করলাম। পরমুহূর্তেই সম্বিৎ ফিরে এলো। মনে মনে হাসলাম আমি। বাড়িটা জীবন-চাঞ্চল্যে উদ্দিপ্ত হয়ে উঠেছে বাস্তবে নয়, আমার আবিষ্ট মনে।

একটি সুদর্শন কিশোর রাস্তার ওপার থেকে আমার কাছে দাঁড়ালো। হয়তো, ক্যামেরায় ছবি তুলছি দেখে সে বুঝেছে আমি আগন্তুক এখানে। তাকে বললাম, তুমি কি আমাকে

এমন কোন ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাবে, যিনি কালিয়া সম্পর্কে কালিযাব সেনদেব সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন। কিশোবটি বললো, আসুন আমার সঙ্গে। কিশোরটিব সঙ্গে এলাম খুবই বড়ো প্রাসাদতুল্য এক সৌধ-সংলগ্ন পূজো বাড়িতে।

ঢুকেই দেখি, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি দেব-দেউল, তাদের মাথাব চুড়ায়, দেওয়ালের গায়ে, নীচের মেঝে ও বারান্দায়, আগ্রাসী বট-অশত্থ-ডুমুবের জটলা। বারান্দাব নীচে বিস্তৃত অঙ্গন ঘাস ও আগাছায ভর্তি। উঠোনের অপর পাশে প্রাচীন দালানের সুমুখ-খোলা সু-উচ্চ চৌখুপি চাতাল। দীর্ঘসিঁড়ির সাবি বেয়ে উঠে গেলাম চাতালে। সেখানে মেঝেয় পাতা মাদুরে বসে সাত-আটটি ছাত্রছাত্রীকে পড়াচ্ছিলেন এক তরুণ শিক্ষক। পাঠনে এমনি মগ্ন যে শিক্ষকটি আমাদের উপস্থিতি টেব পান নি। আমার সঙ্গী কিশোবটি বললে, স্যার ! ইনি এসেছেন কলকাতা থেকে। তরুণ শিক্ষক সাদরে আমাকে বসালেন তাঁর পাশে।

আমি বললাম, বয়েসে তুমি তরুণ। বয়েসে প্রবীণ আমি যদি তোমাকে আপনি-আজ্ঞে করি মোটেই ভালো শোনাবে না। তাই তোমার অনুমতি না নিযেই তুমি বলছি তোমাকে। এখন বলো তোমার নাম কি? তরুণ শিক্ষকটি বললো, আমার নাম শ্রীস্বপন কুমাব বিশ্বাস।

আমি : তুমি এখানে কী কর?

স্বপন : আমি এই কলেজের বিজ্ঞানের প্রভাষক।

আমি : অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে লেক্‌চারার তুমি এই কলেজের বিজ্ঞানের সেই লেকচাবাব। লেক্‌চারাব-এব ভারি সুন্দর বাংলা করা হয়েছে প্রভাষক। এখন বলো, এই যে বাড়িটা, যেখানে কলেজ হয়েছে, কাদেব ছিলো? কালিয়াব এই প্রাচীন বাড়িটা সম্পর্কে তোমাব নিশ্চয়ই কিছু জানা আছে। আমাকে বলো এই বাড়িটার কথা।

স্বপন : এই বাড়ির মালিক ছিলেন, আমি যতোটুকু জানি, ভামিনীরঞ্জন সেন। পাকিস্থান হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁবা এখানে বসবাস করতেন। অবশ্য ওপাশের বাংলাদেশও তার মানে পশ্চিম বাংলাতেও তাঁদের বাড়ি ছিলো আগে থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে তাঁদের বাড়ি ছিলো। বর্ধমানের দেবরঞ্জন সেন, যিনি পরপর তিনবার এম এল এ (?) হয়েছিলেন, ছিলেন ভামিনীরঞ্জন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি এখনো জীবিত আছেন কিনা আমার জানা নেই। ১৯৯৪ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর যখন পূর্ববঙ্গ পাকিস্থান হোলো সেই পাকিস্থানী আমলে তাঁরা একবারও এখানে আসেননি। তবে পাকিস্থানের কবলমুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ যখন বাংলাদেশ হোলো তখন ১৯৭৩ সালে দেবরঞ্জন সেন মশাই একবার এই কালিয়ায় এসেছিলেন।

আমি ঃ ১৯৪৭-এর আগে কি ভামিনীরঞ্জন এবং তাঁব পুত্রেবা এখানে থাকতেন?

স্বপন ঃ সকলে থাকতেন না। তবে ১৯৪৭-এর আগে প্রতি বছর পুজোব সময তাঁরা এখানে আসতেন এবং কালীপূজো পর্যন্ত এই কালিযায় থেকে যেতেন।

আমি ঃ আমি বিভিন্ন লোকের কাছে শুনলাম, এই সেন বংশে নাকি সতেব-আঠারো জন আই সি এস অফিসার ছিলেন যাঁরা অবিভক্ত ভারতের নানাস্থানে কর্তব্যরত ছিলেন।

স্বপন ঃ হ্যাঁ। এটা আমিও শুনেছি। তবে তাঁবা কেবলমাত্র এই সেনবাড়িব নয়। কালিয়ায় সেন পবিবার বলতে আবো অনেক সেন পরিবার ছিলো। সেইসব পবিবারের, আমি শুনেছি, একুশ জন আই সি এস ছিলেন।

আমি ঃ অর্থাৎ এই কালিয়ায় যেসব সেন পরিবাব ছিলো সেই সব পরিবারের সেনদের একুশজন আই সি এস ছিলেন। তাঁরা কোন একটা বিশেষ সেন পরিবারের ছিলেন না।

স্বপন ঃ আমাব মনে হয় তাই হবে।

আমি ঃ প্রখ্যাত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন-এর সঙ্গে এখানকাব কোন সেন পরিবারের সম্পর্ক ছিলো কি ?

স্বপন ঃ এই বাড়ির মানে, স্বর্গত ভামিনীবঞ্জন সেন-এর বাড়িব সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিলো না। রাস্তার ওপাশের একটা বাড়ির সেনদের সঙ্গে তাঁর (সুচিত্রা সেনের) সম্পর্ক ছিলো বলে শুনেছি। সম্ভবত সেই সেন বাড়ি তাঁর (অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের) মামার বাড়ি ছিলো। আগেকার লোক তো এখন এখানে কেউ নেই। কেউ কেউ বলে ওটা বানানো কথা। তবে এই বাড়িটা যেমন মোটামুটি অক্ষত আছে, সেইরকম অক্ষত হয়ে অন্য কোন সেনদের বাড়ি নেই। এই বাড়িটা কলেজকে দেওয়া হয়েছে বলে এর বক্ষণাবেক্ষণ হয় এবং তার ফলেই টিকে আছে বাড়িটা।

আমি ঃ শুনেছি, পাকিস্থানের কবলমুক্ত বাংলাদেশের জন্মের পর বৎসর এই বাড়িতে কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এই কলেজের নাম কী ?

স্বপন ঃ এই কলেজের নাম শহিদ আবদুল সালাম কলেজ। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন বলে শুনেছি।

আমি ঃ এখনো কি কলেজটিব একই নাম আছে ?

স্বপন ঃ হ্যাঁ ! কলেজ্জের একই নাম আছে। তবে বর্তমানে ডিগ্রি কোর্স চালু হওয়ার পর এই কলেজের নাম হয়েছে শহিদ আবদুল সালাম ডিগ্রি কলেজ।

আমি ঃ এই কলেজে কি কি বিভাগ আছে?

স্বপন ঃ এই কলেজে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স, এই তিনটে বিভাগই আছে।

আমি ঃ কতোজন ছাত্রছাত্রী এই কলেজে পড়ে?

স্বপন ঃ প্রায় সাতশো ছাত্রছাত্রী এই কলেজে পড়ে।

প্রভাষক স্বপন বিশ্বাসেব কাছে উঠোনেব অপব পাশেব মন্দিবগুলো দেখাব ইচ্ছা জানালাম। সে ছাত্রছাত্রীদেব সামান্য সময বসতে বলে আমাকে সঙ্গে নিযে মন্দিব দেখাতে উঠে এলো। মন্দিবগুলি দক্ষিণমুখী। পূর্ব থেকে পশ্চিমে সাব বেধে দাড়িযে আছে। সব পূর্বদিকেব মন্দিবটি শিব মন্দিব। তাব ঠিক পশ্চিমপাশেই দুর্গামন্দিব। তাব পশ্চিমে বযেছে কৃষ্ণ মন্দিব। সর্বপশ্চিমে বথেব মন্দিব। এটিকে মন্দিব না বলে বথেব গ্যাবেজ বলাই ভালো। গ্যাবেজ বন্ধ ছিলো। চাবি থাকে পুবোহিতেব কাছে। স্বপন তাঁব কাছে খবব পাঠাতেই চাবি হাতে পুবোহিত এলেন এবং বথেব গ্যাবেজেব প্রশস্ত দবজা খুলে দিলেন



কালিযা - সেন পবিবাবেব পিতলেব বথ।

ভিতবে পিতলেব বথ। মাঝাবি আকাব। বথেব ডানদিকেব একটু অংশ ভাঙা। বাববি মসজিদ ভাঙাব মূল্য দিতে হযেছে বথখানিকে।

স্বপনেব কাছে বিদায নিযে কালিযাব মাঝ ববাবব যে প্রশস্ত পথ সেই পথটা ধবে হাঁটতে শুরু কবলাম। বেশ খানিকটা হাঁটাব পব ডানদিকে পডলো দোতলা একটা বিশাল বাডি। শুনলাম এই সুদৃশ্য বাডিটা বর্তমানে ডাকবাংলো।



কালিয়া — উদয়শঙ্কব ববিশঙ্করদেব পৈত্রিক বাড়ি বর্তমানে ডাকবাংলো

এই বাড়িটাই আগে ছিলো বিশ্ববিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়শংকর এবং সেতার বাদক ববিশংকরদেব পৈত্রিক ভবন। বাংলাদেশ সরকার বাড়িটিকে অধিগ্রহণ করে সম্প্রতি ডাকবাংলোয রূপান্তরিত করেছে।

কালিয়ায আবো অনেক কিছু দেখাব আছে নিশ্চয়ই। এই ঐতিহ্য সম্পন্ন স্থানের দর্শনীয স্থানও কি শেষ হযে গেলো। আবার সেই বাস্তাটা ধবে হাঁটতে শুরু কবলাম। খানিক যেতেই ভেসে উঠলো পাশে উঁচু এক গেটের ওপর লেখা "কালিয়া প্যারীশংকর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।" কে ছিলেন প্যারীশংকব যাঁব নামে নামকরণ করা হয়েছে এই বালিকা বিদ্যালয়েব! তিনি কি উদয়শংকবদের পবিবারভুক্ত ছিলেন! তাঁর দান ও উদ্যমেই কি গড়ে উঠেছিলো "কালিয়া প্যারীশংকর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়"টি ? মনের মধ্যে এই প্রশ্নটি মাথা চারা দিতেই বিদ্যালয় ভবনে ঢুকে পড়লাম।

বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকারা নেই। ছুটি হয়ে গেছে তাদের। কযেকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক ওদিক করছেন। তাঁদেব পোশাক পরিচ্ছদে ফুটে উঠেছে

তারা শিক্ষক শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষিকার অফিস কোথায় জিজ্ঞাসা কবতেই একজন শিক্ষক বললেন এই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা নেই। আছেন প্রধান শিক্ষক। ঐ যে প্রধান শিক্ষকের ঘর। অবাক হয়েই ভাবছি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান হবার মতো শিক্ষিতা অভিজ্ঞা মহিলা কি বাংলাদেশে নেই। অথচ সারা ভারতের শিক্ষিতা মহিলাদেব জন্মভূমি তো ছিলো অবিভক্ত বাংলার এই অংশেই। প্রধান শিক্ষক মশাই তাঁব ঘর থেকে বেবিযে আসছিলেন। আমাকে দরজার সম্মুখে দেখেই দাঁড়িযে পড়লেন। আত্মপবিচয দিতে আমাব নাম বললাম। আব বললাম কোথা থেকে কোন উদ্দেশ্য নিযে এখানে এসেছি। এইটুকু মাত্র শুনেই প্রধান শিক্ষকমশাই খপ্ করে আমার হাত ধরে বললেন, পেয়ে গেছি।

আমার তখন হতবাক হবাব অবস্থা। এব পবেই বলে উঠবেন নাতো, "ভৈববী প্রেরিতোহসি , মমানুসর ; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।" একটু ভয়ে ভয়েই বাক্যস্ফূর্তি হোলো। জানতে চাইলাম, কী পেযে গেছেন ?

প্রধান শিক্ষক মশাই বললেন, অতিথি।

কীসের অতিথি জানতে চাইলে বললেন সে সব অকুস্থলে জানতে পাববেন। বলেই আমাকে নড়া ধরে হিড় হিড় কবে টেনে এনে হাজির করলেন ইস্কুলেব হল্ঘবে। সেখানে দেখি মাঝখানে বড়ো একটি টেবিলে শোভা পাচ্ছে ভাত ডাল তবিতবকাবি মাছ মাংস দই মিষ্টি। সেইসব লোভনীয় খাদ্যেব সুঘ্রান ক্ষুধার্ত আমাব ঘ্রাণেন্দ্রিযে গিযে অর্ধ-ভোজনেব পরিবর্তে ভোজনের আকাঙ্ক্ষাটিকেই তীব্রতর কবে তুলল। হলঘবেব চাবিদিকে দেওযাল ঘেঁষে টেবিল। তাদের পেছনে চেযাবে বসে আছেন পনেরো কুড়িজন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পবিচালন সমিতির সদস্যরা।

সুরসিক প্রধান শিক্ষক মশাই ঘোষণা কবলেন এখানে উপস্থিত হতে আমাব সামান্য দেবি হলো। কারণ আমি অতিথিব অন্বেষণে ছিলাম। তা অতিথিব জন্যে আমাব প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। তাবপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, আজ ইনিই আমাদেব প্রধান অতিথি। তখন ঘরে উপস্থিত সকলেই সমস্বরে এবং উল্লাসেব সঙ্গে আমাকে তাঁদের অতিথিব আসনে বরণ কবে নিলেন।

এঁরা প্রায় সকলেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা। আব আছেন রূপালী ব্যাংকেব স্থানীয় শাখার ম্যানেজার এবং শিক্ষাবিভাগের জনৈকা অফিসাব। কথায কথায জানতে পাবলাম, ব্যাংক ম্যানেজার এবং শিক্ষা বিভাগের অফিসার এসেছেন ছাত্রীদেব প্রাপ্য উপবৃত্তির অর্থ ও তাদের বিলি ব্যবস্থা (disburse) কবতে। তাঁদেব সম্মানেই এই ভোজের আয়োজন। আমি এখানে উড়ো-খৈ মাত্র। উড়ে এসে সময় মতো পড়েছি যথাস্থানে। তবুও সম্মানীয় অতিথিরূপে গোবিন্দকে নিবেদন করলেন উপস্থিত সকলে। আনন্দ ও তৃপ্তিব সঙ্গে ভোজন কবলাম।

খাওয়া দাওযার পালা চুকলে সকলে এসে বসলাম প্রধান শিক্ষক মশাই-এব অফিস ... শিক্ষক মশাই এর কাছে জানতে পারলাম পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

এই মাধ্যমিক বিদ্যালযে এক হাজাবের মতো বালিকা লেখাপড়া কবে। কিন্তু শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে আছেন মাত্র বারো জন। তাব মানে শিক্ষক শিক্ষিকা পিছু ছাত্রী সংখ্যা আশী জনেবও বেশী।

স্কুলগুলি যখন বিশ্ববিদ্যালযের অধীনে ছিলো তখন শিক্ষক পিছু ছাত্র বা ছাত্রী সংখ্যা ছিলো কুড়ি জন মাত্র। তখন শিক্ষকেব সঙ্গে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রীব ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতো। প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রীব প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিতে পাবতেন শিক্ষক বা শিক্ষিকা।

যোগ্যতা হিসেবে প্রধান শিক্ষককে অন্ততঃ বি এ অথবা বি এস সি এবং বি এড হতে হবে। আব চাই শিক্ষকতাব দশ বছবেব অভিজ্ঞতা। সহকাবী প্রধান শিক্ষকেবও অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই। সহকাবী শিক্ষকদেব আবাব দুটো শ্রেণী আছে। সহকাবী সিনিযব শিক্ষক এবং সহকাবী শিক্ষক। সিনিযব সহকাবী শিক্ষকেব শিক্ষাগত যোগ্যতা বি এ অথবা বি এস সি। সহকাবী শিক্ষকেব শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য। তাঁদেব বি এ অথবা বি এস সি হতে হবে এমন কথা নেই।

মাসিক বেতন হিসেবে বর্তমানে প্রধান শিক্ষক পান ৪১০০ টাকা। সহকারী প্রধান শিক্ষক পান ২৮৫০ টাকা। সিনিযব সহকাবী শিক্ষকেব বেতন ২৩৫০ টাকা এবং সহকাবী শিক্ষকেবা পান ১৭৫০ টাকা।

বাংলাদেশ সবকাবেব শিক্ষাবিভাগেব যে অফিসাব মহোদযা এসেছেন তাঁব কাছেও আমাব কতকগুলি প্রশ্ন ছিলো। তাঁব কাছে প্রশ্নগুলি কবাব অনুমতি চাইলাম এবং তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। আমি প্রথমেই জানাতে চাইলাম তাঁব নাম কি। তিনি বললেন তাঁব নাম মিসেস আইবিন পাবভিন্।

আমি ঃ আপনি শিক্ষাবিভাগেব কোন কাজেব দাযিত্ব গ্রহণ কবেছেন ?

মিসেস পাবভিন ঃ নড়াইল জেলাব কালিযা থানাব বালিকা বিদ্যালযগুলিব বালিকাদেব উপবৃত্তি প্রদানেব দাযিত্ব আমাব ওপব অর্পিত হযেছে।

আমি ঃ উপবৃত্তি ব্যাপারটি কী?

মিসেস্ পাবভিন ঃ বালিকাদেব মধ্যে শিক্ষাব প্রসাবেব জন্যে আমাদেব সবকার বিশেষ একটা বৃত্তিব ব্যবস্থা কবেছেন। সেই বৃত্তিটার নাম উপবৃত্তি।

আমি ঃ বিদ্যালযেব প্রতিটি বালিকাকেই কি এই উপবৃত্তি প্রদান কবা হয?

মিসেস পাবভিন ঃ এই উপবৃত্তি লাভ কবাব জন্য ছাত্রীদেব কযেকগটি শর্ত পালন কবতে হয। সেই শর্তগুলি যাবা পূবণ কবে কেবল মাত্র সেই ছাত্রীরাই এই উপবৃত্তি লাভে যোগ্য বিবেচিত হয।

আমি ঃ সেই শর্তগুলি কী কী? বলবেন কি?

মিসেস পাবভিন ঃ অবশ্যই বলবো। প্রথম শর্তটি হোলো ছাত্রীটি যদি বিবাহিতা হয তাহলে সে এই উপবৃত্তি লাভেব যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ ছাত্রীটিকে

অবিবাহিতা হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হোলো, বছরে ইস্কুলে যত দিন ক্লাশ হবে তাব অন্তত ৭৫ শতাংশ দিন ছাত্রীটিকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হবে। আব তৃতীয় শর্তটি হোলো, পরীক্ষায ছাত্রীটিকে প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বব পেতে হবে।

আমি ঃ এই উপবৃত্তির পরিমাণ কত?

মিসেস পাবভিন ঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীব ছাত্রীরা পায় মাসিক ১৫০ টাকা। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীবা পায় মাসিক ১৭০ টাকা। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীরা পায ২১০ টাকা। নবমশ্রেণীর ছাত্রীরা পায ৬১০ টাকা এবং দশম শ্রেণীব ছাত্রীরা পায় মাসিক ৬৯০ টাকা।

আমি ঃ এই উপবৃত্তি কি প্রতিমাসেই ছাত্রীদের হাতে দেওযা হয়?

মিসেস পারভিন ঃ প্রতিমাসে ইস্কুলে ইস্কুলে এসে ছাত্রীদের হাতে উপবৃত্তির টাকা দেওযা সম্ভব হয় না। তাই আমরা প্রতি ছয মাসে একবাব করে আসি এবং সেই সময ছাত্রীদেব হাতে উপবৃত্তির টাকাটা তুলে দিই।

আমি ঃ কোন ব্যাঙ্ক থেকে আপনাব এই সাহায্য বা উপবৃত্তিব অর্থ পেযে থাকেন?

মিসেস পাবভিন ঃ উপবৃত্তির জন্য এই অর্থ সাহায্য আমবা এই দেশেব কোন ব্যাঙ্ক থেকে পাই না। এশিয়ান উন্নযন ব্যাঙ্ক আমাদের সবকাবকে এই অর্থ দিযেছে। সরকার আবাব এই অর্থ গ্রহণ ও বিলি ব্যবস্থার ভার দিয়েছে রূপালী ব্যাঙ্ককে। রূপালী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আমরা এই উপবৃত্তিব টাকা ছাত্রীদেব দিযে থাকি। সেইজন্যেই তো রূপালী ব্যাঙ্কেব স্থানীয শাখার ম্যানেজাব সাহেব আজ এখানে এসেছেন।

আমি ঃ উপবৃত্তিব এই ব্যবস্থা চালু করে কি আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন, অভিভাবকদের মধ্যে তাঁদের মেযেদেব শিক্ষিত কবে তোলাব আগ্রহ বাড়ছে ?

মিসেস পাবভিন ঃ অবশ্যই বাড়ছে। অনেক বাড়ছে।

আমি ঃ দেশে শিক্ষাব প্রসাব, বিশেষ কবে মেযেদেব মধ্যে শিক্ষার প্রসাব, যথেষ্ট বাড়ছে বলে মনে কবেন আপনি?

মিসেস পারভিন ঃ নিশ্চয়ই । আমবা সাংঘাতিক আশাবাদী। যেকোন একটা লক্ষ্যেব শতকবা একশোভাগ কৃতকার্য হয না। তবে আমাদেব বিশ্বাস, আমরা শতকবা একশোভাগেব কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবো।

আমি ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিসেস পাবভিন। নারী শিক্ষা প্রসারেব অন্যতম উপায় হিসেবে গৃহীত উপবৃত্তি প্রদান সম্পর্কে আপনার কাছে অনেক তথ্য জানতে পাবলাম।

মিসেস পারভিন ঃ আপনাকেও আমাদেব অশেষ ধন্যবাদ। আপনি ভাবত থেকে এতো কষ্টে করে এসেছেন। আমাদের কাছে অনেক বিষয়ে জানতে চাইছেন এবং আপনাকে আমরা জানাবাব সুযোগ পাচ্ছি।

এরপর আমি "কালিয়া প্যারীশংকর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়"-এর প্রধান শিক্ষকমশাই এর সঙ্গে কথা বললাম। বললাম, আপনার নামটি দয়া করে বলুন। প্রধান শিক্ষকমশাই বললেন তাঁর নাম শেখ মোহম্মদ সাদাত হোসেন।

আমি ঃ আপনি কতো দিন এই ইস্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করবেন?

হোসেন সাহেব ঃ আমি ১৯৬০ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করছি।

আমি ঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হচ্ছে?

হোসেন সাহেব ঃ নানারকম সুযোগ সুবিধে পাওয়ার ফলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ খুবই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি ঃ পশ্চিমবঙ্গে ছেলেদের মতোই মেয়েদের মধ্যেও শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের জীবনের শেষ লক্ষ্য হিসেবে তাদের বিয়ে দেওয়াটাকেই ধরে নেওয়া হয়।

হোসেন সাহেব ঃ এখানেও তাই। কিন্তু শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা একটু কমেছে।

আমি ঃ তাহলে এই উপবৃত্তি প্রথাটা মস্ত বড়ো একটা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। তাই নয় কি?

হোসেন সাহেব ঃ চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েদের বেশি করে সুযোগ সুবিধে দেওয়ার ফলে শিক্ষার প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে। উপবৃত্তি প্রথার সঙ্গে চাকরি প্রাপ্তির সুযোগও এই সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে।

আমি ঃ মেয়েদের চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে?

হোসেন সাহেব ঃ সমাজের সবক্ষেত্রেই এই সুযোগ বাড়ছে। অবশ্য সবচেয়ে বেশি বাড়ছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এই রকম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানে শিক্ষকতার কাজে ৬০ শতাংশ মহিলা নিযুক্ত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একশো শতাংশ পদে কেবলমাত্র শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ১০ শতাংশ শিক্ষিকা থাকা আবশ্যিক। ইস্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাহলে বুঝতেই পারছেন ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ এখন বেশি। আর এই জন্যেই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অভিভাবকদের বেশি আগ্রহ।

এই সব কথাবার্তার পর আমি বিদায় চাইতেই প্রধান শিক্ষক শেখ মোহম্মদ সাদাত হোসেন সাহেব বললেন, সে কি! আজ আপনি আমাদের কাছে থাকবেন। আপনার সঙ্গে আলোচনার এখনো কতো কথা রয়েছে। সে সব কথাবার্তা তো হোলোই না।

বললাম, হোসেন সাহেব! মাত্র তিরিশ দিনের সময় নিয়ে বাংলাদেশ দেখতে এসেছি। এই তিরিশ দিনের মেয়াদে যতোটা পারি বাংলাদেশকে দেখতে চাই। তাই এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে অন্য জায়গাগুলি অদেখা অজানা থেকে যাবে। আজ আমাকে গোপালগঞ্জ যেতেই হবে। এখন বলুন, কীভাবে সেখানে যাবো।

ডাকবাংলোর সামনে আছে বেবি-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। যেখান থেকে ছেড়ে বেবি-ট্যাক্সি যায় মধুমতীর খেয়াঘাট। বেবি-ট্যাক্সিটা অটো রিক্সার একটা নতুন সংযোজন। অটো রিকসার ড্রাইভারের অংশটা রেখে ছেটে দিয়েছে পিছনের অংশ। তার জায়গায় জুড়ে দিয়েছে দুপাশে দুই বেঞ্চি বসানো ছোট্ট একটা কামরা। তার পিছন দিকটা খোলা যাত্রী ওঠানামা করার জন্যে। চারজন করে দুপাশে আটজন বসতে পারে গাদাগাদি করে। তবে এই অধমাধমের মতন গায়ে-গতরে একটু আছেন এমন আয়তনের আটজন নয়। একটু শুটকো গোছের যাত্রী হলেই ভালো হয়।

কালিয়া থেকে মধুমতীর ঘাট, এই পথটা যখন বানানো হয়েছিলো তখনকার মানুষজনেরা কবে বেহেশ্‌তে চলে গেছে। সেখানে স্থান হবে না বলেই পড়ে আছে রাস্তাটি। সোজা কথায় যমের অরুচি আর কি! কতোকাল যে রাস্তাটার ওপর পিচ আর পাথর পড়ে নি ইতিহাস খুঁজলে হয়েতো পাওয়া যাবে। সত্যি বলতে কি, রাস্তার এই হাল বাংলাদেশে এসে আমি প্রথম দেখলাম। মাঝে মাঝে রাস্তাই নেই। জমির ওপর নেমে পড়ছে গাড়ি। তারপর যাত্রীরা পিছন-ঠেলা দিয়ে গাড়িটাকে তুলছে আবার রাস্তার দেখা পেলে।

তবে এমন রাস্তায় বেবি-ট্যাক্সিতে চড়ার মস্ত একটা সুবিধে আছে। মুড়ির টিনে ঝাঁকানি দিলে যেমন আরো মুড়ি ধরে, রাস্তায় ঝাঁকানি খেয়েও বেবি-ট্যাক্সিখানায় যাত্রী-যাত্রিনীদের মধ্যে যেন একটা জড়ামরি লেগে গেলো। মনে হোলো আরো দু-চারজন যাত্রী ধরবে আমাদের মুড়ির-টিন মার্কা বেবি-ট্যাকসিখানিতে।

আমার গায়ে পড়েছিলেন যে ভদ্রলোক, গায়ের পড়েই তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন। জানতে চাইলেন, আমার আসা হচ্ছে কোত্থেকে। কলকাতা থেকে আসছি শুনেই গাড়ির সব ক'জন মেয়েপুরুষ যেন চনমনিয়ে উঠলেন। তাঁদের ভাবখানা, বলেন কি! কলকাতা! সে যে অনেক দূর! যাকে বলে রাজার দেশ! তা মশাই-এর যাওয়া হবে কোথা? বললাম, বাংলাদেশ দেখতে এসেছি। বাংলাদেশেরই নানাস্থান ঘুরে ঘুরে দেখবো। শুনে, কেমন যে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো সব যাত্রীরা। এমন উদ্ভট মানুষ তো দেখা যায় না বড়ো একটা। কাজে নয়, কম্মে নয়, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি নয়, কেবল দেশ দেখার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা লোক। বললাম, আমি সামান্য লেখালেখি করি, তাই বাংলাদেশ দেখে তার সম্পর্কে তার মানুষজনদের নিয়ে সাধ্যমত লিখবো। স্বস্তির নিঃশেষ ফেললেন যাত্রী-যাত্রিনীরা। আত্মীয়তার একটা ভাব যেন গড়ে উঠলো তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

এমন সময় আমাদের বেবি-ট্যাক্সিখানি ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো রাস্তার ওপর। ব্যাপার কী! গাড়ি আর যাবে না। সে তো বুঝলাম! কিন্তু কেন? আমাদের অপরাধটা কী? দেখছেন তো, রাস্তা বানানো হচ্ছে। সবে মাটি পড়েছে। ঐ রাস্তার ওপর দিয়ে কী গাড়ি চলে! তাহলে আমরা খেয়াঘাটে যাবো কী করে? সে তো আপনাদের ব্যাপার! এখন মিটিয়ে দিন তো গাড়ি ভাড়ার টাকাটা। তখন যে বলেছিলে খেয়াঘাট পর্যন্ত যাবে! হ্যাঁ, এই তো খেয়াঘাট। আর তো মোটে মাইল দুই পথ!

ভাড়ার কড়ি মিটিযে দিয়ে যে যার ঘবে যাবার পথ ধরলো। কিন্তু যে ঘবে যাবে না, যাবে ঘাটে, মধুমতীব খেয়া ঘাটে সে কোন পথ ধববে৷ সবে মাটি ফেলা এবড়ো-খেবড়ো হবু-পথটা ধবে হাঁটা শুরু কববো কিনা ভাবছি, দেখি আমাদের বেবি-ট্যাকসির জনৈকা সহ-যাত্রিনী একই পথ ধবে হাঁটাব উদ্যোগ নিচ্ছেন। গাড়ি যে পথে অচল, আত্ম-চবণই সেই পথে একমাত্র ভরসা। একটা শেযালকে যমুনা পাব হতে দেখে বসুদেব নেমে পড়েছিলেন দুকুল ছাপানো যমুনায। আব এমন একজন ভদ্রমহিলাকে পথে নামতে দেখেও আমি সে পথে পা বাড়াবো না৷ কেমন সে পথ৷

ভদ্র মহিলাব মুখ আমি দেখি নি। বোরখায় ঢাকা সেই মুখ। একই পথে একই সঙ্গে খানিক এসে ভদ্র মহিলা আমাকে বাবা সম্বোধন করে বললেন, বাবা! মধুমতীর খেয়াঘাট এখান থেকে কম কবেও দুই মাইল পথ। এদিকে সন্ধে হযে এসেছে। পথটাও দুর্গম। এই জনমানবশূন্য পথে একা একা তুমি যাবে কী কবে! তুমি আমার বাড়ি চলো। আজ রাতটা আমাব বাড়িতেই থাকবে তুমি। তোমাব কোন অসুবিধে হবে না। তারপব কাল সকাল হলে যেখানে যাবাব সেখানে চলে যাবে।

আমি অভিভূত হলাম আমাব মুখ-না-দেখা মেযেটিব আমন্ত্রণে। কিন্তু আমাকে তখন গোপালগঞ্জ যাওয়ায পেয়ে বসেছে। গোপালগঞ্জ থেকে কাল সকালে যাবো টুংগীপাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেব জন্মভূমি ও সমাধিস্থল। তাই বললাম, মা! তোমার এই অচেনা-অজানা সন্তানকে নিজগৃহে আহ্বান জানাচ্ছো। আমি আনন্দে আপ্লুত। কিন্তু আজ আমাকে গোপালগঞ্জ যে যেতেই হবে। পরে আপশোস হয়েছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁব বাড়িতে গেলেই তো ভালো হোতো। যে আমাকে পিতৃ সম্বোধনে পিতার সম্মান দিচ্ছে তার মর্যাদা বাখাই ছিলো আমাব চরম ন্যায়ের কাজ। উপবি পাওনা হোতো তার পবিবাবেব আচার-আচবণ, বীতিনীতি দেখতে পাওয়াব দুর্লভ সুযোগ।

যখন কিছুতেই বাজি হলাম না তাব বাড়িতে যেতে তখন মেযেটি বললে, আমাদের দেশ তোমাব কেমন লাগছে, বাবা৷

বললাম, মা৷ আমার মতো বয়েস হযেছে যে বাঙালিব, যে অবিভক্ত বাংলাকে দেখেছে, তার কাছে এই বাংলাও মাতৃভূমি। আব মাতৃভূমি বড়ো না মা বড়ো, আজও তার নির্ণয় হয নি। তাহলে কেউ যদি তোমার সন্তানকে বলে তোমার মাকে কেমন লাগছে, সে কী উত্তব দেবে! সেই উত্তব আমাবও।

বোধ হয় খুশি হোলো মেযেটি আমাব। তাই নিজের বাড়ি যাবার জন্যে ডানপাশের আলপথটা ধবার আগে আবার বললো, এখনো ভেবে দেখো বাবা। এতোখানি পথ ভেঙে খেয়াঘাটে যেতে তোমাব খুব কষ্ট হবে নইলে।

আমি বাব বার ধন্যবাদ জানালাম। মেযেটি চলে গেলো বিদায় নিয়ে আপন গৃহাভিমুখে। মনে কি তার উদ্বেগ আব আশঙ্কা ছিলো তখন!

আমি মধুমতীর খেয়াঘাট পানে পা বাড়ালাম।

চতুর্থ অধ্যায়

টুংগীপাড়া হয়ে বাগেরহাট

গোপালগঞ্জ এলাম তখন রাত ঠিক নটা। সন্ধে উৎবে এতোখানি বাত হয়ে যাবে তখন ভাবিনি। আমার অচেনা-অজানা, মুখ-না-দেখা মেয়েটিব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নির্মিয়মাণ পথে নামলাম। তখন সন্ধে এসেছে ঘনিয়ে। কিন্তু অন্ধকার নেই কোথাও। চাঁদেব আলোয ফিন্ ফুটছে চারিদিকে । পথে জনমানব নেই। এমন নির্জন পথ ধবে হাঁটিনি কতোকাল। সেই প্রাক্-স্বাধীনতাকালে প্রায়ই নামতাম গুস্করা ইস্টিশানে। রাত তখন আডাইটা। তাবপব নিঃসীম অন্ধকারে নির্জন মাঠের ওপব দিয়ে হাঁটতে শুরু করতাম। আকাশেব তারাগুলি সঙ্গী হোতো আমাব। পার হতাম কাঁদব। তাব ধারে শ্মশান। শ্মশানের চাবিপাশে কিল্‌বিল্ করতো ভূতেরা। কোনদিন চোখে দেখিনি তাদের, যদিও শুনেছি অনেক কথা লোক-মুখে। আজকেব মধুমতীব খেয়াঘাটে যাবাব পথটায একটা ভূত পর্যন্ত নেই। গলায সুর আসে না। তবু গান ধবলাম গুন গুনিয়ে। এমনি কবে যখন মধুমতীব খেয়া ঘাটে এসে উপনীত হলাম তখন খেযাব শেষ তবী-খানি ছাড়তে উদ্যত। নোঙব তোলা হচ্ছে আমি দৌড়ে এসে উঠলাম খেয়া নৌকোয়।

মধুমতী পাব হয়ে আবার খানিক হাঁটা পথ। নদীর কিনাবা থেকে চড়াই পথটি ধবে আবাব হাঁটতে শুরু কবলাম। এখন অবশ্যই একা নই আমি। একই নৌকোয় পাব হয়ে এলাম যাবা তাদেব সঙ্গে বিক্সা-স্টাণ্ডে উঠলাম। মধুমতীব ঘাট থেকে গোপালগঞ্জ শহব পথটা কম নয়। বিকসাঅলা পুবো দশটি টাকা নিলো তাব বিকসাটিব ভাড়া হিসেবে। উঠলাম এসে একটা হোটেলে। তাবও নাম মধুমতী। কিন্তু আধুনিকতাব চিহ্ন মাত্র নেই হোটেলে। ঘব-বাড়ি, খাট-বিছানা, বাথরুম সবই সেকেলে। পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্নও নয। তবে হোটেলঅলা লোকটিব কথাবার্তা বড়ো মিষ্টি। আব আমাব তো বাতটুকু কাটানো নিয়ে কথা।

গোপালগঞ্জ আগে ছিলো ফবিদপুব জেলাব একটা মহকুমা। এখন একটা জেলাব মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু জেলা শহবেব জৌলুস এখনো অর্জন করতে পাবেনি। এই শহবেব ঐতিহাসিক কোন গুরুত্বেব কথাও শুনলাম না। অবশ্য আমাব মনে তখন টুঙ্গিপাডাব দুর্বাব আকর্ষণ। গোপালগঞ্জেব ঐতিহ্য নিয়ে মাথা ঘামাবো সেই ফুবসত কোথায তখন। পবে মনে হযেছে। গোপালগঞ্জ শহরেকে একটু ভালো করে দেখা উচিত ছিলো আমাব। কাবণটা বোঝা যাবে নীচেব উদ্ধার কবা অংশে।

শেখ হাসিনা তাঁব আব্বার স্মৃতিচাবণ কবতে গিয়ে লিখেছেন, "আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরই গড়ে তোলা গিমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তখন ছিলো প্রাথমিক বিদ্যালয। বাড়ি থেকে সওয়া কিলোমিটাব দূব। আমাব আব্বা এই স্কুলেই প্রথম লেখাপড়া করেন। একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেবার সময় নৌকাডুবি হয়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এবপর আমার দাদী তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি।. সেই স্কুল

থেকে নিয়ে গিয়ে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দেন। গোপালগঞ্জ আমার দাদার (ঠাকুর্দার) কর্মস্থল ছিলো। সেই থেকে গোপালগঞ্জেই তিনি পড়ালেখা করতে শুরু করেন। মাঝখানে একবার দাদা মাদারিপুরে বদলী হন। তখন কিছু দিনের জন্য মাদারিপুরেও আব্বা পড়ালেখা করেন। পরে গোপালগঞ্জেই তার কৈশোর বেলা কাটে।"

মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতে কৈশোরই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কৈশোরকাল কাটিয়েছিলেন এই গোপালগঞ্জে।

এই গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া যাবো। শুনলাম বাস নেই। তবে যাবো কি করে ? কেন বেবি ট্যাকসি করে। চলে যান মাইল চারেক দূরের চৌমাথায়। সেখান থেকে রিকসাভ্যান। চলে যান সোজা টুঙ্গিপাড়ায়। শেষ পর্যন্ত সেই ভাবেই গিয়ে হাজির হলাম বাংলাদেশের জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান এবং শেষ শয্যাস্থল টুঙ্গিপাড়ায়।

রাস্তার ডানদিকে সুন্দর এবং সুসজ্জিত তোরণ। সেই তোরণ-ই শেখ মুজিবের পৈত্রিক ভবনের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রবেশ করেই এলাম প্রশস্ত চত্বরে। উপরে ছাদ। চত্বরে পাতা অনেক বড়ো বড়ো বেঞ্চি। মনে হয় সেখানে নিয়মিত জমায়েত হয়। এখন



টুংগীপাড়া — বঙ্গবন্ধুর মাজার

বসে আছেন বন্দুকধারী জনকয়েক পুলিস। শেখ মুজিবের মাজার কোথায় জিজ্ঞেস করতেই পুলিসদের একজন হাতবাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন। বাড়ানো হাতের দিক অনুসবণ কবে দেখি, একবারে চোখের সামনেই বঙ্গবন্ধু ও তাঁব বেগমেব মাজাব দুটি। সেখানে অনন্তশয্যায শায়িত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁব বেগম ফজিলাৎ উন্নেছা। মাজাব দুটির উপর সবুজ ঘাস। চারিপাশে ফুলের টবে নান পাতাবাহারি গাছ এবং ফুলের কেয়ারিতে মর্সুমি ফুলের সমারোহ। তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মাঝারি আকারের শিরীষ জাতীয় গাছ। সেইসব গাছের শাখা থেকে নিবন্তর বৃষ্টিধাবার মতো ঝড়ছে নানা রঙেব ফুলেব পাপ্ড়ি। সমাধি দুটির মাথার উপর নীল আকাশ।

এই মাজাব দুটির মাথাব পাশে ছোট্ট কিন্তু সুন্দর একটি ইমারত। তার মধ্যে শেখ মুজিবেব আব্বা শেখ লুৎফর রহমান এবং আম্মা মোসাম্মৎ সাযবা বেগমেব সমাধি। দুইপুরুষ একই স্থানে চিবনিদ্রায অভিভূত। আমি নতজানু হয়ে সেই সমাধিস্থলে পরম শান্তিতে শাযিত মহান ব্যক্তিগণকে পবম শ্রদ্ধায় অভিবাদন জানালাম।

ইতিমধ্যে চত্বরে পাতা বেঞ্চিব উপর এসে বসেছেন এক ভদ্রলোক। দেখে মনে হোলো, তিনি শেখ মুজিবের বিশাল একান্নবর্তী পরিবাবেব কেউ হবেন। তাই পাযে পাযে এগিযে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। আমি কলকাতা থেকে এসেছি বাংলাদেশ দেখতে। তাই বর্তমান বাংলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুব বহমানেব জন্মস্থান ও শেষশয্যা দেখতে এসেছি শুনে ভদ্রলোক আমাকে খাতির করে বসালেন তাঁব পাশটিতে। আমি প্রথমেই তাঁব নাম জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাঁর নাম শেখ বোরহানউদ্দিন।

আমি—আপনাব সঙ্গে বঙ্গবন্ধুব সম্পর্ক কি ছিলো দযা কবে বলুন।

বোরহান্ উদ্দিন—বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাব অনেক দিকের সম্পর্ক বয়েছে। একদিকে, অর্থাৎ বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন আমার চাচাতো বড়-ভাই। আবাব তিনি বিযে করেছিলেন আমাদেব নিজেদের বংশেই, আমার চাচাতো বোনকে। সুতবাং আর একদিক থেকে তিনি ছিলেন আমার চাতাতো ভগ্নিপতি। তাছাড়া, আমার আব এক চাচাতো ভাই বিযে করেছে বঙ্গবন্ধুর এক বোনকে। সেই দিক থেকে তিনি আমার বেয়াই বা ভাযবা ভাইও ছিলেন। আমার চাচাতো বোন বেগম ফজিলাৎ উন্নেছাবা ছিলেন দুই বোন। তাঁদেব কোন ভাই ছিলো না। এই ফজিলাৎ উন্নেছাকেই বিযে করেন বঙ্গবন্ধু। আব এক বোনকে বিয়ে করেন শেখ মোহাম্মদ মোছারুল্লা। এই মোছারুল্লাও ছিলেন আমার আর এক চাচাতো ভাই। তাই বলছিলাম বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিলো।

আমি—বঙ্গবন্ধুব সঙ্গে আপনার বয়েসেব কি খুব পার্থক্য ছিলো?

বোরহান উদ্দিন—বঙ্গবন্ধু আমাব চেযে বয়েসে অনেক বড়ো ছিলেন। আমাকে তাঁব ছেলের বয়েসী, বলা চলে।

আমি---বঙ্গবন্ধুর ছোট্টবেলার অনেক কথা আপনার নিশচয়ই শোনা আছে। সেই সম্পর্কে আপনি কিছু যদি বলেন উপকৃত হবো।

বোরহান উদ্দিন---আমি ছোটবেলায বঙ্গবন্ধুর কাছে অনেকবাব গিযেছি। আমি তখন ঢাকায় থেকে পড়ালেখা করতাম। (এখানে বলে রাখি, বাংলাদেশেব অনেকেই লেখাপড়া'কে উল্টো কবে বলেন 'পড়ালেখা'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখহাসিনাও দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় 'পড়ালেখা' কথাটাই লিখেছেন দেখলাম।) সেইসময আমি বঙ্গবন্ধুব কাছে মাঝে মাঝেই যেতাম তাব ৩২নং বাসায়। বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরতেন, খুব আদব করতেন। বাবান্দায বসে বসে অনেক সময় পাইপগুলি পবিষ্কাব কবতেন। তাঁর স্ত্রীব ডাকনাম ছিলো রেণু এবং ভালো নাম ছিলো ফজিলাৎ উন্নেছা। তখন তাঁকে আমি আপ্পা বা বুজি বলতাম। আপনাবা যাকে দিদি বলেন, আব কি। বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হতেন। আমাদেব নিযে বিভিন্ন ধরনেব আলাপ কবতেন। বলতেন, পড়ালেখা ঠিকভাবে কবছো তো। ভালো কবে পড়ালেখা কবো। ভালো হবে তোমাদেব। এই সব উপদেশমূলক কথা বলতেন। তখন তো ১৯৬০ সনেব কথা। তাব আগে ১৯৬০ সনেব কথাগুলো বলছি। যখন আমি তাঁর বাসায যেতাম তখনে ঢাকায আমাদেব এইসব অঞ্চলের বাঙালিদের বাড়ি কম ছিলো। তাই বঙ্গবন্ধুব ঐ বাড়িতেই অনেকেব মতো আমরাও যাতাযাত করতাম। তখন পাকিস্থানী আমল। ববিবাব ছিলো ছুটির দিন। (এখন সাপ্তাহিক ছুটি হয শুক্রবারে।) তাই ববিবাব যেতাম তাঁব বাড়ি। বুজিব কাছে যেতাম। তিনি খুব ভালো রান্না করতেন। আমাদেব জন্যে অনেক খাবাব বানাতেন। তখনকাব অনেক বাজনৈতিক নেতাও উপস্থিত হতেন তাঁব বাড়িতে। তখন তাঁব বাড়ি গেলে অনেকেব সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হোতো। প্রতি রবিবাব বঙ্গবন্ধুর ঢাকাব বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানেব মতো হোতো। অনেক নেতা, বিশেষ করে ছাত্র নেতাবা আসতেন। মৌলনা ভাসানী সাহেবও মাঝে মাঝে আসতেন। তখন আমি বঙ্গবন্ধুব বাড়িতে গিয়ে ঐ ধরনেব নেতা ও লোকজনদেব দেখতে পেতাম। (আমাব প্রশ্ন ছিলো বঙ্গবন্ধুব ছোটবেলাব কথা। বোবহানউদ্দিন নিজেব ছোটবেলার কথা বললেন।)

আমি---বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে এইসব হোলো আপনাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

বোবহানউদ্দিন---হ্যাঁ ! তবে ওই বকমের লোক হয না। যে হৃদ্যতা, যে আন্তবিকতা তাঁর মধ্যে দেখেছি সেবকম বড়ো একটা অন্য কাবো মধ্যে দেখা যায় না। তাঁব আরও একটা শক্তির কথা বলা দরকাব। তিনি একবার যাকে দেখতেন, তা সে বড়োই হোক আর ছোটোই হোক, তাকে ভুলে যেতেন না। যাকে জীবনে একবার দেখেছেন, সে জেলে কি কামার, কুমোর কি চামার, যতো নিকৃষ্টই হোক না কেন, প্রত্যেকটা লোককে মনে রাখতে পারতেন। আমরা অনেক সময় ভুলে

যাই। তাই অনেক সময় অনেকে মনে করতেন হয়তো তিনি বানিয়ে বলছেন এসব কথা। তখন তিনি সেই লোকটিকে বলতেন অমুক দিন অমুক নদীর ধারে তোমাকে দেখেছিলা। শুনে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেতো। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একটা ঐশ্বরিক শক্তি। এই ধরনের শক্তি আমি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখতে পাই না। যদি কোন শত্রুও তাঁর কাছে যেতো সে তার মিত্র হয়ে যেতো। তাঁর কাছে গেলে যখন তিনি বসতে বলতেন তখনই তার মধ্যেকার শত্রুতার ভাবটা বদলে যেতে শুরু করতো।

আমি — বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও জানার কথা যদি আপনার বলার থাকে এবং বলেন তাহলে আমার খুবই ভালো লাগবে।

বোরহান উদ্দিন—বঙ্গবন্ধুর মন ছিলো খুবই সহজ-সরল। সাধারণতঃ গরিবদের নিয়ে তিনি বেশি করে ভাবতেন। ছোটবেলা থেকে তিনি শোষণহীন সমাজ তো দেখেননি। আমাদের তো তখন এখানে জমিদারী ছিলো। কিন্তু জমিদারী উচ্ছেদের জন্যে যখন আন্দোলন হোলো তখন জমিদার বংশের ছেলে হয়েও তিনি সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন।

আমি — আপনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের এমন কতকগুলো দিকের কথা বললেন যেগুলো আগে আমার জানা ছিলো না। বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। আপনার কথা শুনে আমার সেই শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি লাভ করলো।

বোরহান উদ্দিন—সাম্প্রদায়িকতা বলতে যা বোঝায় বঙ্গবন্ধুর মধ্যে তা একেবারেই ছিলো না। মানুষ হিসেবে আমরা সবাই সমান। কে হিন্দু, কে মুসলমান কে বৌদ্ধ কে খ্রীস্টান সেই পার্থক্য তিনি করতেন না। আমাদের মুসলমান ধর্মে আছে মানুষকে তুমি হেয় কোরো না। মুসলমান হিসেবে কোন মানুষকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এই জিনিসটি আমি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দেখেছি। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি বিভেদ আনতেন না। অনেকের মনে নানারকম প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা যখন দেখে, বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ম্যানেজার একজন হিন্দু, তখন তারা বলে যে আমরা হিন্দু-ঘেঁষা। তারা বোঝে না, মানুষ হিসেবে কোন মানুষকে ঘৃণা করা যাবে না। হিন্দু হিন্দুর দায়িত্ব পালন করবে মুসলমান মুসলমানের দায়িত্ব পালন করবে। বঙ্গবন্ধু এই নীতিতে বিশ্বাস করতেন। বঙ্গবন্ধু কখনো কোন মানুষকে ঘৃণা করতেন না। এই সম্পর্কে একটা দৃষ্টান্ত দিই। এক বৃদ্ধ মহিলা ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে আছেন বাড়ির কাজের মেয়ে হিসেবে। ছোট-বেলায় তিনি বঙ্গবন্ধুর খেলার সাথীও ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন একবার। তখন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। তিনি নিজে টুংগীপাড়া এসে সেই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ফার্স্টক্লাশ কেবিনে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হোলো। অনেকেই তার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছিলো। বলেছিলো,

কাজের লোককে কেন ফার্স্টক্লাশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমি ওকে এখানে এনেছি। ও আমার পাশের ঘরে থাকবে। এই উদার মন এখন আর কটা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এইসব কারণেই বঙ্গবন্ধুকে আমরা ভুলতে পারিনা।

শেখ বোরহানউদ্দিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধু মাজার ভবনের অবধায়ক (Caretaker) শেখ হাদিউজ্জমানের কাছে। তিনি ব্যস্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি যাদুঘরের কাজে। সহৃদয় অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। বঙ্গবন্ধুর কিছু আলোক চিত্র, তাঁর পূর্বপুরুষদের ছবি, এবং কিছু ব্যবহৃত জিনিস দেখালেন। সেই যাদুঘরের মন্তব্য খাতায় আমাকে মন্তব্য লেখার জন্য অনুরোধ জানালেন। মন্তব্য খাতায় আমার মন্তব্য লিখলাম। তারপর দেখতে গেলাম বঙ্গবন্ধুর দাদা ও নানার বাবার (প্রপিতামহ ও প্রমাতামহ) আমলের বাড়িটা। আলোক চিত্র নিলাম বাড়িটির।

যে বাড়িতে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু, সেই বাড়িতেই অন্তিম শয্যায় শায়িত রয়েছেন তিনি। সেই বাড়ির যা কিছু দর্শনীয় তার সবই দেখা শেষ হোলো। তখনই মনে হোলো এই নিঃস্বার্থ কর্মবীর আজীবন দেশবাসীর জন্যে কাজ করে গেছেন। এবং দান করে গেছেন তার অমূল্য জীবন। সেই অমূল্য জীবনের আলেখ্য যদি না দেখি তবে তো সব দেখাই হয়ে যাবে অদেখা

এখন যেখানে টুংগীপাড়া গ্রাম, প্রায় দু'শো বছর আগে মধুমতী নদী বয়ে যেতো সেই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। সেই সময় টুংগীপাড়া গ্রামের কোন অস্তিত্ব ছিলো কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কিন্তু নদী তো স্থির থাকে না। অবিরত পরিবর্তন করে তার গতিপথ। মধুমতীও ক্রমশ সরে যায় এখন যেখান দিয়ে বইছে সেই গোপালগঞ্জের পাশে। কিন্তু ফেলে রেখে গেলো তার ছোট্ট এক শাখানদীকে টুংগীপাড়ার পাশটি দিয়ে বয়ে যাবার ভার দিয়ে। সেই শাখানদীটির নাম বাইগার নদী। বাইগার নদী আজও বয়ে চলেছে টুংগীপাড়া ঘেঁষে।

প্রায় দুশো বছর আগে শেখ মুজিবের পূর্বপুরুষেরা এসে মধুমতী নদী বিধৌত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করলেন। মনে হয়, তাঁদের স্থাপন করা বসতিই পরে টুংগীপাড়া নামে অভিহিত হয়। তখন এই অঞ্চল ছিলো বন-জঙ্গলে ভরা। মধুমতী ক্রমশ সরে গেলে জঙ্গল হাসিল করে টুংগীপাড়ার আশেপাশে আরও কয়েকটি গ্রাম গড়ে ওঠে। মুজিবের পূর্বপুরুষেরা প্রথমে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ব্যবসায়ও গড়ে তোলেন। তখন কলকাতার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং কলকাতার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাঁরা সঙ্গতি সম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

তখন এই অঞ্চলে স্থানীয় উপকরণ দিয়ে কেবল মাটির বাড়ি তৈরি হোতো বসবাসের জন্যে। তাই এই অঞ্চলে পাকা দালানবাড়ি তৈরি করার রাজমিস্ত্রি ছিলো না। সেইজন্য শেখ

মুজিবেব প্রপিতামহ দালান বাড়ি তৈবিব জন্যে কলকাতা থেকে বাজমিস্ত্রি আনিযেছিলেন এবং এই অঞ্চলে প্রথম দালান বাড়ি নির্মাণ কবেছিলেন। তখন ১৮৫৪ সাল। সেই দালান বাড়িটি আজও তাব অস্তিত্ব নিযে কালেব ভ্রূকুটি উপেক্ষা কবে দাঁড়িযে আছে।



টুংগীপাড়া   বঙ্গবন্ধুব পূর্বপুরুষের বাড়িব ভগ্নাবশেষ

শেখ মুজিবেব পিতামহ ছিলেন শেখ আবদুল হামিদ। পবিবাবে লোকবৃদ্ধি হওযায় সেই দালান বাড়িতে স্থানাভাব দেখা দেয। তখন তিনি সেই প্রথম তৈবি দালান বাড়িব উত্তবপূর্ব কোণে একটি টিনেব চৌচালা ঘব তোলেন। তাব পুত্র শেখ লুৎফব বহমান পবিবাব সহ সেই টিনেব বাড়িতে উঠে আসেন

শেখ লুৎফব বহমান এবং বেগম সাযবাব প্রথম দুই সন্তান ছিলো কন্যা। তাবপব ১৯২০ সালেব ১৭ই মার্চ তাঁদেব এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ কবলে সংসাবে আনন্দেব বন্যা বইতে থাকে। সেই পুত্র-সন্তানেব 'আকিক'-এব সময তাব (পুত্রসন্তানেব) মাতামহ শেখ আবদুল মজিদ দৌহিত্রেব নামকবণ কবেন শেখ মুজিবুব বহমান।

শেখ মুজিবুব বহমানেব শৈশব কেটেছিলো টুংগীপাড়াব গ্রাম্য পবিবেশে প্রকৃতিব

মধ্যে। সরল গ্রাম্য বালকেরা ছিলো তার খেলার সাথী। গ্রামের পশুপাখীরা তাব আপনজন। গ্রামের মাঠে খেলাধুলো করে, নদীতে সাঁতার কাটে, গাছে চড়ে, গাছের ফল পেড়ে খেয়ে দিন কাটতো তার। এই সময় তখনকার রীতি অনুসারে মাত্র দশ বৎসর বয়েসে শেখ মুজিবেব বিয়ে হয়। তখন তাঁব বেগম ফজিলাৎ উন্নেছাব বয়েস মাত্র তিন বৎসব।

এই সময় তাকে ভর্তি কবা হয় তাব পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত গিমাভাঙ্গা-টুংগীপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেই ইস্কুল থেকে ফেবার পথে একদিন নৌকাডুবির ফলে আব তাকে ঐ ইস্কুলে যেতে দেওয়া হয়নি। তাব বদলে তাকে ভর্তি কবা হয় গোপালগঞ্জ মিশনারি ইস্কুলে। গোপালগঞ্জের এই ইস্কুল থেকেই ১৯৪২ সালে শেখ মুজিবুব ম্যাট্রিক পাশ কবেন। তাবপব কলকাতাব ইসলামিয়া কলেজে তিনি ইন্টাবমিডিয়েট ক্লাশে ভর্তি হন।

সেই সময় ১৯৪৩ সালে, শেখ মুজিবুব নিখিল বঙ্গ মুসলিম লিগেব কাউন্সিলার নির্বাচিত হন এবং ভাবত বিভাগ করে পাকিস্থান গঠনেব পক্ষে আন্দোলনেব সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ কবেন। তাবপব ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ ভাবত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব পাকিস্থান হলে শেখ মুজিবুব পূর্বপাকিস্থানে চলে যান।

কিন্তু অতি অল্পসময়েব মধ্যেই তাঁব স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তিনি বুঝতে পাবেন, সম্প্রদায়-গত ধর্ম নয়, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা, যা গর্ভধাবিণী জননীব-ই অন্যরূপ, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব আনতে পাবে। সেই ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পাবে। ১৯৪৮ সালেব ২৩শে ফেব্রুযারি আইন পবিষদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানেব প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা কবেন "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে।" এই ধরনেব প্রবঞ্চনামূলক বক্তব্য ঘোষণা কবায় তৎকালীন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুব বহমান তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ কবেন। আব এই প্রতিবাদেব পাশাপাশি তিনি মুসলিম লিগের এই ঘৃণ্য অপচেষ্টাকে রুখবাব জন্য সাবাদেশেব (পূর্ব পাকিস্থানেব) ছাত্রদেব মধ্যে আন্দোলন তৎপবতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু কবেন। বাংলাভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবীতে ধর্মঘটেব আহ্বান জানান। কিন্তু এই ধর্মঘট শুরু হওয়ার আগেই ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ তাঁকে গ্রেপ্তাব কবা হয়।

তাবপব থেকে বাংলাদেশেব মুক্তি অর্জন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল, শেখ মুজিবুবেব জীবনেব ইতিহাস কারাববণেব ও বাংলাদেশেব স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধের ইতিহাস। বছবেব পব বছব পাকিস্থান সরকাবের জেল-জুলুম উপেক্ষা করে, নিজেব ও পরিবারের অন্য সকলের সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে এই মহান দেশপ্রেমিক বাঙালি বীর পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাব সোপান তৈবি কবেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দেশবাসী এই মহান প্রিয় নেতাকে তাঁদেব হৃদয়ে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত

করেছেন। ১৯৬০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেস্‌কোর্স ময়দানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত লাখ লাখ ছাত্র জনতার সভায় বাঙালি জাতির গৌরব ও প্রাণপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যখন অর্জিত হোলো, তখন এই মহান নেতা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আত্ম নিয়োজিত তখন, চরম পরিতাপের বিষয়, ১৯৬৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জনকয়েক উন্মত্ত হিংস্র পশু ঢাকায় তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। এইরূপ মর্মান্তিক ও কলঙ্কজনক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

গভীর শোক ও বেদনায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বেরিয়ে এলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈত্রিক ভবন থেকে। একটা বিকসাভ্যানে চড়ে চলে এলাম বাস-স্টপেজএ যেখানে বাস ধরে এলাম গোনাপাড়া। এইসব নাম ভূগোলের পাতায় লেখা নেই। না থাক, এখানকার রাস্তার দুপাশে বাবলা শিরীষ শিমূল তো আছে। গাছের মাথায় মাথায় লাল আর হলুদ ফুলের সে কি সমারোহ। এইসব ফুলের সুগন্ধ নেই তবু কীসের টানে মৌমাছিরা ভিড় করেছে। তাদের গুন গুন গানে ভরিয়ে তুলেছে চারিদিক ! আর আছে বাঁশঝাড়। গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুরের পাড়ে পাড়ে, ডোবার ধারে ধারে এতো বাঁশবনও আছে।

গোনাপাড়ায় দোকানের সামনে বেঞ্চির বদলে বাঁশের মাচা। তার ওপর বসে বসে বাসের প্রতীক্ষা করছি। এদিকে বলা নেই কওয়া নেই খিদে এসে পেটের মধ্যে জ্বালাতন জুড়ে দিলো। চারিপাশে খাবারের দোকান চোখে পড়ে না। কোন দোকানে পাউরুটিও নেই। আমাদের গাঁয়ের পেলাকাকা বলেছিলো কী বলবো গো খুড়ো ' মন্তেশ্বর শহর হয়ে গেছে। সেখানে কাঁচি-সিগারেট পাওয়া যায়, পাউরুটি পাওয়া যায়। সেই নিরিখে গোনাপাড়াকে কিছুতেই শহর বলা চলে না। অজ পাড়াগাঁ মাত্র। হঠাৎ দেখি একটা দোকানে কলার কাঁদি ঝুলছে। দৌড়ালাম সেই দোকানপানে। পূর্ব-পুরুষ থেকে পাওয়া স্বভাব ছাড়া যায় ! সেই দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি যিনি সকল চিন্তা দূর করার মালিক সেই চিন্তাহরণের বোধ হয় করুণা হোলো আমার ওপর। একটা মোটর গাড়ি এসে থামলো আমার সামনে। ড্রাইভার সাহেব জানতে চাইলো, কোথায় যাওয়া হবে জনাবের! বললাম, যাওয়া তো হবে ভাই বাগেরহাট। কিন্তু . । বললে উঠে পড়ুন জনাব। বললাম, কিন্তু ভাড়া? নির্লিপ্ত ড্রাইভার সাহেব বললো, সে হবে'খন তা হোলো। যেখানে যেতে বাসভাড়া লাগতো পাঁচ টাকা, সেখানে পঞ্চাশ টাকা গুনে তবে পার পেলাম।

পথে আবার পড়লো মধুমতী নদী। ফেরিতে গোটা দশেক বাস লরির বোঝার ওপর শাকআঁটির মতো আমাদের মোটরগাড়িখানি চেপে বসলো। মধুমতীর ওপারে আরও খানিক গিয়ে নোওয়াপাড়া। রীতিমত জমজমাট শহর। সেই নোওয়াপাড়ায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে

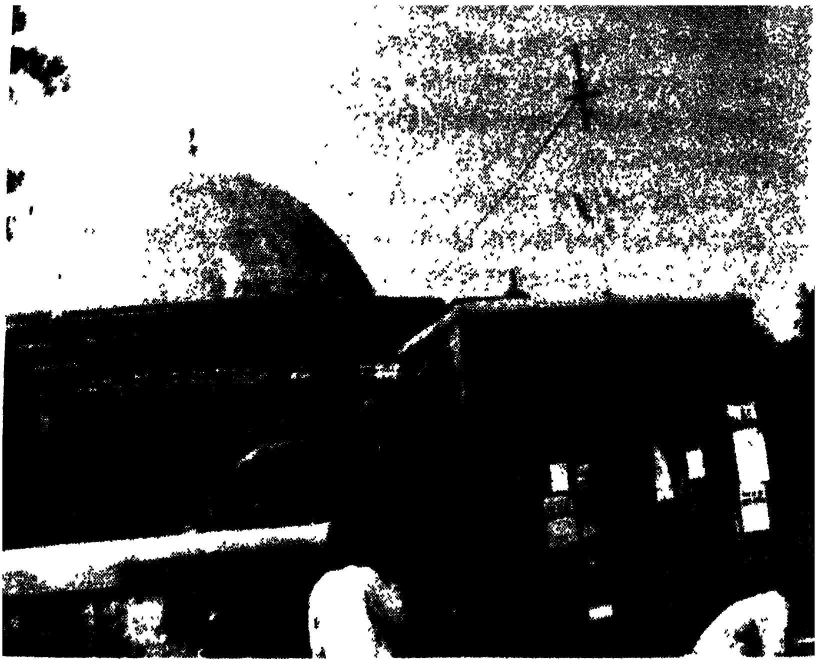
ড্রাইভার বললো এখানে বাগেরহাট যাওযার বাস পাবেন। নোওযাপাড়ায বাসে চড়ে এলাম ফকিবহাট। যেখান থেকে কাছেই বাগেবহাট।

সেই কবে ছোটবেলায নাম শুনেছি বাগেরহাটেব। দিদির ছোটকালে বাগেরহাটের ডোরাকাটা শাড়ি কিনে আনতেন বাবা। শাড়ির রঙ ছিলো হলুদ। তার ওপর ঘন খযেরি ডোরাকাটা। এই শাড়িটি কি বাগের গাযেব বঙ আর গায়েব ওপর কাটা ডোরার অনুকৃতি ছিলো?

তখন সেই ছোটবেলায় বাগেরহাট নাম শুনে আমার মনে কিন্তু অন্য প্রশ্ন দেখা দিতো। বাগেব হাট সে আবাব কেমন হাট। আমাদের মালভাঙ্গার হাটে তো আলু, পেঁয়াজ, পটল, ঝিঙে, উচ্ছে, বেগুন, খেঁড়ো, কাঁকুর বিক্রি হয়। বাগেরহাটে কি বাঘ বিক্রি হয়! অথবা হাটুবেদের বদলে হাট বসায় বাঘেরা! এই ছেলে মানুষী ভুল ভাঙতে বিস্তর বিলম্ব হয়েছিলো। অবশ্য ব্যাপারটা একেবারে ছেলেমানুষী ভুল নয়। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে ছিলো গভীর জঙ্গল। তখন এখানে সত্যি সত্যিই বাঘেরা হাট বসাতো। আজ আমি যে বাগেরহাটে এসেছি একশো দেড়শো বছর আগেও এই অঞ্চলের দক্ষিণাংশে ছিলো গভীর অরণ্য। তাবও আগে পালরাজা ও সেনরাজাদের আমলে এই অঞ্চলের নাম ছিলো ব্যাঘ্রতটী। ব্যাঘ্র অধুষিত ছিলো বলেই এই অঞ্চলের নাম ব্যাঘ্রতটী ছিলো। বাগেরহাট নামটি সেই ব্যাঘ্রতটীর স্মৃতিবহন কবছে কিনা কে জানে। "খানজাহান আলীর আমলে যশোর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ছিলো গভীর অরণ্য। তিনি সুন্দরবনের অনেক অংশে নূতন আবাদ করাইয়া ছিলেন।" (বাঙ্গালীব ইতিহাস ১ম খণ্ড—ডঃ নিহারবঞ্জন রায়—পৃঃ১০১২)।

সেই খানজাহান আলীর মাজাবে এসে উপস্থিত হলাম। বড়ো বাস্তা (হাইওয়ে) থেকে একটা শাখাপথ ডানদিকে চলে গেছে খানজাহান আলীব মাজার পর্যন্ত। এই শাখাপথের দুইপাশে অনেক দোকান—খাবাবেব, রকমাবি জিনিসের। দোকানগুলি দেখে বোঝা যায় খানজাহান আলীব মাজাবে প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থীব সমাগম হয। পথটা মাজারের প্রবেশদ্বারে গিয়ে শেষ হযেছে।

এই খানজাহান আলী কে ছিলেন ? এই প্রশ্নেব সঠিক উত্তর আজও পাওযা যায নি। অনেকেব মতে 'খানজাহান কোন নাম নয়, উপাধি বিশেষ। সেই যুগে শক্তিমান ও খ্যাতিমান অনেক ব্যক্তিই এই উপাধি ধারণ কবতেন। তাহলে আবাব প্রশ্ন আসে, সেইসব খানজাহান উপাধিব ধাবক কোন শক্তিমান ও খ্যাতিমান ব্যক্তি দক্ষিণবঙ্গেব এই জঙ্গলময় ভূমিতে এসেছিলেন এবং বন-জঙ্গল হাসিল করে জনবসতি স্থাপন করেছিলেন। তারপব সেই নতুন স্থাপিত দক্ষিণবঙ্গেব রাজ্য দীর্ঘকাল ধবে শাসন কবেছিলেন! এইসবের কোন প্রামানিক ইতিহাস নেই। আছে কেবল পুরুষানুক্রমে চলে আসা তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তি। কিন্তু কিংবদন্তি তো স্থিব থাকে না। নদীব গতিপথেব মতো তাব ধারাবও পরিবর্তন হয পুরুষ থেকে পুরষের শ্রবণ-পথে যাবার সময়। তার ফলে প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে যায়। বিচিত্র গালগল্পেব সৃষ্টি হয়।



বাগেবহাট - - খানজাহান পীড-এব মাজাব

আর আছে পাথরে খোদিত তাঁর মৃত্যু তাবিখ। খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাত-এর মাজাবের প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকলেই দেখা যায় তাঁর সমাধির পায়েব দিকেব একটা অংশ সুন্দর কাপড়ের গেলাপে (ওয়াড়ে) ঢাকা। সেখানে পাথরেব উপব আরবি অক্ষরে লেখা আছে ৮৬৩ হিজরী, ২৬শে জিলহজ্জ, বুধবার (ইংরেজি ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দেব অক্টোবর) তাঁব ইন্তেকাল হয। আরও লেখা আছে, এই মাজরাটি খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাত-এর মাজার। এইটুকু ছাড়া আর কোন প্রামাণ্য তথ্য তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায় না।

খানজাহান আলীর ন্যায় একজন শাসক ও ধর্মপ্রচারক যিনি ঐতিহাসিককালে, পঞ্চদশ শতকে, সুলতানী আমলে বর্তমান ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন ইতিহাস নীবব কেন তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য বর্তমান কালের কয়েকজন ঐতিহাসিক তাঁবে ওপব আলোকপাত করেছেন, অবশ্যই কিংবদন্তি আর অনুমানকে সম্বল করে। এইজন্য খান-জাহান আলী সম্পর্কে তাঁদেব গবেষণালব্ধ ফল একরূপ নয়। অনেকক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী।

একমতে, খানজাহান আলী ছিলেন ইবানদেশীয মুসলমান। তিনি মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করতেন। তখন দিল্লিব সুলতানের ঐশ্বর্যেব কথা সর্বজনবিদিত। তাই তিনি মূল্যবান পাথব বিক্রিব উদ্দেশ্যে দিল্লি আসেন। ক্রমে তিনি সুলতানের দববাবে পবিচিত হন। পরে তিনি সুলতানেব অধীনে চাকবি গ্রহণ করেন এবং সুলতান তাঁকে বাংলাদেশে শাসনকাল পবিচালনা এবং ধর্মপ্রচাবের কাজে পাঠিয়ে দেন।

অন্যমতে, খানে আজম হজবত খানজাহান আলী বহমাত ছিলেন পাবস্যেব একজন ধনী মুসলমান। ব্যবসা-বাণিজ্য কবাব উদ্দেশ্যে তিনি মুহম্মদ-বিন-তুঘলকেব সময দিল্লি আসেন এবং সুলতানেব অধীনে চাকবি গ্রহণ কবেন। কিছুকালেব মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভাবলে সুলতানেব প্রধান উজীবেব পদে উন্নীত হন। পবে ষাট হাজাব সৈন্য এবং এগাবো জন আউলিযা সহ বাংলাদেশে আসেন ও দক্ষিণবঙ্গে বন-জঙ্গল পবিষ্কাব করে বাজ্যস্থাপন করেন। তিনি নিজ স্থাপিত বাজ্য যেমন শাসন কবতেন, তেমনি ইসলাম ধর্ম প্রচাব কবতেন।

আব একমতে, খানজাহান আলীব বাবা ছিলেন একজন সওদাগব। তিনি সপবিবাবে দিল্লি এসেছিলেন বাণিজ্য কবতে। তিনি কোন দেশেব লোক ছিলেন এই মতেব গবেষকগণ জানাননি। যাই হোক, দিল্লিতে বাণিজ্য করতে এসে কিছু দিনেব মধ্যেই খানজাহান আলীর বাবা মাবা যান। তখন তাঁব মা তাঁকে অনেক কষ্টে মানুষ কবেন। পবে তিনি সুলতানেব সঙ্গে কোনও সূত্রে পবিচিত হন এবং সুলতান তাঁব প্রতিভাব পরিচয লাভ কবে তাঁকে বাজকার্যে নিযোজিত কবেন। পবে সুলতান তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিযে দেন শাসনকার্য ও ইসলাম ধর্মের প্রচাবেব ভাব দিয়ে।

এইরূপ অনেক মত প্রচলিত আছে। এই মতগুলিব মধ্যে বিরোধিতা থাকলেও একটি বিষয়ে মিল দেখা যায। খানে আজম হজরত খানজাহান আলী বহমাত দিল্লিব সুলতান কর্তৃক প্রেবিত হযে এসেছিলেন বাংলাদেশে এবং দক্ষিণবঙ্গের বনভূমি পবিষ্কাব কবে বাজ্য স্থাপন কবেছিলেন। তাঁর স্থাপিত বাজ্যের কেন্দ্রটি বারোবাজাব নামে খ্যাত হয়। তিনি নিজে এবং সঙ্গী এগাবোজন আইলিযা, অর্থাৎ বাবোজন ধর্মপ্রচাবক এসে রাজ্যটি স্থাপন করেন বলেই রাজ্যেব কেন্দ্রের নাম হয় বাবো-বাজাব।

অনেকেব মতে, খানে আজম হজবত খানজাহান আলী বহমান দিল্লি থেকে বাংলায় আসেননি। এসে ছিলেন জৌনপুর থেকে। অন্যমতে, তিনি দক্ষিণবঙ্গে এসেছিলেন গৌড় থেকে। ''যশোর-খুলনার ইতিহাস''-এর বচয়িতা স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মতে বাগেরহাটের খানজাহান আলী এবং জৌনপুরের খানজাহান আলী একই ব্যক্তি। তিনি বাংলায় এসেছিলেন জৌনপুর থেকে। "দি হিস্ট্রি অফ্ বাগেরহাট" এর রচয়িতা জনাব মোজহারুল ইসলাম সতীশবাবুর এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ বমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁব "দি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল"-এ এই মত সমর্থন করেননি।

খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাতের জীবনেব পূর্ণ ইতিহাস উদঘাটন কবা আজ আর সম্ভব নয়। কালের বিস্মৃত তলে সেই জীবন-ইতিহাসের অনেকখানি হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর আরব্ধ ও সম্পন্ন কাজগুলি কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও স্বমহিমায় বিরাজমান।

খানজাহান আলীর কাজগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ইসলাম ধর্মের প্রচাব। তাঁরই নিবলস প্রয়াসে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রবল হয়ে ওঠে। বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির বীজ তিনিই প্রথম বপন করেছিলেন। অবশ্য ধর্মের ব্যাপারে তৎকালীন হিন্দুগণের সংকীর্ণতা ও কঠোর জাতিভেদ প্রথা তাঁকে ইসলাম ধর্মপ্রচারে পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। যে বৈদিক ধর্ম ভারতে আগত ব্যক্তি বা জাতি মাত্রকেই আপন করে নিয়েছে অন্ধকারময় মধ্যযুগে সেই উদার ধর্ম হিন্দু নামে পরিচিত হয়েছে এবং বিধি নিষেধের বেড়াজালে চরম সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত ধর্মে পবিণত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনক জননীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণই হিন্দু হবার একমাত্র পথ। হিন্দু হবার নান্য পন্থা ঃ। অথচ ইসলাম ধর্মাবলম্বীর বদনার এক গণ্ডুষ পানি পানই যে কোন হিন্দুর জন্মার্জিত ধর্মলোপের সহজতম পন্থা। এই পাপের (?) জন্যে তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিত সমাজ সুবুদ্ধি রায়ের মত প্রভাবশালী লোকেরও শাস্তি বিধান করেছিলো ফুটন্ত ঘৃত পান করে আত্মহত্যা। ভাগ্যিস তখন মহাপ্রভুব আবির্ভাব হয়েছিলো ! তাই বৃন্দাবনে ভগবানের নামকীর্তন করে সুবুদ্ধি রায় অপরাধ ক্ষালন কবার সুযোগ পেলেন। এই সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো হিন্দুর নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চবর্ণের অকথ্য অত্যাচাব। হিন্দুদের সমাজেব মধ্যেকার এই দুর্বলতা খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাতের ইসলাম ধর্মপ্রচারকে পরোক্ষে সফল কবে তুলেছিলো।

খানজাহান আলীর দ্বিতীয় কাজ যা আজও তাঁকে স্মরণীয় কবে রেখেছে তা হোলে অগম্য স্থানসমূহেব মধ্যে যোগাযোগেব জন্যে রাস্তা নির্মাণ। পঞ্চদশ শতকের জঙ্গলময় দক্ষিণবঙ্গে, বর্তমান যশোর-খুলনা অঞ্চলের জঙ্গল হাসিল করে বসতি বসানো যেমন ছিলো দুরূহ, তেমনি দুঃসাধ্য ছিলো বসতিগুলিব মধ্যে যাতায়াতের জন্যে রাস্তা তৈরি। ধর্মপ্রচারের কাজে খানজাহান আলী যেখানে গেছেন রাস্তা তৈরি করতে করতে গেছেন সেখানে।

বলা হয়, খানজাহান আলী তাঁব এগারোজন আউলিয়া সঙ্গীসহ যেখানে প্রথম এসেছিলেন সেইস্থান প্রথমে বারোবাজার নামে খ্যাত হয়। পরে এই বাবোবাজাবই নাকি যশোর নামে পরিচিত হয। এই যশোর থেকে পূর্বে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণের গহন বনাঞ্চলেও তিনি অনেক রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলেন। মানব সভ্যতায জনপদ স্থাপনের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রথম ও প্রধান শর্ত হোলো যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ। খানজাহান আলী সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে এই শর্তটি পূরণ করেছিলেন। সেই কারণে খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাতকে দক্ষিণবঙ্গের দ্বিতীয পর্যাযের মানব সভ্যতা স্থাপনের রূপকার বলা যেতে পারে।

খানজাহান আলীর তৃতীয় জনহিতকর কাজ জনসাধারণের জন্য পানীয় জলের সংস্থান করা। এখনকার মতো তখনকার দিনেও দক্ষিণবঙ্গের নদনদীর জল ছিলো লবণাক্ত ও অপেয়। খানজাহান আলী তাই পানীয় জলের সংস্থান করতে অনেক দীঘি খনন করিয়েছিলেন। সেইসব দীঘির অনেকগুলি আজও বর্তমান। আজও লোকে সেইসব দীঘির নির্মল সুপেয় জল পান করার সময় খাজাহান আলীকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে।

বাগেরহাটে খানজাহান আলীর মাজারের সম্মুখে বিশাল একটা দীঘি তাঁর স্মৃতি বহন করে চলেছে। লোকে বলে খাঞ্জালী দীঘি। খানজাহান আলীর নাম লোকমুখে সরলীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে ''খাঞ্জালী''-তে। তা অতো বড়ো নাম কি গ্রাম্যলোকগুলির মুখে উচ্চারিত হয়। একটু বিকৃত তো হবেই। খানজাহান আলীর মাজার থেকে বেরিয়ে এসে খাঞ্জালী দীঘির ঘাটের পৈঠের ওপর বসলাম।

খানিক দূরে আর একটা পৈঠের ওপর বসেছিলো কয়েকটি কিশোরী। তাদের মুখের কলকল কথা ও খিলখিল হাসি দীঘির ঘাটে আছড়ে পড়া ঢেউ এর ছলছলাৎ-এর সঙ্গে মিশে অপূর্ব এক সঙ্গীতের সৃষ্টি করতে থাকলো। আমার দিকে হঠাৎ ওদের চোখ পড়তেই ওদের কথা ও হাসি গেলে শূন্যে মিলিয়ে। আমার মনে হোলো বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই মুখাবয়বে নীরসতা ফুটে উঠেছে। পরে আমার ভুল ভাঙলো। ওদের মধ্য থেকে একটি কিশোরী একটু ইতস্তত করে আমাকে বললো, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বলালম, কলকাতা থেকে এসেছি। দেখতে এসেছি সোনার বাংলাদেশকে। আর তোমরা ? তোমরা কোথা থেকে এসেছো ?

এতোক্ষণে মেয়েগুলির সঙ্কোচ কেটে গেছে অনেকখানি। সকলেই কথা বলতে চায়। সেইসব কথা একত্রিত করলে দাঁড়ায় আমরা খানজাহানিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এই তো আমাদের ইস্কুল। হাত বাড়িয়ে তারা দেখিয়ে দিলো তাদের ইস্কুল। যাবেন আমাদের ইস্কুলে?

মেয়েগুলির সঙ্গেই তাদের ইস্কুলে এলাম। তারা আমাকে নিয়ে এলো প্রধানশিক্ষক মশাই-এর অফিসে। কিন্তু কীভাবে আমার পরিচয় দেবে! আমার পরিচয় তো জানে না তারা। তাই তারা কিছু বলার আগেই প্রধান শিক্ষক মশাইকে আমার পরিচয় দিলাম। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও এসে বসলেন প্রধানশিক্ষকমশাই-এর অফিসে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে চায়ের ব্যবস্থাও হয়ে গেলো। আলোচনা চলতে থাকলো চায়ের সঙ্গে সঙ্গে। নানা কথার ফাঁকে একজন শিক্ষিকা বললেন' আপনার বই কি বাংলাদেশে পাওয়া যায়?

বললাম, পাওয়া যায় কিনা জানি না। তবে এদেশের পাঠক-পাঠিকারা যদি আমার লেখা বই পড়তে চান তাহলে বই-এর ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই ভাবত থেকে আমার বই আমদানী করবেন। তখন এদেশে আমার বই পাওয়া যাবে। তবে তাঁকে আশ্বস্ত করে

বললাম, ততোদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না। আপনি আমাব বই পড়াব ইচ্ছা প্রকাশ কবেছেন। লেখক হিসেবে সেইজন্যে আমি আনন্দ বোধ করছি। আমি কলকাতা ফিরে গিয়েই আপনাদের প্রধান শিক্ষকমশাই-এব ঠিকানায় আমাব সম্প্রতি প্রকাশিত বইগুলি ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবো। বাংলাদেশ থেকে ফিবে এসে আমাব কথা বেখেছি।

খাঞ্জালী দীঘিব কথা উঠলো। জানতে চাইলাম এই দীঘির পানি লোকে এখনো পান কবে কিনা। প্রধান শিক্ষকমাশাই বললেন, আজকাল গভীব নলকূপেব পানিই লোকে পান কবে। তবে এই দীঘিব পানিও যাতে দূষিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি আছে সকলেব। তাই এই পানি পান কবায় কোন ক্ষতি হবাব সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, এই দীঘিব পানি পান কবলে পুণ্য হবে, মংগল হবে, বলে যাবা মনে কবে তাবা এই দীঘিব পানি পান কবে।

জানতে চাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই কি এইবকম পুণ্যার্থী আছেন। সকলেই সমস্বরে বললেন, এই ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান নেই। লোকে যখন শোনে এই কাজ কবলে মংগল হবে তখন সে যে ধর্মেরই হোক না কেন ঐ কাজ কবে। তাই হিন্দুবাও এই দীঘিব পানি পান কবে নিজেদেব ছেলেমেয়ে সংসাবেব মংগল কামনা কবে।

একজন বললেন, এই দীঘিব পানিতে কুমীব আছে। শুনে জানতে চাইলাম, এই দীঘিতে কুমীব এলো কোত্থেকে? শিক্ষকমশাইবা বললেন, শুনেছি, খানজাহান আলী দুটো কুমীবেব বাচ্চা এনে এই দীঘিতে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তাদেব একটাব নামছিলো কালো পাহাড় এবং অন্যটাব নাম ছিলো সাদাপাহাড়। প্রায় ছশো বছব আগে ছাড়া সেই কালো পাহাড় এবং সাদাপাহাড় কি আজও বেঁচে আছে? তা তো সম্ভব নয়। শিক্ষকমশাইবা জানালেন তাবা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। তবে তাদেব সন্তান সন্ততিবা আছে। লোকে বলে, এখন এই দীঘিতে পাঁচটা কুমীব আছে।

প্রধান শিক্ষকমশাই এবং অন্য শিক্ষকশিক্ষিকাদেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেড়িয়ে এলাম খানে আজম হজরত খানজাহান আলী বহমাতেব পবিত্র মাজাব থেকে। খানিক দূবে হাঁটা পথের দূরত্বে ষাট-গম্বুজ মসজিদ। সেই ঐতিহাসিক মসজিদ দেখাব জন্যে সেই দিকে পা বাড়ালাম এবং খুবই কম সময়ের মধ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলাম।

প্রাঙ্গণটি সাজানো। সুন্দব সুন্দব ফুলের বাগান এবং তাদেব মাঝে মাঝে লাল সুবকি বেছানো পথ। সেই পথ ধবে হাঁটছি। দেখি, বড়ো একটা বোর্ডে লেখা—

"ষাট-গম্বুজ মসজিদ, বাগেবহাট

(সংক্ষিপ্ত পবিচিতি)

বাংলাদেশেব বৃহত্তম আয়তাকাবে ১৬০ x ১০৮ ফুট অপূর্ব কারুকার্য খচিত পাঁচ শতাব্দীরও অধিককালের প্রাচীন এই মসজিদ। স্থাপত্য কৌশলে লাল পোড়ামাটির ওপর লতাপাতার অলংকবণে মধ্যযুগীয় স্থাপত্য শিল্পে এই মসজিদ এক বিশেষ স্থান অধিকাব



বাগেরহাট — ষাটগম্বুজ মসজিদ

করিয়া আছে। যদিও ইহা ষাট-গম্বুজ নামে পরিচিত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চতুষ্কোণের বুরুজের উপর চারটি গম্বুজ সহ ইহার মোট চুয়াত্তরটি গম্বুজ আছে এবং মধ্যের সারির বাংলাচালের অনুরূপ সাতটি চৌচালা গম্বুজ সহ ইহাতে মোট একাশিটি গম্বুজ আছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে ইহার প্রার্থনাকক্ষের চৌচালা ছাদ ও গম্বুজগুলি ইঁট ও পাথরের সাতটি খাম্বার দ্বারা সমর্থিত খিলানের ওপর নির্মিত। ইমারতটির গঠন বৈচিত্র্যে তুঘলক স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইঁটের বিরাট বিরাট দেওয়াল পোড়ামাটির ফলকে অপূর্ব নকসাকৃত দশটি মেহেরা, বক্র কার্নিশ ও কেব্‌লা দেওয়ালের দরজা, ষাট গম্বুজ মসজিদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। আনুমানিক ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে খানুম আজম উলুঘ খানজাহান (আলাদিহির রহমত উল্লা আল গফ্‌রান) নামক এক মহাপুরুষ এই বিখ্যাত মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।"

খানিক আগে খানে আজম হজরত খানজাহান আলী রহমাতের মাজারে গিয়ে দেখে এলাম তাঁর সমাধির পায়ের দিকের একটা অংশ সুন্দর কাপড়ের গেলাপে আবৃত। সেই

আবৃত অংশে পাথরে আরবি অক্ষরে ক্ষোদিত আছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো ৮৬৩ হিজরীর ২৬শে জিলহজ্জ, অর্থাৎ ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। খানজাহান আলী নিজে একদিকে যেমন শাসক ছিলেন অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রচারক। তাহলে আমাদের অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, এই ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণে, যেটি নির্মিত হয়েছিলো ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে, খানজাহান আলী প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। এমনও হতে পারে, উলুঘ খানজাহান এবং খানজাহান আলী ছিলেন পরস্পরের দোস্ত্। ইসলাম ধর্মপ্রচারে তাঁরা একযোগে কাজ করেছেন।

প্রাঙ্গণ থেকে গেলাম ষাট গম্বুজ মসজিদের অভ্যন্তরে প্রার্থনা কক্ষে। সেখানে জমায়েত হয়েছেন অনেক পুর্ণার্থী। তাঁদের নমাজ পড়া কেবলমাত্র শেষ হয়েছে তখন। তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন দূর দূর গ্রাম থেকে। বাড়ি ফেরার তাগিদ তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। কথায় বলে ঘরমুখো বাঙালি।

আমি ইমাম সাহেবের কাছে গেলাম। ইমাম সাহেব বেশ সৌম্যদর্শনপুরুষ। এখনো মধ্য বয়সে উপনীত হননি। কালো পোশাক-পরিচ্ছদে প্রায় সর্বাঙ্গ আবৃত। গলায় ও হাতে জপের মালা। অভিবাদন জানালাম তাঁর কাছে গিয়ে। বললাম, ইমাম সাহেব ! আপনি এই মসজিদের ইমাম হিসেবে কতোদিন আছেন ?

ইমাম — ইমাম হিসেবে আমি এখানে পনেরো বছর আছি।

আমি — ইমাম সাহেব! আপনার নামটি দয়া করে বলবেন?

ইমাম — নিশ্চয় বলবো। আমার নাম মোহম্মদ মুজিবুর রহমান।

আমি — এখানে প্রতিদিনই কি প্রার্থনা, মানে নমাজ পড়া হয়?

ইমাম — হ্যাঁ! প্রতিদিনই নমাজ পড়া হয়। তাছাড়া সাপ্তাহিক জুম্মার দিন বিশেষ নমাজ পড়া হয়। আর বাৎসরিক দুই উৎসবের দিন, যেমন ইদুলফিতর এবং ইদুল আজাহার, বিশেষ নমাজ পড়া হয়। তখন খুব ধুমধাম হয়। উৎসব তো!

আমি — উদ্যানের বোর্ডে লেখা রয়েছে এই মসজিদ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছে। তারপর থেকে এই মসজিদ ইমারতটিকে সারানো তো দরকার হয়েছে। অর্থাৎ, ইমারতের ওপর কালের প্রভাব তো পড়ে। তাতে ক্ষয়ক্ষতি হয়। ভেঙ্গে যায়। তা এইসব ক্ষয়ক্ষতি সারানোর কী ব্যবস্থা হয়?

ইমাম — এই মসজিদের ওপর একসময় গাছপালা হয়ে গিয়েছিলো। অনেক অংশ ভেঙেও গিয়েছিলো। অনেকদিন সে সব সারানো হয়নি। তারপর বৃটিশ আমল থেকে এই মসজিদের ক্ষয়ক্ষতি, ভেঙ্গে যাওয়া, এইসব সারানো শুরু হয়। এই যে ফলকটা দেখছেন, এটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এই ফলকটা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আবার তৈরি করায়। মসজিদের ওপর জন্মানো গাছপালাগুলো কাটার ব্যবস্থা করে। কয়েকটা গম্বুজও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সেগুলো আবার তৈরি করা হয়।

এখন অবশ্য বাংলাদেশ সরকারেব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মসজিদটির ভার নিয়েছে এবং দেখাশোনা কবছে।

আমি — ইমাম সাহেব! আপনার খবচ-খবচা তো কিছু আছেই এবং আপনাব নিশ্চয়ই অন্য জীবিকা নেই। অথচ জীবন ধারণ কবতে হলে জীবিকার্জন প্রয়োজন। সেই অর্থের সংস্থান কী ভাবে কবেন আপনি?

ইমাম — আমার জীবিকার জন্য অর্থ সবকার থেকে আসে। আমাকে মাসে মাসে বেতন দেওয়া হয়।

আমি — যাঁবা এই মসজিদে নমাজ পড়তে আসে তারা কি নিকটবর্তী এই অঞ্চলেব শহর, গ্রাম ইত্যাদি লোকালয় থেকে আসে? অথবা দূর দূরান্তেব লোকালয় থেকেও আসে ?

ইমাম — কাছাকাছি লোকালয় থেকে আসে, আবাব দূরদূরান্তের লোকালয় থেকেও আসে। যাদেব ইচ্ছা হয় তারাই এখানে চলে আসে নমাজ পড়তে। তারা মনে কবে আল্লা-অলিব দরবারে যদি যাই তাহলে আমাদেব ভালো হবে। আমাদের ধর্মের লোক (মুসলমানেরা) বিশ্বাস কবে যেখানে আল্লাব অলিরা নমাজ পড়ে, সেই জাযগাটা হচ্ছে কবুল জায়গা। সেই জায়গায় যদি নমাজ পড়া হয়, দোযা করা হয, আল্লা তাহলে কবুল কববেন। এইজন্যে দূবদুরান্ত থেকেও লোকে এই মসজিদে নমাজ পড়ার জন্যে আসে।

ষাট-গম্বুজ মসজিদেব ইমাম মোহম্মদ মুজিবুব রহমানের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এইবার আমাব ফেরাব পালা। ফিরবো যশোরে যে যশোর থেকে বেবিযে সাগবদাঁড়ি, রূপগঞ্জ, কালিয়া, টুঙ্গিপাড়া, বাগেবহাট ইত্যাদি কতো জাযগায় গেলাম। কতো জায়গা দেখলাম। দেখলাম কতো মধুর স্মৃতি বিজড়িত বাসগৃহ, মন্দির, মসজিদ, মাজার। কতো হৃদযবান মানুষের সংস্পর্শে এলাম। তাঁদের কাছ থেকে পেলাম তাঁদের হৃদয় নিঃসৃত ভালোবাসা। এই সবই তো আমাব জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

সুদৃশ্য একটা বাস এসে পথের পাশে একেবার আমার সামনে দাড়ালো। যশোব যাবো শুনে কন্ডাক্টর ভাইডি বললে, উঠি পড়েন ছায়েব। উঠে তো পডলাম তার কথা শুনে। খালি একটা সিট্ দেখিযে ভাইডি আবাব বললে বসেন ছায়েব। বসলামও। তখন সে সবকিছু খোলসা কবে বললে, হ্যাই বাসে যাবেন রূপসার ঘাট। ফেবিতে পার হবেন। ওপাবে পাবেন টেম্পো। চইড়া চলি যাবেন খুলনে। হ্যাইখানে বাস পাবেন যশোব যাওনের।

সোজাপথ। সামান্য হাঙ্গামাটি পর্যন্ত নেই। সেই উড়ে ঠাকুবের রান্নার মতন। চাপাইছি কি নামাইছি।

রূপসাব পাড়ে তো এসে বাস থেকে নামলাম। বললাম, হে রূপসী রূপসা আমি চিনি তোমাকে। সকল রূপের রূপকারেব সেই রূপগঞ্জে মাত্র গতকাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

রূপসা সত্যিই রূপসী। সরু পথটি ধরে নেমে এলাম খেয়াঘাটে। খেয়া নৌকোখানা ঘাটেই বাঁধা। চড়ে বসলাম। বাইতে বাইতে মাঝি খেয়া নৌকোখানিকে নিয়ে এলো মাঝদরিয়ায়। হাত নামিয়ে জল ছুঁলাম রূপসার। রূপসার সঙ্গে আবার আলাপ করতে ইচ্ছে হোলো। বললাম, মাত্র গতকাল পরিচয় হোলো তোমার সঙ্গে। শিল্পী সুলতানের বাড়ির পাশটি দিয়ে কুলকুল করে বইছো সেখানে। আজ আবার দেখা খুলনার পাশে। খুলনা এখনো আমার অদেখা। অথচ অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে অদেখা খুলনার সঙ্গে। তোমাকে পার হয়ে সেই খুলনায় যাচ্ছি। তোমাকে আমার চিরকাল মনে থাকবে রূপসা রূপসা।

টেম্পোয় চড়ে এলাম খুলনা শহরের মাঝামাঝি কী একটা মোড়ে। এই অংশটা নতুন গড়ে উঠেছে নিশ্চয়ই। ঘরবাড়ি বড়ো বড়ো নতুন অট্টালিকা। দেখে তো তাই মনে হচ্ছে বাড়িঘর দোকানপাট, হোটেল সবকিছু মিলিয়ে অঞ্চলটা অভিজাত বলা চলে। [illegible] কাছে শুনতে শুনতে খুলনার একটা মানসচিত্র আঁকা হয়ে গিয়েছিলো আমার মনে। মানসচিত্রের আমার সেই খুলনার সঙ্গে এখন চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা খুলনার কোনো রকম মিলন ঘটাতে পারছিনা।

খুলনার ডাক্তারবাবু কালী[illegible] [illegible] ফুটবলের টিম গড়তেন [illegible] সমাজ [illegible] কি [illegible] পথে [illegible] ফার্মেসি নামের ডাক্তারখানাটিও [illegible] ছিলেন। সেখানে রোগী আসতো কম [illegible]। আসতো অভিনেতা খেলোয়াড় আর [illegible]। সেই [illegible] ফার্মেসিটা [illegible] আছে তো। নাকি ডাক্তার বাবুর [illegible] পিছু সব গেছে উধাও হয়ে।

আর বেনেখামার। মীরা [illegible] বলতো বাইরে খামার। সেই বাইরে খামার এখান থেকে কতো দূরে। একটা সময় ছিলো, তখন যদি সেই বেনে খামারে যেতাম ডাক্তার [illegible] হৈ চৈ জুড়ে দিতেন নিশ্চয়ই। হয়তো আমার যাওয়াটাকে উপলক্ষ করে গোটা বেনে খামারের লোককে নিমন্ত্রণ করে বসতেন। আজ সেখানে আমাকে চিনতে পারবে এমন কেউ নেই। আমাকে আপ্যায়ন করার জন্যে বসন্তবুড়ি নেই, ঠাকুমা নেই মা আশালতা নেই। এমন কি সন্তোষ পর্যন্ত নেই। আমি বেনে খামারের দুয়োরের পাশ দিয়ে গেলাম, আমাকে ডাকার জন্যে সেখানে নেই কেউ।

পঞ্চম অধ্যায়

কুষ্টিয়া

অধ্যাপক ইলিয়াস সাহেবের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও খুলনা থেকে আমাকে অনেকখানি রাতের বাসে যশোর ফিরতে হয়েছিলো। অবশ্যই অবাঞ্ছিত ঘটনা কিছু ঘটেনি। মাইকেল মধুসূদন কলেজের প্রভাষকদের হস্টেলে ফিরে দেখি আগের কথা মতো জোল্‌জার রহমান ঢাকা গেছে কলেজের কাজ নিয়ে। মনের মাঝে কোথায় কোন কোণে যেন বাজলো একটু। বাংলাদেশে আমার নতুন পাওয়া আত্মীয়েরও অধিক জোল্‌জার রহমানের সঙ্গে যশোর ছাড়ার আগে একটু দেখা করে যেতে পারলাম না। অবশ্য খলিলুর রহমান ও তার অন্যান্য বন্ধুরা আমাকে বিদায় দিতে রয়েছে। তারাও আমার সঙ্গে আত্মীয়ের মতো ব্যবহারে কিছু ত্রুটি রাখেনি।

রাতটা ওদের হস্টেলে কাটিয়ে সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম আবার সেই বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে, এবার উত্তরে আমার গতি। যশোর থেকে ঝিনাইদহ পার হয়ে যাবো কুষ্টিয়া— লালন শাহের, রবীন্দ্রনাথের মীর মোশাররফের স্মৃতি-বিজড়িত কুষ্টিয়া।

পথে সেই চির পরিচিত দৃশ্য। রাস্তা ঘেঁষে ধানক্ষেত। এমন খরিফ মর্সুম নয়। খেতে ধান রোপণের সময় নয়। কিন্তু পেট তো সে কথা মানতে চায় না। তাই গবেষণা করে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ আবিষ্কার করতে হয়। পেটের তাগিদে সেই উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করতে হয় মাঠ জুড়ে। বর্ষা বা শরতের বাংলা নয়। তবু ধানের কল্যাণে চৈত্র শেষেও দিগন্তব্যাপী সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। আবার ছোটখাটো শহরও পড়ছে পথে। পথে যেতে দেখা ঘরবাড়িতে মানুষজন, গোরুবাছুর, হাঁসমুরগী, গাছপালা, সবই তো আমার আবাল্যের চেনা। বিদেশে এসেছি, কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গবাসী হলেও আমি সে বাঙালি।

কুষ্টিয়া পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে গেলো। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিকসায় এলাম শহরের মাঝে এক হোটেলে। হোটেলটা তিনতারা বা পাঁচতারার অভিজাত্য জাহির করছে না। অতি সাধারণ একটা হোটেল। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এক বিছানার ঘর, ঘর-লাগোয়া স্নানের ঘর। আমার আর কী চাই। আমি বাংলার গাঁয়ে-ঘরের নিতান্ত মধ্যবিত্ত এক মানুষ। পশ্চিমী আদব-কায়দা আসে না আমার। আর পশ্চিমী আদব-কায়দা নিয়ে আত্ম-জাহির করার-ই বা কী আছে আজও তা বুঝতে পারলাম না। হোটেলে এক-বিছানার ঘর পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলে হোটেল-ম্যানেজার একগাল হেসে বললেন, তা আবার নেই ! তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে জনাবের?

বললাম, কলকাতার লোক আমি। এসেছি আপনাদের বাংলাদেশ দেখতে।

বড়ো বড়ো চোখ করে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে হোটেল ম্যানেজাব এক ঝলক দেখলেন আমাকে। তাবপব আমার কথায় প্রবল আপত্তি জানিযে বললে, জনাব! আমাদেব বাংলাদেশ কেন বলছেন' জনকয়েক রাজনীতিকের অপচেষ্টায় দেশটা ভাগ হযে গেলো। আব বাংলাদেশটা আমাদের হযে গেলো। আপনার পব হয়ে গেলো।

আমার অন্তরের কথা আমাকেই বললেন ভদ্রলোক। ভালো লাগলো খুব। ভদ্রলোক কিন্তু তত‍োক্ষণে আবেগ ছেড়ে বাস্তবে ফিবে এসেছেন। বললেন, দেখুনতো কি কাণ্ড' আপনি এলেন তেতেপুড়ে ! আর আমি কিনা তত্ত্ব কথা পেড়েছি. বলেই হাঁক দিলেন, এ্যাই মন্‌সুর ! কোথা গেলি রে ছোঁড়া!

মন্‌সুরকে অফিসে রেখে ম্যানেজার সাহেব নিজে এলেন আমাকে ঘর দেখিয়ে দিতে। খাট বিছানা স্নানের ঘর সবকিছু দেখিয়ে শুনিযে বললেন, গোসল সেবে নিন জনাব। পাশেই রয়েছে ভাতের হোটেল। খেয়ে দেয়ে একটু গা-গড়িয়ে নেবেন। তারপর যাবেন ছেঁউড়িয়া—লালন শাহ-এব মাজারে। একটু থেমে আবাব বললেন, আপনি খুব ভালো দিনে এসেছেন, জনাব। আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। দোলের দিন। আজ লালন শাহ-এর মাজারে বার্ষিক উৎসব। সে এক এলাহি ব্যাপাব।

ছেঁউড়িয়া ঃ শুনে সতিই চমৎকৃত হলাম। আমাব অদৃষ্ট দেবতাকে বার বার ধন্যবাদ জানালাম। এমন সৌভাগ্য তো অদৃষ্ট-দেবতার কৃপা ছাড়া হয না। বেলা তিনটেব সময় যাত্রা করলাম ছেঁউড়িয়ায় লালন শাহ-এর মাজারের দিকে।

লালন শাহ-এব জন্মস্থান কোথায় তা নিয়ে মতদ্বৈত আছে। তবে তাঁব সাধন-স্থান ছিলো কুষ্টিয়ার পাশে ছেঁউড়িয়া গ্রামে। তিনি জন্মসূত্রে ছিলেন হিন্দু। পরে সিবাজ সাঁই নামে এক মুসলমান ফকিরের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁব সাধনায় হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মেরই যোগ দেখা যায়। লালনের সাধনা ও গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও মুসলমানের যুক্তভাব।

শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল তাঁব 'রবিজীবনী'র তৃতীয় খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায উদ্ধৃতি সহকারে লিখেছেন, "বিখ্যাত সাধক লালন ফকির শিলাইদহের নিকটে কুষ্টিয়া রেলওয়ে স্টেশান থেকে প্রায় এক মাইল পূর্বে সেঁউড়িয়া (সেওরিযা) নামক স্থানে বাস কবতেন। পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে রঙ্গপুর, দক্ষিণে যশোহর এবং পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক লোক এই লালন ফকিরের শিষ্য। শুনিতে পাই ইঁহার শিষ্য দশ হাজারেব উপর। (লালন ফকিরঃ কবি ও কাব্য—সনৎকুমার মিত্র)। ইনি বিভিন্ন জায়গায় গান গেযে বেড়াতেন, কুমারখালিতে কাঙাল হরিনাথের চণ্ডীমণ্ডপে ১২৯৭ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে এইরূপ একটি সঙ্গীত পরিবেশনেব উল্লেখ জলধর সেন করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব সঙ্গে 'শিলাইদহ বোটের উপর' ২৩শে বৈশাখ, ১২৯৬, (রবি) তাঁব সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তাব প্রমাণ আছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্কেচের খাতায় সেখানে তিনি 'লালন ফকীর'-এব

একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। প্রত্যক্ষদর্শীব আঁকা এইটিই লালনেব একমাত্র চিত্র। পববর্তী-কালে নন্দলাল বসু এই স্কেচটি অবলম্বনে লালনের একটি চিত্র অঙ্কন কবেন, 'আপন মনের মাধুবী' মেশালেও লালনেব উন্নত ললাট ও তীক্ষ্ণ নাসাব বৈশিষ্ট্য নন্দলাল রক্ষা করেছেন—চিত্রটি বিভিন্ন গ্রন্থে বাবংবাব মুদ্রিত হওযায বহুল পরিচিত।''

বাংলার লোকগীতি, বিশেষ করে বাউলগানের ভাণ্ডারী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। তিনি লালন, শাহ্-এব বহুগান সংগ্রহ কবেছিলেন। সেইসব গানের মাত্র কুড়িটি প্রবাসী'তে প্রকাশিত হযেছিলো। পত্রপত্রিকায বাউলগান প্রকাশে বচনাকাবী বাউল সাধকগণেব অনীহা ছিলো। এই অনীহার কাবণটি উদ্ধৃত করি ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীব 'বাংলাব বাউল' থেকে।

''আমি একজন বাউলকে তাঁহাদের এই গোপনীয়তাব কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, বাবা, ইহা তো সাহিত্য নয। ইহা আমাদেব অন্তরঙ্গ প্রাণবস্তু, আপন আত্মজা। যদি কেহ আমাব কন্যাকে এই বলিযা প্রার্থনা করে যে তাঁহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব, তবে সে ক্ষেত্রে আমাব দেওযাই উচিত। সেই দেওয়াতে আমি ধন্য। তিনি ধন্য। আমাব আত্মজাও ধন্য। কিন্তু কোন লোক শুধু রসাস্বাদন-সুখেব জন্য যদি আমাব আত্মজাকে চাখিযা দেখিতে চাহেন তবে প্রার্থয়িতাও অধন্য, আমিও অধন্য, আত্মজাও অধন্য। এইসব বাণী সাহিত্য বসেব আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা সাধনাব জন্য। হযতো ইহাতে সাহিত্য বসও আছে। কিন্তু তাহাতো মুখ্য লক্ষ্য নহে। তাই ইহা আমবা প্রচার কবি না। তবে সাধনার্থীজন সাধনার জন্য চাহিলে কখনো প্রত্যাখ্যন কবি না। তবে দেখিয়া লই যে ইঁহার এই প্রার্থনা সাচ্চা কিনা।''

বাউল গানগুলিব অধিকাংশই নিরক্ষব, চলতি কথায় যাঁবা অশিক্ষিত, বাউল সাধকগণের বচনা। অথচ এই গানগুলি অতি উচ্চাঙ্গেব সাহিত্যরসেব দ্যোতক। এই প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত 'বাংলাব বাউল' থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রণিধানযোগ্য।

''প্রবাসী'তে 'হারামণি' নামে দুই একটি কবিয়া গান তখন হইতে বাহির হইতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলাম, কেহ কেহ বলিতেছেন, 'এইগুলি এত ভাল যে তাহা কখনো নিবক্ষবদের বচনা হইতে পারে না। ইহা এখনকাব শিক্ষিত লেখকের রচনা।' ববীন্দ্রনাথ শুনিযা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বলিলেন, 'শিক্ষিত লোকেব মুবদ তো আমাব অজানা নেই। এইসব জিনিষ যে তাঁহাদেব বচনার শক্তিব বাহিরে তাহা আমি খুবই বুঝি। একটা পাইলে হযতো তাঁহারা কতক অনুরূপ আর একটা গান বচনা কবিতে পারেন। কিন্তু মূলটা রচনা কবা কোন শিক্ষিত লোকেব কর্ম নয। অন্ততঃ আমাব তো তাহাব কাছাকাছি শক্তিও নাই।''

ক্ষিতিমোহন আবও বলেছেন, 'ইঁহারা (বাউল সাধকেরা) সবাই নিম্নশ্রেণীব নিরক্ষর লোক। কিন্তু দৃষ্টিব গভীরতায ও প্রকাশের অপূর্বতায় অতুলনীয় ইঁহাদের শক্তি। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইঁহাদেব গান দেখিয়া বলেন—এমন সহজ, এমন গভীর, এমন সোজাসুজি সত্য এত

অল্প কথায় এমন অপূর্বভাবে প্রকাশ করিবার শক্তি আমাদেরও নাই। আমাব তো ইঁহাদের বচনা দেখিয়া রীতিমত হিংসা হয।"

এই বাউল সাধকগণেব অগ্রগণ্য ছিলেন লালন শাহ। লালন শাহ-এব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হযেছিলো কিনা বলা শক্ত। যদিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওযা কিছু অসম্ভব ছিলো না। এই প্রসঙ্গে তাঁব 'রবিজীবনী' তৃতীয় খণ্ডের ১৪০ পৃষ্ঠায় প্রশান্তকুমাব পাল লিখেছেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব মতো রবীন্দ্রনাথেব সঙ্গেও লালন ফকিরের সাক্ষাৎ পবিচয় হযেছিলো কিনা এই প্রশ্নটিও বিচার্য। অল্প বয়সে মহর্ষি বা জ্যোতিবিন্দ্রনাথেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ কয়েকবার শিলাইদহ গেলেও, পবিণত বয়সে জমিদাবিব দাযিত্ব নিযে তিনি সেখানে গেলেন বলেন্দ্রনাথ সহ সপবিবাবে বর্তমান বৎসবে (১২৯৬, ১১ই অগ্রহাযণ তাবিখে), এ যাত্রায় তিনি শিলাইদহে ছিলেন এক মাসেব কিছু কম ; এবপব পৌষ মাসেব শেযে আবার তিনি জমিদাবি পবিদর্শনে গেছেন—কিন্তু সেবাব যান সাজাদপুরে। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসেব তৃতীয সপ্তাহে তিনি আর একবাব দিন কুড়িব জন্য শিলাইদহে যান। এবপব মাঘ ১২৯৭-এ তিনি আবাব যখন কালীগ্রাম-সাজাদপুব-শিলাইদহ পবিভ্রমণ করেন, তখন লালন ফকিবেব মৃত্যু ঘটেছে—তাঁব মৃত্যুব তাবিখ 17 October (শুক্রবাব ১ কার্ত্তিক) সুতবাং লালনেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব যদি সাক্ষাৎ হযে থাকে তাহলে তা অগ্রহাযণ-পৌষ ১২৯৬ বা জ্যৈষ্ঠ আষাঢ ১২৯৭-এ শিলাইদহে অবস্থানকালেই সম্ভব। কিন্তু এইসময়ে ইন্দিবা দেবী বা প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্রগুলিতে নানাবিধ ঘটনাব কথা উল্লেখ কবলেও লালন সাক্ষাৎকাবেব প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত। অথচ জলধব সেন তাঁব 'কাঙাল হবিনাথ' গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডে (১৯১৩) লিখেছেন ঃ 'শুনিযাছি কবিবব ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব শিলাইদহের কুঠিতে লালন একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ কবিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আবম্ভ কবিযা অপবাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত গান চলিযাছিল। ইহাব মধ্যে কেহই স্থানত্যাগ করিতে পারে নাই। ঘটনাটি সত্য হইলে নিঃসন্দেহে লিখে জানাবার মতো, কিন্তু সমসাময়িক পত্রাবলীতে এর কোন উল্লেখ নাই এবং ১১৫ বছবের বৃদ্ধেব পক্ষে একটানা আট-নয ঘণ্টা গান গেয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা তাও ভেবে দেখা দরকাব।"

তবে "লালনের শিষ্যধারার একজন ছিলেন ববীন্দ্রনাথের শিলাইদহে ডাকহবকরা। তাঁহার নাম ছিলো গগন। তাঁহার গান রবীন্দ্রনাথ তাঁহার Hibbert বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।" —(বাংলার বাউল-ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী)।

ক্ষিতিমোহন বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তরুণ বয়সেই বাউলদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহাব 'বৈষ্ণবী'ব কথা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারই ইহা জানেন। তাঁহাব জমিদাবীর শিলাইদহ পরগণার কাছেই লালন ফকীরের স্থান। লালনের বিশাল একটি প্রতিভা ছিল। তাঁহারই অনুরাগী কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (ফিকিরচাঁদ বাউল)। হবিনাথেব অনুরাগীরা বাউল না হইলেও সবাই কৃতী——তাঁহাদের মধ্যে রাজসাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্র'র নাম

সুপবিজ্ঞাত। যে শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের তন্ত্রতত্ত্ব অনুবাদ কবিযা আর্থাব এভেলন ধন্য হইলেন সেই বিদ্যার্ণবও হরিনাথের অনুবাগী। বাংলাদেশে স ্বাদপত্র-গুরুস্থানীয় জলধর সেনও হবিনাথেবই আপনজন।"

গানই বাউল সাধকেদেব সাধনার প্রধান পথ। গানই তাঁদেব সাধনার মন্ত্র। গানের মধ্য দিয়েই তাঁরা মনের মানুষকে পাবার পথে অগ্রসব হন। এই কথাটি পবিস্ফুট কবতে 'বোষ্টমী'র মুখে ববীন্দ্র বলেছেন, "মানুষেব কণ্ঠ দিযাই ভগবান তাঁহার অমৃত মানুষকে পান কবাইয়া থাকেন। অমন সুধাপাত্রতো তাঁব হাতে আব নাই। আবাব, ঐ মানুষেব কণ্ঠ দিয়াই তো সুধা তিনিও পান কবেন।"

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীও বাউলদেব সঙ্গীত প্রীতিব কথায বলেছেন, "বাউলদেব কাছে কোন প্রশ্ন কবিলে তাঁহাবা কথায বড একটা উত্তব দেন না। উত্তর দেন গানে। কত গানেব ভাণ্ডাব-ই যে তাহাদেব আছে' আব ঠিকমত তাহা তাঁহাদেব মনেও আসে। গান কেন কবেন, কথায কেন বলেন না, জিজ্ঞাসা কবিলে বলেন,

আমবা পাখীব জাত;
আমবা হেঁটে চলাব ভাও জানি না
আমাদেব উড়ে চলাব ধাত।"

বেলা তিনটেব সময় এসে উপস্থিত হলাম লালন শাহ্-এব মাজাবে। একটু দূবে বইছে গোবাই নদী। তাব পাশে ছিলো এক গ্রাম। নাম তাব সেঁউড়িয়া। স্থানীয় উচ্চাবণে অনেক 'স' হযে পড়ে 'ছ'। 'সেউঁডিযা'ও তাই লোকমুখে ছেঁউড়িয়া হযেছে। তা সে সেউডিযা-ই হোক, আব ছেঁউডিযা-ই হোক, গ্রামের নামটি আছে। কিন্তু গ্রামটি গেছে তলিযে শহবেব নীচে। কুষ্টিযা শহর বাডতে বাডতে এসে গ্রাস কবে নিযেছে ছেঁউডিয়াব গ্রাম-চবিত্রকে। অবশ্য ঘিঞ্জি শহব বলতে যা বোঝায ছেঁউড়িযা এখনো তেমন শহব হয়ে ওঠে নি। একটু খোলা মেলা আছে এখনো।

বিকসায় বসে থাকতেই কানে ভেসে আসছিলো গানেব সুব দূর থেকে। কাছে এসে দেখি, এযে বাউল মেলা। মেলা শুরু হযেছে মাজাবে যাবার বাস্তায় অনেক দূর থেকে। বাস্তাব দু'পাশে দোকান। কতো রকমেব। তবে মিষ্টির আর তেলে ভাজাব দোকানই বেশি। ডাইনে-বাঁয়ে দোকান নিয়ে সেই রাস্তা এসে ঢুকে পড়েছে লালন মাজারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে।

চাবিপাশে পাঁচিল দিযে ঘেরা মাজার প্রাঙ্গণের পবিমাণ কতোখানি হবে ঠিক ধারণা করতে পারছি না। লোকে ঠাসা বলে ধারণা করাও শক্ত। তবু মোটামুটি একটা আন্দাজ কবে বলা যায় ঠিক মতো হিসেব কবে বানালে ফুটবলের খান তিনেক মাঠ কবা যায় প্রাঙ্গ ণের জমিটুকুতে।

সেই বিশাল উঠোন জুড়ে বসেছে বাউলের দল। কোন দল গাছের নীচে মাদুর বা শতরঞ্চি বিছিয়ে আসর জমিয়েছে। কোন দল গাছেব ছাযায় ঠাঁই না পেয়ে ছোটখাটো শামিযানা টাঙিয়েছে। আবাব কোন দল মূল-মঞ্চেব ছাযায় বসে পড়েছে। আবার অনেক

দল রয়েছে যাদেব মাথার ওপর ফাল্গুনের উন্মুক্ত আকাশ। দল বলতে চার-পাঁচজনেব ছোটখাটো দলও আছে। আবার বিশ-পঁচিশজনের বড়ো দলও রয়েছে। এক একজন গুরুকে ঘিরে তাঁদের চেলারা দল বেঁধেছেন। প্রায় সব দলেই নাবীপুরুষ উভযই আছেন।

মাজারের সেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাউলদলের কতোগুলি এসে বাসা বেঁধেছে আমি গুনে দেখিনি। ঘরের কাছে অজয়তীরে কেঁদুলীর জয়দেব-মেলা আমাব আজও অদেখাই থেকে গেছে। তাই বলতে পাববো না, অজয়তীরের জয়দেব মেলা বড়ো, না গোরাইতীরেব লালন মেলা বড়ো। তা এতো ছোট-বড়োর হিসেবে আমার কাজ কী! যা দেখিনি তা আমাব মাথায় থাক। যা দেখছি তাকেই দেখি দুচোখ ভরে।

আমি ঘুরে ঘুবে দেখতে থাকলাম, লালন মাজাবকে কেন্দ্র কবে জমাযেত-হওয়া বাউলেব দলগুলিকে। অসংখ্য দলের মধ্যে রয়েছে কযেকটি বিখ্যাত দল। যেমন, চাপাইগাজি কবির দল। এই দলের অধীনে আবার অনেক দল আছে। তারাও এসেছে এখানে এবং ছড়িয়ে ছিটিযে আছে। উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে এসেছে মেহেবপুবেব দল, আলমভাঙ্গাব দল, পাবাকপুবেব দল, ভেড়ামারাব দল এবং মথুবাপুবেব দল।

তখনো অনেক দলের খাওয়া হয়নি। কোনদলেব সেবাদাসী ইঁট-খাড়া-করা উনোনে খড়-কুটোব জ্বালে ভাত ফোটাচ্ছে এ্যালুমিনিযামেব হাঁড়িতে। কোনদলেব বাউলেবা খেতে বসেছে। কোনদলে গান উঠেছে জমে। নাচে গানে-মুখর হযে উঠেছে। একটা দলে মাঝবয়েসী এক বাউল রমণী গান ধরেছেন; খানিক পবে বোধ হয় ভাব এসে গেলো তাঁব। গানের তালে তালে নাচতে থাকলেন, একটু দূবে নারীপুরুষের আব একটি দলেব কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দলের গুরু তাঁদেব পাতা মাদুরের ওপর বসতে আমাকে আহ্বান জানালেন। গুরুব মুখ গোঁপ দাড়িতে ঢাকা। তবু বোঝা যায় মাঝ বযেস পাব হযে শেষ বেলাব দিকে ঢলে পড়েছেন। তবে বাউল সাধকদেব বয়েস বোঝা ভাব। কৃচ্ছ সাধন, নিয়মভাঙা জীবন-যাপন, নেশাভাঙে আসক্তি, সব মিলিযে দেহতবীকে দড়িপাকানো কবে তোলেন। সমযেব স্রোতে ভেসে চলা সেই দেহে বয়েসের আন্দাজ পাওযা ভার।

ঘন পাতার কি একটা গাছের নীচে খান কযেক ছেঁড়া মাদুব পাতা। তাব ওপব গুরুকে মাঝে নিযে বসেছে দলের অন্যান্যবা। গুরুব ডানপাশে একটি কিশোব গান ধরেছে। মাথায় একমাথা চুল চুড়ো করে বাঁধা। মুখে কৈশোবেব শ্রী। গলাটিও মিষ্টি। কিশোরটি লালনেব কোন গান গাইছিলো। শুনতে বেশ লাগছিলো।

গুরুব অন্যপাশে প্রস্তুত হচ্ছিলো গঞ্জিকা—সাধনার সহযোগ। একজন বাঁহাতেব তালুব ওপর গঞ্জিকার শুকনো পাতা বেখে ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডললো অনেকক্ষণ। তাবপর ছোট্ট কল্‌কেটি ঝাড়া-মোছা করলো এবং ঠিকবে দিয়ে কলকের পিছনেব ছিদ্র বন্ধ করে তাব ওপর ডলা-গঞ্জিকাটুকু রাখলো। শেষে তার ওপব নারকেল ছোবড়াব গুলি রেখে আগুন ধরালো। আমাব আবাল্য পরিচিত দৃশ্য। আমাদের গ্রামাঞ্চলে তখন অনেক গেঁজেল ছিলেন।

গঞ্জিকা প্রস্তুত হলে চেলাটি গুরুব হাতে কল্‌কে দিলো। গুরু অত্যন্ত বিনীত হয়ে কল্‌কেটি দু'হাতে বাড়িয়ে ধবলেন আমার দিকে। বললেন, 'পেসাদ' করে দেন বাবু! প্রসাদ কবে দেবার এমনি 'অফাব' আমি আব একবাব পেয়েছিলাম। কিন্তু সে অনেককালের কথা। তাই এখন থাক সেকথা। বাউল গুরুজিব অফাব কবা কলকে ধরে টান দেবো বুকে সে জোব আজ আব নেই। হাত জোড় কবে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

এলাম লালন শাহ এব মাজাবে। দক্ষিণ-মুখী সৌধ। সৌধেব মাথায সাদা বঙেব সুউচ্চ গম্বুজ। তাব গায়ে লতাপাতাব নকসা। নম্র চিত্তে প্রবেশ কবলাম বিশাল প্রতিভাধব লালন সমাধি কক্ষে।



কুষ্টিয়া — লালন শাহের মাজার

কক্ষেব মধ্যে দুইপাশে-দুটি সমাধি। ডানপাশেবটি লালনের আব বাঁ-পাশেরটি তাঁর মায়ের। দর্শনার্থীরা বাতি ও ধূপ জ্বেলে সমাধির পাশে বসিযে দিচ্ছেন। বাইরে বারান্দায় দু'পাশে দুটি কবে মোট চারটি সমাধি। এইগুলি ফকির জাগো শাহের নানীর, জাগো শাহের, লালন শাহেব সেবাদাসী বিশাখা ফকিরানী এবং ফকিব শীতল শাহের কবর।

কবরের ওপর লেখা অনুসারে বিশাখা ফকিরানীর মৃত্যু হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দে। এঁরা প্রত্যেকেই লালন শাহ্-এর খুব ঘনিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। মাজার সৌধের চত্বরে রয়েছে মোট নয়টি সমাধি।

সমাধিগুলি দেখে এলাম 'লালন-একাডেমি'র অফিসে। আলাপ হোলো লাইব্রেরিয়ান মোহম্মদ বাশের আলীর সঙ্গে। তিনি এখানে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করছেন ইংরেজি

আমি বললাম, লালন শাহ-এর মাজারে আজ দেখছি বিরাট উৎসবের আয়োজন। এই উৎসবের উপলক্ষ কী। বাশের আলি বললেন, লালন শাহ এখানে সাধনা করেছিলেন। তিনি নিজেই দোলপূর্ণিমার দিন এই উৎসব শুরু করেছিলেন। তখন থেকেই এই উৎসব চলে আসছে। তাঁর মৃত্যুর পর এই উৎসবের মধ্য দিয়েই স্মরণ করা হয় তাঁকে। তাই এই উৎসবকে লালন স্মরণোৎসব বলা হয়। প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার দিন এই উৎসব শুরু হয়।

আমি ঃ মাজার প্রাঙ্গণে ঘুরে ঘুরে দেখলাম এই উৎসব উপলক্ষে বাউলের অসংখ্য দল এসেছে এখানে। তারা কি কেবল বাংলাদেশ থেকেই এসেছে এখানে?

বাশের আলী ঃ না! ভারত থেকেও এসেছে। সারা পৃথিবী থেকে এখানে লোক আসে। এখন তো লালন সারা বিশ্বের লালন।

আমি ঃ এই বাউলেরা তো প্রায় অসংখ্য। তাহলে শ্রোতাদের গান শোনাবার সুযোগ কি সকলে পাবে?

বাশের আলী ঃ তাঁরা তো এখানে লোককে গান শোনাতে আসেন না। এটি লালন শাহ-এর স্থান। বাউলদের কাছে তীর্থ-স্থান। তাঁরা তাই এখানে তীর্থ করতে আসেন। এখানে এই মাজার প্রাঙ্গণে তাঁরা দিনরাত গান গেয়ে চলেছেন। কে তাদের গান শুনছে, আর কে শুনছে না, তা নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যথা নেই।

আমি ঃ এখানে এসে বাউলের দলগুলি কতোদিন থাকে?

বাশের আলী ঃ সাধারণতঃ এঁরা তিন দিন থাকেন এখানে। অনেকে আবার তিন দিনের বেশিও থাকেন। এমনকি, সাতদিনও থাকেন অনেকে।

আমি ঃ এখানে এঁদের খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান কীভাবে হয় ?

বাশের আলী ঃ ওঁরা তিন ওক্তে খেয়ে থাকেন। তার মানে, সারাদিনের জন্যে বেলা তিনটের সময় একবার মাত্র খায়। যেদিন মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় সেদিন রাত্রিবেলায় ওঁদের খাবার দেওয়া হয়। তার নাম মোলাইজ দহদ্। তার পরের দিন সকালবেলায় হবে বাল্য সেবা এবং দুপুর বেলায় হবে পুর্ণ সেবা। এই তিনবেলা লালন একাডেমির কমিটি থেকে আগত বাউলগণের খাবার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি দিনগুলির জন্যে ওঁরা খাবার নিয়ে আসেন। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করেন।

আমি ঃ ওঁদের কি কোন আয় হয় এখানে?

বাশের আলী ঃ না ! ওঁদের আয় কিছু হয় না। ওঁরা এখানে তো আয় করতে আসেন না। ওঁবা এখানে ব্যয করতেই আসেন। তবে আজকাল অনেক বাউল-শিল্পী ইউরোপ-আমেরিকা কবে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা অবশ্য অনেক টাকা বোজগার করে থাকেন। কিন্তু তাদের যথার্থ বাউল বলা ঠিক হবে কিনা আমার জানা নেই।

বাশের আলীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সন্ধে হয়ে এলো। তার কিছু পরেই এলেন 'লালন একাডেমি'ব সম্পাদক মিয়া মোহম্মদ বেজাউল হক। এদিকে প্রথম দিনের উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের সময় হয়ে এসেছে। তাই তিনি এসেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থাতে আমি তাঁব কাছে আমার পরিচয় দিলাম। আমাব অনুরোধে হক্ সাহেব তাঁর ব্যস্ততাব মধ্যেও আমাব কযেকটি প্রশ্নেব উত্তব দিতে সম্মত হলেন। আমাব প্রথম প্রশ্নে উত্তরে তিনি জানালেন লালনেব তিরোভাব হয ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দেব ৭ই অক্টোবব। তবু তাঁর স্থির করে যাওয়া উৎসবের দিনটিকে মনে রেখে দোল পূর্ণিমার দিন তাঁর স্মরণোৎসব পালন কবা হয। এই বৎসব তাঁর ১০৮তম স্মরণোৎসব।

বেজাউল হক সাহেব বললেন, আমরা লালনেব সাধনাব স্থান ছেঁউড়িয়া সংলগ্ন কুষ্টিয়াব সন্তান। লালনেব অধ্যাত্মবাদে আমবা বিশ্বাসী। তাই আমবা লালনের অধ্যাত্মবাদ সকল মানুষের কাছে প্রচার করতে চাই। লালনশাহ্ বিশ্বাস কবতেন সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। তাই সকল মানুষই সমান। অথচ মানুষ ঈশ্ববের বিধানেব বিরুদ্ধে কাজ কবে। মানুষেব মধ্যে উঁচু নীচু জাতির ভেদ সৃষ্টি কবে। জাত নিযে স্বার্থপর মানুষেরা মানুষেব মধ্যে ভেদাভেদ আনে। কিন্তু ধর্মেব সাধনা তো ভেদ সৃষ্টি কবা নয। অভেদ সাধনই ধর্মের সাধনা। আমরা লালনেব এই সাধনালব্ধ সত্য মানুষেব মধ্যে প্রচাব করতে চাই।

লালনেব কথা বলতে বলতেই রেজাউল হক ভাই বললেন, গৌরীশদা ! লালনের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আপনাব অনুসন্ধিৎসা দেখে খুব ভালো লাগছে। আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান লালন মঞ্চে। আপনাকে সেই মঞ্চে যেতে হবে দাদা।

আমি করজোড়ে বললাম, ভাই ! আমি গান গাইতে জানিনা। লালনেকে জানতে হলে যে সাধনার প্রয়োজন আমাব সেই সাধনা নেই। তাহলে আমাকে শুধু শুধু লালন মঞ্চে তুলবেন কেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! আমাকে লালন একাডেমির সহ সম্পাদক তাইজাল আলী খান হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এসে তুলে দিলেন লালনমঞ্চে। মঞ্চের উপর আলো কবে বসে আছেন কুষ্টিয়ার জেলা-প্রশাসক আবদুস্ সালাম। তিনি আবার লালন একাডেমির সভাপতিও। আব আছেন লালন একাডেমির গায়ক-গায়িকাবৃন্দ। মঞ্চের সম্মুখে বসে আছেন কম করেও বিশ-পঁচিশ হাজাব লালনপ্রেমী শ্রোতা।

সাধাবণ সম্পাদক রেজাউল হক শাহেব আর পাঁচটা ঘোষণার সঙ্গে আমার পরিচয় দিয়ে শ্রোতাদেব বললেন, কলকাতা থেকে এসেছেন সাহিত্যিক গৌরীশদা, গৌরীশ

মুখোপাধ্যায়। লালনের প্রতি তাঁর প্রেমই তাঁকে টেনে এনেছে এই ছেঁউড়িয়ার লালন আখড়ায়। এরপব অনুষ্ঠান শুরু হোলো। শুরু হোলো লালন বচিত

"সবলোকে কয় লালন কী জাত সংসাবে।
লালন বলে, জেতের কী রূপ দেখলাম না এ নজবে।।" গানটি দিয়ে।

গানটি গেয়ে শোনালেন লালন একাডেমিব সুকণ্ঠ শিল্পীবৃন্দ। তার পব ঘোষণা অনুসারে একে একে উঠলেন লিসা খানম, আর্লিমা পাবভীন, সাধনা পাবভীন, নাসিমা পাবভীন, মনিকা খানম, সাহ আলম প্রভৃতি গায়ক-গায়িকাগণ। কোকিল কণ্ঠী এই সব গায়ক-গায়িকাদেব গান সাবাবাত ধবে শ্রোতাদেব শ্রবণে মধু বর্ষণ কবতে থাকলো। আমি অবশ্য সাবাবাত থাকতে পাবি নি সেখানে। বাত আড়াইটে নাগাদ চুপি চুপি এসে উঠলাম হোটেলেব ঘরখানিতে।

কিন্তু একটি বিষয় আমাব কাছে অভিনব বলে মনে হোলো। সাধাবণতঃ ইসলাম ধর্মাবলম্বী পবিবাবগুলিকে বক্ষণশীল বলেই জেনে এসেছি। তাঁদেব পবিবাবেব মেয়েবা বড়ো একটা বার হতেন না জনসমক্ষে। যদিবা বাব হতেন তাহলে বোরখায় আবৃত হয়ে বাব হতেন। এখন দেখি, বাংলাদেশেব বালিকাদেব মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষাব প্রসাব হচ্ছে অতি দ্রুত গতিতে। তাঁবা বেবিয়ে আসছেন পুবোনো সংস্কাবেব বেড়া ভেঙ্গে। তাঁবা অনুভব কবেছেন আধুনিক শিক্ষাব প্রসাব নাবীদেব মধ্যে মুক্ত মন সৃষ্টি করতে পাবে। নাবীদেব মধ্যে স্বাধীনতাব স্পৃহা বৃদ্ধি কবতে পাবে এবং স্বাধীনতা অর্জনেব ক্ষমতা সৃষ্টি কবতে পাবে। আব নাবীদেব স্বাধীনতা না থাকলে সমাজ ও দেশ কোনভাবেই অগ্রসব হতে পাবে না। এখানে এই লালনমঞ্চে যাঁবা সংগীত পবিবেশন কবছেন তাদেব মধ্যে অনেকেই বীতিমত শিক্ষিতা এবং অভিজাত বংশীয়া। আমাব দৃঢ় ধাবণা, বাংলাদেশ মধ্যযুগীয় সংস্কাবেব খোলস ছেড়ে অতিদ্রুত আধুনিক জগতেব সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন কববে।

এক ফাঁকে আদিত্য শাহীন এসে দাঁড়ালো সম্মুখে। কুষ্টিযাব দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলিব অন্যতম 'আন্দোলনেব বাজার' পত্রিকাব সাংবাদিক সে। তাব প্রশ্নেব উত্তবে জানালাম, কবিব সোনাব বাংলায এলাম কোথায সোনা তার সন্ধানে। এসে দেখি সোনা সর্বত্র— যশোবে খুলনায, সাগবদাঁড়িতে, রূপগঞ্জে, কালিয়ায, টুংগীপাড়ায সর্বত্র।

কুষ্টিযাব সেঁউড়িয়া আখড়া বাড়ি, শিলাইদহেব কুঠিবাড়ি, লাহিনীপাড়ায বিষাদসিন্ধুব লেখক মীর মোশাব্রফ্ হোসেনের বাড়ি, সোনা কোথায় নেই। পবের দিন সকালে উঠে দেখি কাগজে আমার নাম উঠে গেছে।

শিলাইদহ ঃ আজ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ যাবো। সকাল সকাল তৈবি হয়ে বেবিয়ে পড়লাম। কুষ্টিযার পাশটি দিয়ে বয়ে গেছে গোবাইনদী। সেই গোরাই নদী পার হয়ে যেতে হবে শিলাইদহ। নিশ্চযই বুট্ভুটিযা, নিদেন দেশি নৌকো আছে খেয়াঘাটে। পার করে দেবে আমাকে। পাযে পাযে কঁপা যেতেই এসে পড়লাম গোরাই

নদীব ধারে। ধারে এসে তো দেখি অবাক কাণ্ড। নদীব খালটা পড়ে আছে। প্রবাহিনী নদীটা গেলো কোথায়।

এই গোবাই পাব হতে খেয়া নৌকো লাগে না। ব্রজসুন্দবী শ্রীরাধেরও প্রয়োজন নেই। আপন চবণ-যুগলকে সাব কবে অনায়াসে পবপাবে যাওয়া যায়। তাই এলাম। গোবাই-এর বুকে ধূ ধূ কবছে বালিব চবা। তাব ওপব দিয়ে পায়ে চলাব পথ। সেই পথে হেঁটে পাব হয়ে এলাম।

অথচ গোবাই নদী কিছু হেলাফেলাব নদী নয়। নীহাববঞ্জন বায প্রণীত 'বাঙালীর ইতিহাস'-এ দেখি, দশম-একাদশ শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র তাঁর ইদিলপুব পট্টোলী দ্বাবা কুমাবতালক মণ্ডলে একখণ্ডভূমি দান করেছিলেন। কুমাবতালক কুমার নদীর কথা স্মবণ কবিয়ে দেয। এই কুমাব নদী পদ্মাব শাখা নদী মাথাভাঙ্গা থেকে বাব হয়ে বিভিন্ন অংশে গোবাই, মধুমতী, শিলা(ই) দহ এবং বালেশ্বব নাম নিয়ে হবিণঘাটায গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে।

গোবাই-গর্ভ থেকে উঠেই অশত্থতলা। রিকসাভ্যানেব স্ট্যান্ড। গিয়ে চড়ে বসলাম সামনেব ভ্যানটিতে। কিন্তু মুশকিল বাধলো। পাঁচ জন যাত্রী না পেলে ভ্যান ছাড়বেনা ভ্যানঅলা। এদিকে বেলা যে বেড়ে যায। কী আব কবি পাচজন যাত্রীর অপেক্ষায অশত্থগাছেব ছায়ায বসে থাকা ছাড়া।

বেশ খানিক বসাব পব সহযাত্রী জুটলো। এক নতুন বব, সঙ্গে নবোঢ়া বউ। আবো দুজন। শালী-টালী হবে হযতো। শ্বশুব বাড়ি থেকে বউ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। বউটির হাতের তালুতে মেহেদিব নক্সা। শাঁখার বদলে কাঁচ ও প্লাস্টিকের চুবি। সিঁদুর-বিহীন সাদা সিঁথি। কিন্তু ঘোমটা বা বোবখায মুখ ঢাকা নয। মুসলমান মেয়েবাও আজকাল কতো আধুনিক হয়ে উঠেছে। দেখে ভালো লাগছে।

আমাদেব ভ্যান চলেছে গাঁয়েব পাশ কাটানো রাস্তা ধরে। রাস্তাব পাশে ফসলের জমি। অনেক জমি খালি পড়ে আছে। কোন কোন জমিতে অবশ্য তিল ও কলাই-এব চাষ হয়েছে। গাঁযের বাড়িতে বাড়িতে সুপুবি নাবকেল কলাগাছ। এইসব দেখতে দেখতে মিনিট চল্লিশের মধ্যেই এসে পৌঁছালাম শিলাইদহে।

শিলাইদহ স্থানটিব নাম কি শিলা(ই) দহ নদীব নাম থেকে এসেছে। নীহাররঞ্জন বাযের 'বাঙালীব ইতিহাস' এ দেখছি, "তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুবাতন বলিয়াই মনে হয়। ফরিদপুবে প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যেব একটি পট্টোলীতে শিলাকুণ্ড নামে একটি জলাশয়ের উল্লেখ আছে। শিলাকুণ্ড ও শিলা(ই) দহ একই নাম হইতে পারে। দুয়ের অর্থ প্রায় এক।"

এই শিলাইদহে ছিলো মহর্ষির জমিদাবি। ১২৯৬ সালেব অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথ জমিদাবি পবিদর্শনের অধিকার পান এবং "১১ই অগ্রহায়ণ (সোম 25 November) রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবী, তাঁর একজন সহচবী—বেলা ও রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে শিলাইদহ

যাত্রা করেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হন।" (রবিজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ ১২৭— প্রশান্তকুমার পাল) "অল্পবয়সে মহর্ষি বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ কযেকবার শিলাইদহে গেলেও পরিণত বয়সে জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন বলেন্দ্রনাথ সহ সপরিবারে বর্তমান বৎসরে (১২৯৬) ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে; শিলাইদহে গিযে রবীন্দ্রনাথ একটি বোটে বাস করতে থাকেন। (ববিজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ—১২৭)

এব আগেই পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব পবিচয হযেছে। তবু শিলাইদহেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো। ইন্দিরাদেবীকে লেখা চিঠিতে তিনি শিলাইদহেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "শিলাইদহেব অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদেব বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চব—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায না—পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয। এই যে ছোট নদীব ধাবে শান্তিময গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং অনন্ত ধূসব নির্জন নিঃশব্দ চবেব উপবে প্রতি বাতে শত সহস্র নক্ষত্রেব নিঃশব্দ অভ্যুদয হচ্ছে, জগৎ সংসাবে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায। (ববিজীবনী, ৩য খণ্ড পৃ—১২৭-২৮, প্রশান্তকুমার পাল)

ববীন্দ্রনাথ দ্বিতীয বাব শিলাইদহ গিয়েছিলেন 2 June ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে। এবাবও তিনি বোটে আশ্রয নিযেছিলেন। 3 June (মঙ্গলবাব ২১শে জ্যৈষ্ঠ) প্রমথ চৌধুরীক লিখলেন, "আমি বোধ হচ্ছে এখেনে কিছুকাল থেকে যাব। একটা কিছু লিখতে চেষ্টা কবা যাবে।" (ববিজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ-১৩৯ প্রশান্তকুমার পাল)

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পবিদর্শনের কাজ নিয়ে বাববাব শিলাইদহে এবং সাজাদপুরেব কুঠিতে এসেছেন। তখন তিনি যে কেবলমাত্র পল্লীপ্রকৃতিব সংস্পর্শে এসেছেন তা নয। এই সময় বাংলার প্রকৃতির সন্তান দরিদ্র মানুষগুলিব সঙ্গেও তিনি পবিচিত হযেছেন। এই প্রসঙ্গে রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড ২৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা, থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি মূল্যবান।

"জমিদারী কার্যোপলক্ষে নদীমাতৃক গ্রামবাংলায় দীর্ঘদিন অবস্থান রবীন্দ্রনাথেব মনে যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিনব বসসৃষ্টির উদ্বোধন ঘটিয়েছে , তেমনি বাংলার দবিদ্র সাধারণ মানুষেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ পবিচয়েব সুযোগ করে দিয়েছে। ইন্দিবাদেবীকে 11 May (২৯ বৈশাখ)-র চিঠিতে লিখেছেন, 'এক-একসময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এইমাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে কবে আমার কাছে এসেছিল—সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদযখানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিযে গেল।' এর আগেব দিনেব চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ 'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই।'

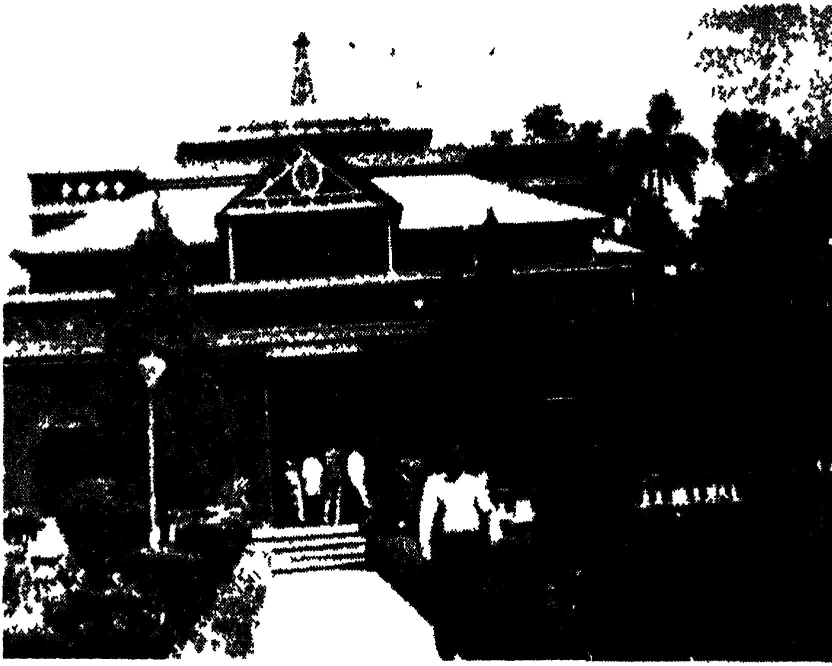
সোশ্যালিস্টরা সমস্ত মানুষের মধ্যে ধনবণ্টন করে দিতে চায়, আবার অনেকে বলেন জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় ন্যূনতম সামগ্রীও সকলের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সমস্যাটি সত্যই কঠিন ঃ 'বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর একদিক ঢাকতে গিয়ে আর একদিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায়, এবং ধন গেলে সমাজের কত-যে শ্রীসৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।' এই সমস্যা সমাধানের জন্য জমিদার হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব, ততটুকু অবশ্য তিনি করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থেই "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" ছিলেন। কখনো স্থির থাকতে থাকতে পারেন নি কোন স্থানে। তবে তাঁর কাছে প্রিয় ছিলো নিভৃত নির্জন আলয় যেখানে তিনি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর সত্যকে, তাঁর জীবন-দেবতাকে। তাঁর এই সাধনার অনেক সময় বিঘ্ন ঘটিয়েছেন অনেক অনভিপ্রেত অতিথি এসে। আবার জগদীশ চন্দ্রের মতো অভীষ্ট অতিথি এসে অনেক অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। "জগদীশ চন্দ্র লিখেছেন ঃ আপনার চিঠি ও পুস্তক পাইলাম। সেই লেখাটা ইতিমধ্যেই পড়িয়াছি, ... আপনার লেখাতে অনেক বিজ্ঞান-সম্মত মত দেখিলাম— Sympathetic Vibration কত দূর পাঠান যাইতে পারে তাহা বলা যায় না। এতদিন জড় জগতে এই নিয়ম আবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার নতুন কার্যো জানিতেছি যে চেতন ও অচেতনের মধ্যে রেখা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। আমার নিকট অনেকবার শুনিয়া থাকিবেন যে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবির্ভূত হন নাই। কারণ যতদিন একাধারে উক্ত দুই জ্ঞানের সমাবেশ না হইবে ততদিন উভয়ই অসম্পূর্ণ থাকিবে। তবে কবির জ্ঞান যতই সীমাহীন হইবে, যতই বিস্তারিত হইবে, কবিত্ব ততই অনন্তকালের হইবে।" (রবিজীবনী, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ২৬৭, প্রশান্তকুমার পাল)

জ্ঞানের যে উচ্চ স্তরে আরোহণ করতে পারলে দৃঢ় প্রত্যয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় আমার খর্ব দৃষ্টিটুকু সেই স্তরে উঠতে পারে না। তবু বিনয়ের সঙ্গে বলি, আমার ধারণা 'জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক' আবির্ভূত হয়েছেন, এবং হয়েছেন আমাদের এই বঙ্গভূমিতে। আর কবিগুরুর কবিত্ব নিঃসন্দেহে অনন্তকালের।

বিকসাভ্যান থেকে নেমে বাঁদিকে রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে প্রবেশ করলাম। রাস্তা থেকে খানিক নীচুতে নামতে হয়। বাঁপাশে বিস্তৃত আমবাগান। এখন মোট বাইশটি আমগাছ রয়েছে বাগানে। কুঠিবাড়ির জনৈক কর্মচারীর মুখে শুনলাম, এই আমবাগান থেকেই কবি দুই বিঘা জমি'র প্রেরণা সংগ্রহ করেছিলেন। হবেও বা। আরও এগিয়ে বার-বাড়িতে এলাম। সেখানে আট-দশখানি বাস দাঁড়িয়ে। বাসগুলি এসেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করাচ্ছেন বিশ্বকবির অনন্তকালের অক্ষয় সম্পদের সঙ্গে।

বার-বাড়ি পার হয়ে গেলাম পাঁচিল-ঘেরা কুঠি-বাড়ির প্রাঙ্গণে। কিন্তু প্রাঙ্গণে প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি ছোট্টঘর। এই ঘরদুটিতে এক সময় থাকতো দ্বার-রক্ষীরা। এখন দ্বার-রক্ষী নেই। কিন্তু পাশেই আছে টিকিট ঘর। আগে দারোয়ানদের হাতে টাকাটা-সিকেটা



শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি

গুঁজে দিলে চলতো। এখন টিকিটবাবুকে পুরো দুটি টাকা গুনে দিলে কুঠিবাড়ি প্রবেশের টিকিট মেলে।

কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকতেই এগিয়ে এলেন আবদুল আজীদ। আজীদের বাড়ি এই শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা গ্রামে। কাজ করেন কুঠিবাড়ির বাগানে। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দাও এই কুঠিবাড়ির বাগানেই কাজ করতেন। তাঁদের কাছে আজীদ কবির কথা অনেক শুনেছেন। নিজে অবশ্য কবিকে দেখেন নি। তবে দীর্ঘদিন ধরে কুঠিবাড়ির কাজে আছেন বলে এই বাড়ির অনেক কিছুই জানা তাঁর। সেই জন্যেই কোন দর্শক এলে তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখাতে ভালো লাগে। সৌভাগ্যক্রমে আমিও তাঁকে প্রদর্শকরূপে পেয়ে গেলাম।

আজীদ বললেন, এই কুঠিবাড়ির জমির পরিমাণ বত্রিশ বিঘা। এখানে অবশ্য বিঘা হয় তেত্রিশ শতকে। দেউড়ি দিয়ে ঢুকেই ডানপাশে বৈঠকখানা। আগে এখানে খড়ের চার-চালা খুব বড়ো একখানা ঘর ছিলো। এখন চাতাল আছে। সেই খড়োঘরটি নেই। এই চাতালে বসে কবি-জমিদার তাঁর প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতেন।' কখনো অত্যাচারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ, কখনো-বা উদ্ধত প্রজার বিরুদ্ধে

কর্মচারীদের অভিযোগ, এইসব শোনা ও মীমাংসা করা ছিল তাঁর প্রধান কাজ।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড পৃ ২২৯-৩০, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়)।



কুষ্টিয়া (শিলাইদহ)— এই চত্বরে রবীন্দ্রনাথ রায়তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন।

কোথায় কোন পত্রিকায় যেন পড়েছি, এক প্রবীণ প্রজা এসে নালিশ জানালেন কবির কাছে। কথাবার্তা চলাকালীন প্রজাটি বলেছিলেন, হুজুর' ওরা (নায়েব-গোমস্তারা) গোঁফদাড়ি। চেঁচে ফেললেই সম্পর্ক শেষ ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমরা (প্রজারা) আপনার বুকের লোম। আপনার বুকেই থেকে যাই চিরকাল। প্রবীণ সেই প্রজার এই মন্তব্যটি খুব ভালো লেগেছিলো রবীন্দ্রনাথের।

আজীদকে বললাম, ভাই। বাড়ির মধ্যে যাওয়ার আগে বাড়ির চারিপাশটা দেখে নিলে হোতো না। আজীদ বললেন, বেশ তো। তাই হোক। আজীদের সঙ্গে বাড়ির ডানপাশের ফুলবাগান দিয়ে পিছনে এলাম। পিছনে লন্-টেনিসের কোর্ট। আজীদ বললেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে এলে ইংরেজ সাহেবদের অনেকে এখানে আসতেন। তাঁরা কবির মেহমান হয়ে থাকতেন। এই সময় তাঁরা কবির সঙ্গে এই কোর্টে টেনিসও খেলতেন।

বাড়ির পিছন দিকে দোতলায় ওঠার এক পাকানো সিঁড়ি। জমাদাররা এই সিঁড়ি বেয়ে যেতো দোতালাব টয়লেটে। পরিষ্কার করে দিয়ে আসতো।



শিলাইদহ — কুঠিবাড়ির পাকশালা

বাড়ির পশিমে পাকঘব। পাকঘব পার হলে বাড়ির পশ্চিমদিকে বাইরে যাবার পথ। সেই পথে বাড়ি থেকে বার হলেই বকুলবাগান। তার পশ্চিমে বিশাল দীঘি। দীঘির বাঁধানো ঘাট, বকুলগাছেব ছায়ায ঢাকা। কবি এই ঘাটেব হাতায় বকুলেব ছায়ায় এসে বসতেন কখনো কখনো। ছোট্ট একটা নৌকো ভাসতো দীঘির জলে। কখনো কখনো সেই নৌকো বাইতেন দীঘিব জলে। নৌকোটা আজও রয়েছে কুঠিবাড়িব দোতলাব বারান্দায়।

এলাম মূল কুঠিবাড়িতে। ঢুকেই একতলার ১নং ঘর। সেই ঘরে রয়েছে জল রাখার মাটির পাত্র। অন্য পাশে লোহার সিন্দুক, ঘাস কাটার লন্-বোলার। দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটি আলোক চিত্র—চিন্তামগ্ন রবীন্দ্রনাথ, ছবি-অঙ্কনরত রবীন্দ্র, সিঙ্গাপুর যাবার প্রাক্কালে শুভার্থীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, জাপানে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে পরিজনদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ, মৈমনসিং স্কুলে পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অবসর মুহূর্তে ববীন্দ্রনাথ।



শিলাইদহ কঠিবাড়িব পাশে দীঘিব ঘাট

এলাম ১নং ঘবে। এই ঘবেব মেঝেয বযেছে কযেকটি আলমাবি ও বেঞ্চ। আব দেওযালে টাঙানো বযেছে বিশ্বকবিব বিশাল একটি পূর্ণাবযব আলোকচিত্র এবং আব একখানা অঙ্কিত চিত্র।

৩নং ঘবে কবিব নিজেব আবা অনেকগুলি ছবি সাবা দেওযালে টাঙানো। মেঝেব মাঝখানে বিশাল টেবিল একখানা। তাব চাবিপাশে চেযাব। পাশে বই এব তাক একটা। দেওযাল ঘেঁষে একটা হাতলঅলা বেঞ্চি পাতা।

৪নং ঘবে বযেছে দুটো পালকী। একটা ছোট। তাব নাম হাত পালকী। আব বড়োটা আট বেহাবা পালকী।

দোতলায উঠে এলাম ৫নং ঘবে। এই ঘবেব দেওযালে টাঙানো আছে ববীন্দ্রনাথেব বিভিন্ন বযেসেব আলোকচিত্র। আমবা সাধাবণতঃ ববীন্দ্রনাথেব বৃদ্ধ বযেসেব ছবিব সঙ্গে পবিচিত। এই ঘবে তাঁব বাবো বছব বযেসেব, চোদ্দবছব বযেসেব, আঠাবো বছব বযেসেব এবং যুবা ববীন্দ্রনাথেব আলোক চিত্র দেখে বোঝা যায বালক-কিশোব যুবক ববীন্দ্রনাথ কতো দর্শনধাবি ছিলেন।

৬নং ঘরে রয়েছে বেশ কয়েকখানি বিবল আলোক চিত্র। একটি আলোক চিত্রে তৎকালীন বিখ্যাত লেখকদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ। অন্য একখানি ছবিতে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় মহাজাতিসদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন। পাশে সুভাষ চন্দ্র। আর একখানি ছবিতে রবীন্দ্রনাথ হিন্দিভবনের উদ্বোধন করছেন। পাশে মহাত্মাগান্ধী ও সবোজিনী নাইডুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব ছবি এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব আর একখানি ছবি দেওয়ালে টাঙানো রযেছে।

৭নং ঘরে এসে দেখি, মেঝের ওপব সোফা ও গদি আঁটা চেযার পাতা। মেঝেব এক পাশে ডিম্বাকার একটা পড়াব টেবিল। দেওযাল জুড়ে ছবি টাঙানো—দুই কন্যাব, পুত্রেব ও পুত্রবধূব। আব বযেছে রবীন্দ্রনাথেব হস্তলিপিব একটি আলোক চিত্র। তাতে লেখা—

"এসেছিলে তবু আস নাই, তাই
জানাযে গেলে
সুমুখের পথে পলাতক পদ-পতন ফেলে।"

দেওয়ালে আব একখানি ছবিতে বযেছে স্যাব পি সি বায ও ববীন্দ্রনাথ। আর বিভিন্ন খববের কাগজ থেকে নেওয়া বিশ্ব কবির নোবেল পুবস্কাব গ্রহণেব ছবি।

৮নং ঘরের দেওয়ালেও অনেকগুলি আলোক চিত্র টাঙানো বয়েছে। তাব মধ্যে একটি ছবিতে বিসর্জন নাটকে বঘুপতিব ভূমিকায ববীন্দ্রনাথ। অন্য একটিতে তাঁর দুই কন্যা। অন্য আর একটিতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায ও সি অফ এন্ডরুজেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ।

৯নং ঘবটি কবিব শয়নকক্ষ ছিলো। খাট, আলনা, টিপয়, আলমবি যথাবীতি সাজানো রয়েছে এই ঘরে।

দোতলার পূর্ব ও দক্ষিণদিকে লম্বা ঝুল বারান্দা। উত্তরদিকে শৌচাগাব। তিনতলায উঠলাম কাঠের সিঁড়ি বেযে। তিনতলাব চাবিদিকেই বারান্দা। মাঝে ঘব। সেই ঘবে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে অবস্থানের সমযকার কবিব শেষ জীবনেব ছবি। বোগশয্যাব ছবি রয়েছে। আর রয়েছে কবির মৃতদেহের ছবি।

তিনতলা থেকে নেমে এলাম কুঠিবাড়িব উদ্যানে। আজীদকে বললাম, ভাই আজীদ! কবি অনেক সময পদ্মার ওপর বোটে বাস করতেন। পদ্মার ওপব বোটে বসে কতো কবিতাই না বচনা কবেছেন। সেই বোট যদি নাও থাকে পদ্মা তো আছে। আমি সেই পদ্মাকে একবার দেখতে যাবো।

আজীদ কপালে হাত বেখে বললে, হায হায়! কীর্তিনাশা পদ্মায আজ পানি নেই। পানি-হীন পদ্মাকে দেখে আপনার চোখে পানি আসবে।

তবু গেলাম পদ্মানদীর তীরে। কাছেই, হেঁটে মিনিট কুড়ির পথ। গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। আজীদের কথাই ঠিক, দুইপাশে দুটি শীর্ণধারা। মাঝখানে বিস্তৃত চর। চরের বিস্তার এতোই বেশি যে ওধারের ধারাটি নজরে আসে না। সেই কথায় আছে না, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর। পদ্মার অবস্থাও তাই।

এই সেই রাক্ষসী পদ্মা, কীর্তিনাশা পদ্মা। পদ্মার যে উত্তাল ঢেউ ও প্রবল স্রোত গ্রামকে গ্রাম গ্রাস করে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয় মানুষেব হাজাব বছর ধরে গড়ে তোলা কত গ্রাম



শিলাইদহ -- পদ্মাব ক্ষীণ ধাবা

কতো শহব, সেই পদ্মার আজ এই দশা। সেই যে আজীদ বললো, হায হায! পদ্মায় পানি নেই। তাই দেখে আপনাব চোখে পানি আসবে। আমি যে কীর্তন গাইতে পারি না। নাহলে বৈষ্ণব পদকর্তাব পদকে সামান্য পরিবর্তন কবে নিয়ে গাইতাম,

পদ্মার বুকে যতো পানি ছিলো
আমাব নয়নে নিয়েছে ঠাঁই।

লাহিনীপাড়া ঃ বিকেলে কুষ্টিয়া রেল ইস্টিশানের পাশে বসে চা খাচ্ছি আর আলাপ চলছে দোকানদাবেব সঙ্গে। আমার কথাবার্তা শুনে দোকানদার বললেন, তা এতোই যখন দেখে বেড়াতিছ্যান তখন 'বিষাদসিন্ধু'-ব কবি মীর মোশার্‌রফ্ হোসেন সাহেবের ভিটেখানি দেখা আর বাকি রাখেন কেন। দোকানদাবেব কাছে পথেব ঠিকানা নিয়ে রিকসায চড়ে বসলাম। এতো কাছে 'বিষাদসিন্ধু'ব কবিব জন্মস্থান। আব আমি কিনা সেই জন্মস্থান না দেখে তাঁর বাড়ির দরজা থেকে ফিরে যাবো!

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রিকসাঅলা আমাকে নিয়ে এলো লাহিনীপাড়া। লানিহীপাড়া ছোট্ট একখানি গ্রাম। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত চাপড়া ইউনিয়নের একখানি গ্রাম। বড়ো রাস্তা থেকে বাঁদিকে সরু রাস্তাটা ঢুকে গেছে লাহিনীপাড়ায়। সেই রাস্তা ধরে গ্রামের মধ্যে খানিক এগিয়ে গেলেই মীর মোশার্‌রফ্ হোসেন সাহেবের ভিটে।

লাহিনীপাড়া বাংলার সেই চিরপরিচিত গ্রাম। গ্রামের পথেব দু'পাশে সেই পরিচিত গাছ—জিওল, হিজল, সুপুরি, নারকেল, মাঝে মাঝে শিবীষ, অশত্থ, বট। দুপাশে ডোবার ধারে বাঁশবন।

রিকসাঅলা আমাকে নিয়ে এসে থামলো মীর মোশার্‌রফ্ হোসেন সাহেবের ভিটের সামনে। রিকসা থেকে নামতেই সম্মুখে চায়ের দোকান। তার সামনে লোক বসাব জন্যে বাঁশের মাচান। চায়ের দোকানদার বললে, মোশার্‌রফ্ সাহেবের ভিটেটুকু ছাড়া এখানে দেখার মতো আব কিছু নেই।

সেই ভিটেতেই নেমে গেলাম রাস্তা থেকে। ভিটেব মাঝখান দিয়ে পায়ে চলাব পথ। ডানপাশে নতুন বনানো অনেকগুলো থাম। থামগুলো সিমেন্ট বালি ইটেব, চৌকোণা। থামগুলোর চারপাশে 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে নেওয়া কবিতার অনুচ্ছেদ লেখা। কবিব স্মৃতি রক্ষার জন্যে আব কিছুই কবা হয়নি।

কবির ভিটের দক্ষিণ অংশে আছে একটা ইস্কুল। প্রাথমিক স্তব থেকে ইস্কুলটিকে মাধ্যমিক স্তরে তোলার চেষ্টা চলছে। ইস্কুলে ছুটি হযে গেছে। তাই নিঃশব্দ চারদিক। আব এক পাশে একটা ছোট লাইব্রেরি। খোঁজ করে সেখানে গিয়ে হাজিব হলাম। গিযে দেখি, নতুন বানানো ছোট একটি ঘবে দুটি বই ভরা আলমাবি। মেঝেব মাঝে একখানি টেবিল। তার চারপাশে বেঞ্চি। বেঞ্চিতে বসে আলাপ করছে জনপাচেক যুবক।

কলকাতা থেকে এসেছি শুনে যুবকেবা সাদবে বসালেন আমাকে। তারপব আমাব প্রশ্নের উত্তরে জানালেন কবি মীর মোশাররফ্ হোসেন সাহেবেব স্মৃতি রক্ষার্থে বলতে গেলে, কোন কিছুই কবা হয নি। তাঁবা জনকযেক আধা-বেকাব যুবক সেই লাইব্রেরি খানি কষ্টেসৃষ্টে গড়ে তুলেছেন। লাইব্রেরিতে মীর মোশাব্‌বফ্ হোসেন সাহেবের বই, আব তাঁব ওপর অন্যেব লেখা বইগুলি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

জানতে চাইলাম, মীব মোশাবরফ্ হোসেন কতোগুলো বই বচনা কবেছিলেন। ওঁবা জানালেন, তাঁর লিখিত বই-এর সংখ্যা মোট বিয়াল্লিশখানি। সেই বইগুলিব মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বিষাদ সিন্ধু।

জিজ্ঞাসা কবলাম, মীর মোশার্‌রফ্ হোসেন সাহেবেব সময়কাব কোন স্মৃতিই কি নেই তাঁর ভিটেয। একজন যুবক বললেন, না-থাকার মতোই আছে। ঐ যে দেখছেন বিশাল আমগাছটি, আমরা শুনেছি, ঐ গাছটি তাঁর নিজের হাতে লাগানো। গাছটির দিকে চেযে দেখি, একগাছ আম ফলে আছে। কে জানে, মোশার্‌রফ্ সাহবের বিদেহী আত্মা ফলন্ত আমগাছটির পানে স্নেহের চোখে চেয়ে দেখেন কিনা।

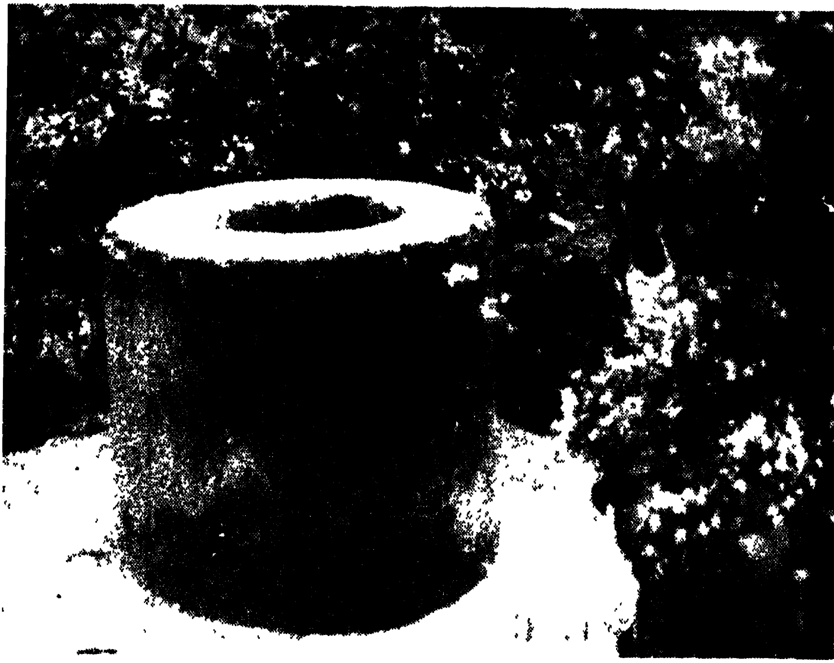


কুষ্টিযা — বিষাদসিন্ধুব লেখক মীব মোশাব্বফ হোসেনেব ভিটায় লেখকেব স্বহস্তে বোপতি আমগাছ

আব একজন যুবক বললেন, আর ঐযে দেখছেন কুয়ো! ঐ কুয়োর জল তিনি ব্যবহাব কবতেন। আব রাস্তার ওপাশে বয়েছে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীব সমাধি। ওঁরা মোশার্‌রফ্ সাহেবর দ্বিতীয়া স্ত্রী নাম বলতে পারলেন না। কুয়োটি দেখে গেলাম সেই সমাধি দেখতে। চারিদিকে বাঁশবন আব অযত্নে বেড়ে ওঠা নানা আগাছা। সেই বেহেস্ত বাসিনী নাবীকে প্রণাম জানালাম। একসময় তিনি মোশাব্বফ্ সাহেবকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছেন।

কবিব জন্ম হয়েছিলো ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর এবং মৃত্যু হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দেব ১৯শে ডিসেম্বর। কিন্তু মৃত্যু হয়েছিলো অনেক দূরের কোন গ্রামে। তাই লাহিনীপাড়ায় মোসাররফ্ সাহেবের সমাধি নেই।

যুবকেরা বললেন, সে যুগের তুলনায মোটামুটি দীর্ঘজীবনই লাভ করেছিলেন তিনি। ওঁরা আরও বললেন, না ! তাঁব কোন উত্তরাধিকারী ছিলেন না। আর ধন সম্পদ । না, বাড়িঘর ধনসম্পদ ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি ছিলো না তাঁব। মাটির বাড়িঘর মিশে গেছে মাটির সঙ্গেই। তাই পার্থিব স্মৃতি বলতে তাঁর লেখা বইগুলি ছাড়া আর কিছু নেই।



কুষ্টিয়া   মীর মোশার্‌রফ্‌ হোসেন ভিটায় তাঁর সময়ের কূপ

তাঁরা ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, কবির স্মৃতি রক্ষার জন্যে কি সরকার, কী সাহিত্য একাডেমি, কি জনসাধারণ কেউ-ই এগিয়ে আসেননি এখনো পর্যন্ত। আমরা ক'জন স্থানীয় যুবক তাও বেকার আমরা, আমরা চেষ্টা করছি মাত্র। আপনি কি এই ব্যাপারে লিখবেন একটু!

ওঁদের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনে হাসলাম নিজের মনে। বললাম, ভাই! যদি লিখতে সক্ষম হই, বই একখানা হয়তো বার হবে। কিন্তু কে পড়বে সে বই। আর বইটির সঙ্গে কে-ই বা পাঠক-পাঠিকাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। তাই মোশার্‌রফ্‌ সাহেবের প্রতি অবহেলার কথা কতোজন আর আমার বই পড়ে জানতে পারবে! তবু আমার সাধ্য মতো লিখবো। তোমাদের আকুলতা আমার মনে থাকবে।

আজ লালন শাহ্‌-এর স্মরণোৎসবের দ্বিতীয় ও শেষ দিন। আজ তাঁর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন। লাহিনীপাড়া থেকে ফিরে তাই সোজা গেলাম লালন শাহ্‌-এর মাজারে। সন্ধে পার হয়ে রাত তখন এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।



কুষ্টিয়া   মীব মোশাবব্ফ হোসেনেব দ্বিতীয়া পত্নীব মাজাব

উদ্যোক্তাদেব সাদব আহ্বানে মঞ্চেব ওপবেই গিয়ে বসলাম। উৎসব তখন শুরু হতে চলেছে মঞ্চ আলো কবে বসে আছেন লালন একাডেমিব বাউল সংগঠনেব গায়ক-গায়িকাগণ। লালন একাডেমিব সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ বেজাউল হক সাহেব মাইকে ঘোষণা কবে বললেন, এখন লালন স্মবণোৎসবেব দ্বিতীয় দিনেব অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে।

অমনি কোথা থেকে, যেন আকাশ ফুঁড়ে এসে পড়লো কালবৈশাখী উদ্দাম গতিতে। প্রায় একই গতিতে কালবৈশাখীব ঝড়কে অনুসবণ কবে এলো শিলাবৃষ্টি। মঞ্চেব সম্মুখে টাঙানো বিশাল সামিয়ানাখানা সেই ঝড়েব দাপটে বাঁধন ছেঁড়া, পাগলপাবা উড়তে চাইলো আকাশে। কিন্তু পাশেব গাছগুলিব শাখায় জড়িয়ে পথ হাবালো।

সেই উথাল-পাথাল ঝড়-বৃষ্টিতে শ্রোতাবাও দিশেহাবা। পঁচিশহাজাব শ্রোতা তাঁদেব মাথা বাঁচাতে মঞ্চে উঠতে চান। সেই চাপে কচ্‌বা-চিপা হবাব যোগাড় মঞ্চেব গায়ক-গায়িকাবা। হঠাৎ একটা চিৎকাব ভেসে এলো মঞ্চেব ওধাব থেকে। লালন একাডেমিব

সহ-সম্পাদক মোহম্মদ তাইজাল আলী খানের কণ্ঠস্বব। বললে, মঞ্চে গৌরীশদা আছেন। তাঁকে প্রটেক্‌শান দাও। মুহূর্তের মধ্যে তিনচারটি যুবক আমার চারিপাশে এসে হাজির। এতো লোকের ভিড় ঠেলে কী করে যে তাঁরা আমার কাছ এলেন তা ভাববার সময় নেই। তাঁরা আমাকে তাঁদের মাঝে নিয়ে পিঠ দিয়ে ঠেকালো জনতার ঠেলা।

আমি ততোটা বৃদ্ধও নই ; দুর্বলও নই। তাই এই ভিড়ের চাপ সহ্য করা খুব কষ্টকর হোতো না আমার পক্ষে।

কিন্তু আমার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের নিয়ে এলো আমার কাছে, ভিড়ের চাপ থেকে আগলে রাখলো আমাকে, তাই দেখে অভিভূত হলাম। তাঁদের প্রতি এমনি একটা স্নেহ-ভালোবাসা এসে আমার মধ্যে জাগিয়ে তুললো কৃতজ্ঞতা যে আমার গলা এলো রুদ্ধ হয়ে। তাদের সামান্য একটু ধন্যবাদ জানাবো, গলা দিয়ে একটি কথাও বার হোলো না।

বৃষ্টি ছাড়লে লালন শাহ-এর মাজার থেকে বেড়িয়ে এলাম রাস্তায়। একটা রিকসা করে সোজা হোটেলে এলাম।

রাত্রি প্রভাত হলে আমি কুষ্টিয়ার বাস স্ট্যান্ডে এসে বাস ধরলাম। বাস ছেড়ে দিলো যথাসময়ে। আমি সাধক লালন শাহ্‌-এর কুষ্টিয়া, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কুষ্টিয়া, বরণীয় সাহিত্যিক মীর মোসার্‌রফ্‌ সাহেবের কুষ্টিয়া ছেড়ে এলাম। এবার আমার পথ নাটোরের দিকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলার প্রথম দুর্গোৎসব

(নাটোর-দিঘাপাতিয়া-তাহেরপুর)

'রাতের সব তারাই আছে
দিনের আলোর গভীরে।''

তাহেরপুরে কংসনারায়ণের রাজপ্রসাদে ও দুর্গামণ্ডপ দেখতে যাবো মনে হতেই মনে এলো উপরের লাইন দুটো। এককালের গৌড় ও পরবর্তীকালের মুর্শিদাবাদ ধনে জনে, উৎসবে ব্যসনে, জাঁকজমকে মধ্যাহ্ন গগন-স্থিত সূর্যের মতো প্রখর ছিলো। আরও পরে গড়ে-ওঠা কলকাতার কাছে আজ তারা অবলুপ্ত ও ম্রিয়মান। তবু যদি গৌড় ও মুর্শিদাবাদকে জানতে চাই, জানা শুরু করতে হবে কলকাতাকে জানা থেকে। বর্তমানের আলোকেই আলোকিত করতে হয় বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া অতীতকে।

নাটোর ও দিঘাপাতিয়া ছিলো না যখন কংসনারায়ণের তাহেরপুর ধনে জনে, উৎসবে পার্বণে ছিলো মুখরিত। ধীরে ধীরে কালের করাল গ্রাসে তাহেরপুরের গৌরব হয়েছে অস্তমিত। ওদিকে তাহেরপুরের কাছেই তার গৌরবের ধারক ও বাহকরূপে উদয় হয়েছে নাটোরের, দিঘাপাতিয়ার।

কুষ্টিয়ায় বসে এইসব কথা মনে হতেই স্থির করলাম, নাটোর ও দিঘাপাতিয়া হয়ে তবে যাবো তাহেরপুর। তাহেরপুরকে তবেই জানা সার্থক হবে।

নাটোর

কুষ্টিয়ায় বাসস্ট্যান্ডে এসে রাজসাহীগামী বাসে উঠলাম। খানিক হাঁক-ডাকের পর কন্ডাকটর বাসছাড়ার ঘন্টি দিলো এবং বাসও দৌড়াতে শুরু করলো। বাস চলেছে মাঠের ওপর দিয়ে। রাস্তার দুপাশে গাছ, মাঠে নতুন লাগানো খরার ধান, তার ওপারে দূরে দূরে আকাশের কোলে গ্রামের নীলরেখা। আমার সেই আবাল্য পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। দৃশ্য পরিচিত, কিন্তু বাংলার পথে পথে সেই পরিচিত দৃশ্য বারবার দেখেও পুরোনো হয় না, একঘেয়ে বোধ হয় না, রোজ সকালের সূর্যোদয় যেমন পুরোনো হয়না, সে দৃশ্য চির নূতন।

ছোটখাটো কী একটা শহরে এসে বাস থামলো। আজকাল তো সবই শহর, গ্রাম আর থাকছে কোথায়। ওপর দিয়ে কি পাশ দিয়ে বাস একবার গেলেই হয়। শান্ত গ্রামখানি এক ডিগবাজি মেরে হয়ে যায় শহর বাসের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, দোকানের বড়ো একটা সাইন-বোর্ডে লেখা 'ভেড়ামারা'। এ আবার কী নাম রে বাবা। বাংলাদেশে নদনদী, খালবিল, গ্রাম শহরগুলির নাম কতো সুন্দর, কতো শ্রুতিমধুর। সেইসব মধুর নামের সঙ্গে ভেড়ামারা

নামটা যেন খাপছাড়া ঠেকলো কানে। জানি না, কতোগুলো ভেড়া মারা পড়লে তবে কোন গ্রাম বা শহরের নাম ভেড়ামারা হতে পারে।

তবে নামটা বিদ্‌ঘুটে হলেও ভেড়ামারা নামক স্থানটি তাচ্ছিল্যের নয় মোটেই। পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থে ভেড়ামারার পবিচয় দিতে বলা হয়েছে "ভেড়ামারা জংশন—কলিকাতা হইতে ১১৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এখানে 'সর্ব্বানন্দ মঠ' নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠের সংলগ্ন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।" কিন্তু ১৯৪০ সালের সেই ভেড়ামাবা নামকস্থান 'বর্ধিষ্ণুপল্লী' হয়ে বসে নেই। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যুৎ-উন্নযনের অফিস, সব মিলিযে ভেড়ামারা এখন বীতিমতো শহব।

ভেড়ামাবা পার হতেই হার্ডিঞ্জ-ব্রিজ। আবার উপরিউক্ত 'বাংলায় ভ্রমণ' গ্রন্থেব শবণ নেওয়া যাক। "এই সেতু ১৯০৯ সালে আরম্ভ হইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং-এর নাম অনুসারে ইহার নাম হয হার্ডিং সেতু। ইহা পৃথিবীর দীর্ঘ রেলওয়ে সেতুগলির অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৯০০ ফুট। পদ্মানদী প্রায়ই গতিপথ পবিবর্তন করে ও অনেক সময়ে অন্তঃসলিলাব্রূপে প্রবাহিত হয। এরূপ চঞ্চল জলস্রোত পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সুতরাং এই সেতু নির্মাণ কবিতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইযাছিল। পদ্মার প্রবল স্রোতে স্তম্ভগুলি যাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারে তজ্জন্য ইহাদেব কোন কোনটিকে নদীতল হইতে প্রায় ১৫০ ফুট নীচু হইতে গাঁথিযা তোলা হইয়াছে। এই সেতু সংরক্ষণেব জন্য পদ্মার উভয তীব দিযা প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধ দিতে হইয়াছে এবং জলস্রেতের বেগ সংহত করিবাব জন্য বহু পাশ খাল খনন এবং জলমধ্যে পিরামিড নির্মাণেব প্রযোজন হইয়াছে। ভারতেব প্রধান প্রধান ইঞ্জিনীয়রগণকে লইযা গঠিত একটি সমিতিব পবামর্শক্রমে এই সেতু সংরক্ষণ কবা হয। এই সেতুটি সমগ্র জগতেব মধ্যে স্থপতি বিদ্যাব একটি অপূর্ব কীর্তি-স্বরূপ পরিগণিত। সেতুব উপবে লোক চলাচলেব পথ আছে। সেতুব উপব হইতে পদ্মানদীর দৃশ্য অতি সুন্দব দেখায়। বর্ষাকালে যখন গৈরিক জলস্রোত সম্ভাবে পদ্মাব কলেবর অতিশয় পরিস্ফুট হয তখনকার দৃশ্য যেরূপ ভীষণ সেইরূপই সুন্দব। ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় তখন,

"কূল ছাড়ি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।"

এই বিপুল জলরাশির উপর দিযা হলদে ও কমলালেবু রঙের পালতোলা নৌকাগুলি সহজ ও স্বচ্ছন্দগতিতে ভাসিয়া যাওযাব দৃশ্য অপূর্ব ও অনির্বচনীয়।"

পদ্মার পরপারেই পাক্‌শী। এই পাকশী থেকে হার্ডিং ব্রিজকে ভালোভাবে দেখা যায। হার্ডিং ব্রিজের ডাকনাম তাই পাক্‌শী।

কিন্তু পাক্‌শী ব্রিজ তো আমাদের বাসকে পদ্মাপার করবে না। তাই ব্রিজেব পাশে খেয়াঘাটের মুখে এসে দাঁড়ালো আমাদের বাস। সেখানে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে অনেক বাস লরি মোটরগাড়ি। তাদের পিছনে লাইন-দেওয়া আমাদের বাসে বসে বলছি—রাধে গো। ব্রজসুন্দরি! পার করো, পার করো। কিন্তু ব্রজসুন্দরীর পদ্মাপার করার কথা

নয়। তিনি অতীতে পার কবতেন যমুনা, আর বর্তমানে ভবনদী। সময় না হলে তিনি কি ভবনদীর পারে নিয়ে যাবেন।

তবে কথাটা হোলো কি, 'ছিরাধিকে' যে অন্তর্যামিনী। তাই খেয়াঘটে ভিড়িয়ে দিলেন খেয়া জাহাজখানিকে। বাস লরি মোটর গাড়ির সারি সুর সুর করে চড়ে বসলো খেয়া জাহাজে। আমরা এলাম পদ্মপারের পাক্‌শীতে।

পাক্‌শীতে দেখি চালকলের মেলা। হবেনা ! ভেতোবাঙালির দেশ এটা। চালকল না থাকলে ভাতের এতো চাল বানাবে কে ! মুখের অন্ন জুটবে কোত্থকে। তবে পাক্‌শী বেশ বড়ো জায়গা। এখন শহর বলা চলে পাক্‌শীকে।

পাক্‌শী ছাড়িয়ে আমাদের বাস একদৌড়ে এসে হাজির হোলো দাশুরিয়ার মোড়ে। এখানেও দেখি লাইন দিয়ে চালকল। দাশুরিয়া ছাড়িয়ে বাস এলো রাজাপুরে। রাজাপুরের খ্যাতি কুম্ভকাবদেব নিয়ে। রাস্তার ধারে ধারে হাঁড়ি-কলসির পাহাড়। তা চালকলের চাল তো আপনি আপনি ভাত হবে না। হাঁড়িতে ফোটাতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে চলে এলাম বড়াইপাড়া। তার আর একটা নাম বনপাড়া। মনে হয়, আগে ছিলো ভিন্ন দুটো গ্রাম। লোকসংখ্যা আর বাড়িঘব বাড়তে বাড়তে গ্রাম দুটো একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু নাম দুটো থেকে গেছে।

বাস এসে পৌছালো নাটোব বাস-টার্মিনাসে। যাদের গতি নাটোব তাবা বাস থামতেই নামতে শুরু করলো। আমি চোখ বুজে বসে আছি সিট-এ উৎকর্ণ হয়ে কিছু একটা শোনার আশায়। হযতো, কেউ আমাকে বলে উঠবে যেমন

"বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

পাখিব নীড়েব মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" কিন্তু আমি তো কবি জীবনানন্দ নই। "হাজাব বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে," এমন গভীর বিচিত্র অনুভূতি তো আমার হৃদয অর্জন করে নি। তাই নাটোরের বনলতা সেনের বদলে বাস-কন্ডাক্টরকে বলতে শুনলাম. অ বাবু ! নামবেন না !

নানলাম। কিন্তু বাস-স্ট্যান্ডেব ব্যস্ততায় পথেব যে হদিস পাই না ! শেষে অগতির গতি এক বিকসা-অলার শরণ নিলাম। সে আমাকে নিযে এলো হোটেলে, নাম তাব রুক্‌সানা হোটেল। হোটেল ম্যানেজার সন্ধান দিলেন কাছাকাছি রতন হোটেলেব যেখানে দুবেলা দুমুটো ভাত জুটবে। বাস্ ! আর কী চাই। আহার ও বাসস্থানের সমস্যা মিটতেই বেরিয়ে পড়লাম অর্ধ-বঙ্গেশ্ববী রানী ভবানীর স্মৃতি বিজড়িত নাটোর রাজপ্রাসাদ দেখতে। এই বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো নাটোব শহর যদিও সেই গড়ে ওঠার নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস নেই। যা আছে তার ভিত্তি জনশ্রুতি। অবশ্য জনশ্রুতি তো ভিত্তিহীন নয় এবং সেই কাবণে মূল্যহীনও নয়।

আজ যেখানে নাটোর শহর কয়েক শতাব্দী আগে সেখানে আমহাটি বলে একটা গ্রাম ছিলো। সেই গ্রামে বাস করতেন কামদেব নামে পূজাবী এক ব্রাহ্মণ। তিনপুত্র তাঁর। তাদের নাম রামজীবন, বিষ্ণুপদ ও রঘুনন্দন। অতি কষ্টে চলতো কামদেবের অভাবের সংসার।

দারিদ্র্যে সংসার যখন প্রায় অচল, তখন কামদেবেব জ্যেষ্ঠ ও কণিষ্ঠ পুত্র—রামজীবন ও রঘুনন্দন—পুঠিয়া চলে যান কিছু অর্থ উপার্জনের আশায়। তখন পুঠিয়ার রাজবাড়িব গোবিন্দ মন্দিরের পূজাবী ছিলেন রামেশ্বর—রামজীবন ও বঘুনন্দনের ভগ্নিপতি। রামেশ্ববেব অনুরোধে পুঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ রামজীবন ও রঘুনন্দনকে পূজার জন্য পুষ্প চয়নের কাজে নিয়োগ করলেন। পালা করে দুই ভাই রাজার পুষ্পোদ্যান থেকে ফুল তুলে আনে। তারপর রাজার গৃহদেবতা গোবিন্দের পুজো হয়।

এই সময় একদিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটলো। সেদিন বঘুনন্দনেব ফুল তোলাব পালা। তার ফুল আনতে দেরি হচ্ছে। এদিকে পূজোর সময় যায বয়ে। বাজার কাছে খবর গেলো এবং রাজা লোক পাঠালেন জেনে আসতে বঘুনন্দনের ফুল তুলে আনতে দেবি হচ্ছে কেন। সেই লোক গিয়ে দেখে, রঘুনন্দন পুষ্পোদ্যানে এক গাছের নীচে ঘুমিয়ে আছে। আর ফণাধর একটা সাপ তার মাথার ওপর ফণা ধরে আছে যাতে বঘুনন্দনের মাথায় রোদ না লাগে। কথাটা শুনে রাজা নিজে গিয়ে দেখলেন সব।

রাজা বুঝলেন রঘুনন্দন সাধারণ ছেলে নয়। তিনি রঘুনন্দনকে ফুল তোলার কাজ থেকে অব্যহিত দিয়ে তার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করলেন। মেধাবী রঘুনন্দন অল্পদিনেব মধ্যেই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখলেন। রাজা দর্পনাবাযণ তখন তাকে রাজকার্যে নিয়োগ করলেন।

কিছুদিন পর বাজা দর্পনারায়ণ তাকে উকীল নিযুক্ত করে ঢাকার নবাবের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। ঢাকায় কিছুদিন খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ কবার পরে রঘুনন্দন চলে যান মুর্শিদাবাদে। তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাব পরিচয পেয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনকে পুঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের অধীনে নায়েব কানুনাগো নিযুক্ত কবে পাঠালেন। রঘুনন্দন নিজের প্রতিভাবলে মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেইজন্য নবাব তাঁকে জমিদারি দান করলেন। সেই জমিদারি রঘুনন্দন অবশ্য তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবনের নামে গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারি ছাড়াও রামজীবন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সুপারিশে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বাজা উপাধি লাভ করেন। এইভাবে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে নাটোরেব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই রাজবংশেব প্রথম রাজা হন রামজীবন।

রামজীবনের পুত্র কালিকা প্রসাদেব অল্পবয়সে মৃত্যু হয। তাই তাঁর মৃত্যুর পর নাটোবেব রাজা হন তাঁর দত্তকপুত্র রামকান্ত। নাটোরের দ্বিতীয় রাজা এই রামকান্তের সহধর্মিণী ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয অর্ধবঙ্গেশ্বরী মহাবানী ভবানী। তিনি রানীভবানী নামেই সমধিক পরিচিত।

রানীভবানী বগুড়া জেলাব আদমদীঘি থানার ছাতিয়ান গ্রামে বাংলা ১১২২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিলো আত্মারাম চৌধুরী। পনেরো বছর বয়সে রানীভবানীর বিবাহ হয় নাটেরের দ্বিতীয় বাজা রামকান্তের সঙ্গে। কিন্তু একটি মাত্র কন্যা নিয়ে রানীভবানী বিধবা হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। রানী ভবানীর কন্যাটিব নাম ছিলো তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরীর বিবাহ হয় খাজুরিয়া গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের কিছু দিনের মধ্যেই রঘুনাথেব মৃত্যু হয় এবং তারাসুন্দরী পিতৃগৃহে ফিরে আসে। তখন রানীভবানী কন্যা তারাসুন্দরীর বাসের জন্য তাকে প্রাসাদ নির্মাণ করে দিলেন।

সেইসময় বাংলাব জমিদাবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী ছিলেন রানী-ভবানী। তাঁর জমিদারি বিস্তৃত ছিলো রাজশাহী, নওগাঁ, দিনাজপুর, রংপুব, বগুড়া, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ফবিদপুর, খুলনা, মধুপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদা, প্রভৃতি জেলায়। তিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন অর্ধবঙ্গেশ্বরী, জমিদাব-কুল-শিরোমণি।

বানীভবানীর দানের কথা বলে শেষ করা যায় না। দেবসেবা ও ব্রাহ্মণসেবার জন্য তাঁর দান করা জমির পরিমাণ ছিলো চাব লক্ষ বিঘারও বেশি। শিক্ষার বিস্তারের জন্যেও তাঁর বহু দান ছিলো। ছাত্রবৃত্তিব জন্যে নগদ অর্থ ছাড়াও বীরভূম, রংপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোর, ঢাকা, প্রভৃতি স্থানেব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণের মানুষকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। ১৩ই জুন -এর আনন্দবাজর পত্রিকায় দেখছি, শুভ্রজ্যোতি ঘোষ আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন "গত শতাব্দীতে নাটোরের রানিভবানী তাঁর সংকল্প রাখতে বছরেব ৩৬৫ দিন কাশীতে বোজ একটি করে বাড়ি দান করেছিলেন। আজ সেই হরিশ্চন্দ্র নেই। সেই কাশীও নেই।"

মুসলমান প্রজাদেরও তিনি অকাতবে দান করেছেন। মুসলমান পীরদের দিয়েছিলেন অনেক পীরোত্তর জমি। বগুড়া জেলার আদমদীঘিতে দরবেশ বাবা আদমের নামে জমি ও পুকুর দান করেছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্যেও অনেক মক্তব স্থাপন করেছিলেন।

রানীভবানী কতো জায়গায় কতো দেবমন্দিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার সঠিক হিসেব পাওয়া শক্ত। রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী দীঘি খননের মতো জনহিতকর কতো কাজ করে গেছেন কে তার হিসেব রাখে। এইসব কাজের অনেক নিদর্শন আজও ছড়িয়ে রয়েছে উভয় বাংলার নানাস্থানে। নাটোরেব রাজবাড়ি থেকে বগুড়ার পীঠস্থান ভবানীপুর পর্যন্ত রাস্তা তিনি নির্মাণ করিয়ে গেছেন তা আজও রয়েছে রানীর জাঙ্গাল নামে।

এই মহীয়সী রানী আজও অসংখ্য নরনাবীর হৃদয়ে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা আছেন। সারা বাংলায় বহুবিস্তৃত জমিদারির প্রজাদের অন্তরে তিনি মাতার স্থান অধিকার করেছিলেন। তাই ৯৭ বছর বয়েসে রানীভবানী পরলোক গমন করলে তাঁর প্রজাগণ মাতৃশোকাহত হয়েছিলো।

রিকসাঅলা তার রিকসা থামিয়ে বললে, নামেন বাবু! আমরা রানীর বাড়ি আসে পড়ছি। চেয়ে দেখি, আমরা রানীভবানীর রাজপ্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়েছি। তা, রানীভবানীর দান ও কীর্তির কথা বলে যখন শেষ করা যাবে না, তখন তাঁর প্রাসাদ দেখে শেষ করা যায় কিনা দেখি।

জমিদারি ও রাজা উপাধি লাভের পর রামজীবন ও তাঁর ছোট ভাই রঘুনন্দন নবাব মুর্শিদকুলী খানের অনুমতি নিয়েই এই প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন তাঁদের পৈত্রিক গ্রাম আমহাটির কাছে ভাত-ঝাড়া বিলের কাছে। পরে রানীভবানী অবশ্য প্রাসাদে অনেক সংযোজন

করেছিলেন। আর এই বাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো আজ যা দেখছি সেই নাটোর শহর।

শুনলাম, ৮৪০ একর জমি নিয়ে এই রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদে প্রবেশেব এই একটি মাত্র পথ। প্রবেশ পথের ওপর তোরণ। কতোকাল আগে তৈবি, তবু দাঁড়িয়ে আছে সে যুগের রাজপ্রাসাদের মহিমার সাক্ষ্য দিতে। তোরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ কবলাম রানীভবানীব প্রাসাদে। একটু রোমাঞ্চ জাগলো বৈকি অন্তবে।

প্রবেশ করেই পথের পাশে একটি মাঝারি আকারেব দীঘি। তারপব রাস্তাটি দুই ভাগ হয়ে চলে গেছে দুই দিকে। বাঁপাশের বাস্তা ধবে একটু এগোলেই রাসমন্দির। এখানে আজও রাস উৎসব হয়। রাসের সময় মেলা বসে। বাসমন্দির পার হয়ে সেই একই রাস্তা ধরে আব একটু এগোলেই মহাবানীর বৃন্দাবন বাড়ি।

ডানপাশের রাস্তা ধরে গেলে দেখা যাবে একটি দালানের ভগ্নাবশেষ। এখানে মহারাজাদের আমলে থাকতো ঘোড়া ও হবিণ। আরও এগিযে গেলে পাওযা যাবে বাজস্ব



নাটোর — রানীভবানীব প্রাসাদ এই বাড়িতেই বিচারালয় এবং ফাঁসি ঘর বয়েছে।

আদায়ের অফিস, তারপবেই পথটি গেছে ঘুরে। সেখানে রয়েছে কয়েকটি দালানকোঠা। এখানে পাইক-বরকন্দাজরা থাকতো।

রাস্তার অপর পাশে বেশ বড়ো একটি দীঘি। তার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সুন্দব প্রবেশ দ্বার বিশিষ্ট একটি দ্বিতল অট্টালিকা। এই অট্টালিকায় ছিলো বিচাবালয়। অপরাধীদের বিচার করা হোতো এখানে। খুনী অপরাধীদেব ফাঁসি দেওয়াব জন্য এই অট্টালিকার একপাশে ছিলো ফাঁসিঘর।

তাবপর বেশ কয়েকটি আম, জাম, কাঁঠাল, নাবকেল, সুপারিব বাগান। মাঝে মাঝে জলাশয়। তারপবেই দীর্ঘ একটি অট্টালিকা। এখানে রাধামাধবেব মন্দির। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। তাব একপাশে ভাণ্ডাব। অন্যপাশে পুবোহিতমশাই-এব বাসগৃহ। এই অংশটি দেখে মনে হোলো মুমূর্ষু হলেও জীবন্ত এখনো।



নাটোব — বানীভবানীব প্রাসাদ

আরও একটু দূবে আনন্দভবন নামে এক অট্টালিকা। তাব পাশেই বিশাল শিব মন্দিব। এই মন্দিরটি শিল্পমণ্ডিত। তাব মাথায় বিশাল ফণাযুক্ত একাটি সাপ বসানো রয়েছে। তার

আর একটু দূরে কয়েকটি দালানবাড়ি। এইগুলি নির্মিত হয়েছিলো রানীভবানীর বিধবা কন্যা তাবাসুন্দরীর জন্যে।

মানুষেব তৈরি সকল বিধানের উপরে সে বিধান ঈশ্বরেব সেই বিধান স্নেহ ও করুণার প্রতিমূর্তি রানীভবানী আপন হৃদয়ে অনুভব কবতেন। তাই তৎকালীন হিন্দু সমাজে যে সকল অমানুষিক প্রথা প্রচলিত ছিলো রানীভবানী অনেক সময সেই সকল প্রথাব বিরোধিতা করতেন। বালবিধবাব সারাজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ তাঁব কাছে নিষ্ঠুর প্রথা বলে প্রতীত হয় বিশেষ করে নিজেব বালবিধবা কন্যা তাবাসুন্দরীকে সেই যন্ত্রণা ভোগ কবতে স্বচক্ষে প্রতিনিয়ত যখন দেখতেন। অবশেষে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য এবং হিন্দু সমাজ থেকে এই নিষ্ঠুব প্রথার অবসানের জন্য তারাসুন্দরীর পূনর্বিবাহে উদ্যেগী হন। কিন্তু নবদ্বীপের বাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর এই উদ্যোগে প্রবলভাবে বাধা দেওয়ায রানীভবানীর এই মহান উদ্যোগ সফল হতে পারে নি।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায বাল-বিধবাদেব পুনার্বিবাহ প্রচলনে বাধা দিয়ে হিন্দু সমাজেব কী বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন কবেছিলেন, আপন হৃদযে তুচ্ছ ঈর্ষাব আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকায় তা অনুধাবন কবতে পাবেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে (পৃঃ ১৯০-৯১) ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত থেকে উদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্র সমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বিক্রমপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ রাজা বাজবল্লভ স্বীয তরুণ বয়স্কা তনযাব বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে যৎপবোনাস্তি ব্যথিত হৃদয লইযা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত কবিবাব বিশেষ প্রয়াস পাইযাছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলেব পণ্ডিতগণেব নিকট সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেব ব্যবস্থাব জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয পণ্ডিত প্রেরণ কবেন। .. তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেবা বাজবাটিতে উপনীত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদবেব সহিত তাঁহাদেব অভ্যর্থনা কবিলেন এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তব সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে বাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা ইহা পাঠ কবণান্তব কহিলেন 'এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত।' ইহা শ্রবণমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিবাতিশয ঈর্ষাদগ্ধ চিত্ত হইয়া বলিলেন, 'এ ব্যবস্থা শাস্ত্র বিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিযা বাজবল্লভকে নিরাশ করিতে হইবেক। একজন বৈদ্যজাতীয এই যে চিব অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত কবিয়া যাইবে, ইহা কোনোমতেই সহনীয় নহে। কিন্তু এক্ষণে বাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব তাহাতে আমি তাঁহাকে কোনো মতেই বিবক্ত কবিতে পারি না। অতএব তাঁহার সন্তোযার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত যৎপবোনাস্তি অনুরোধ কবিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে আপনাদিগেব প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এই কহিবেন যে মহারাজ বা কাহারও অনুরোধে আমবা এরূপ ব্যবস্থা দিয়া পাপগ্রস্থ হইতে পারিব না।

". . পণ্ডিতেরা রাজাব পূর্বনির্দেশানুসাবে, নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষব কবিতে অসম্মত হইলেন। বাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। বাজবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুবী বুঝিতে না পাবিয়া এই মহৎ অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন।"

বানীভবানীব মৃত্যুব পর নাটোবেব বাজা হন তাঁব দত্তকপুত্র বামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণেব পব রাজ সিংহাসনে ক্রমান্বযে বসেছেন বিশ্বনাথ, শিবনাথ, গোবিন্দচন্দ্র, আনন্দনাথ, গোবিন্দনাথ, চন্দ্রনাথ কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ. যোগেন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্রনাথ বীবেন্দ্রনাথ জগদিন্দ্রনাথ এবং যোগীন্দ্রনাথ। অতঃপর জমিদাবী প্রথা বিলুপ্ত হয এবং এই বাজ্য তৎকালীন পাকিস্তান সবকারেব অন্তর্ভুক্ত হয়।

রানীভবানীব পববর্তী বাজাদেব কেউ-ই কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষব রেখে যাননি। তবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির, বিশেষ কবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার জন্য এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিব পৃষ্ঠ পোষকতার জন্য বাজা জগদিন্দ্র নারায়ণেব নাম স্মবণীয হযে আছে। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায়েব ববীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড, পৃ-২৭২) থেকে সম্পৃক্ত অংশ উদ্ধাব কবা যায়। ঃ

"মহাবাজ জগদিন্দ্রনারায়ণেব নিমন্ত্রণে বাজসাহী হইতে লোকেন ও ববীন্দ্রনাথ নাটোর যান (১৬ই অগ্রহাযন ১২৯৯)। সেখান হইতে ইন্দিরাদেবীকে লিখিত একখানি পত্রে এইপথটি সুন্দবভাবে বর্ণিত হইযাছে। নাটোব হইতে দুইদিন পবে লিখিত আব একখানি পত্রে সৌন্দর্য পিয়াসী কবিমনেব একটি পবিপূর্ণ চিত্র ফুটিয়াছে। এই সমযের লিখিত পত্রগুলি যথার্থভাবে কবিব আত্মজীবনীব ন্যায়, অন্তবেব কথাই যদি কবিজীবনেব প্রধান বিষযবস্তু হয় তবে তাঁহাব আবাল্য রচিত পত্রধারাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। কিন্তু নাটোরের সৌন্দর্য সম্ভোগে অচিরেই বাধা পড়িল, কবিও অসুস্থ হইয়া পড়েন, তাঁহাব দাঁতেব ব্যথা হয। যাহাই হউক মহাবাজাব কর্মচাবী যদুনাথ লাহিড়ী তাঁহাকে অক্লান্তভাবে সেবা করিযা সুস্থ করিয়া তুলিলেন। শিলাইদহে ফিবিয়া গিযা ইন্দিবা-দেবীকে (১৮ই ডিসেম্বব ১৮৯২) নাটোবে বাসকালে দাঁতেব ব্যথাব উল্লেখ কবিযা বেশ বসাইযা লিখিতেছেন, 'তোবা এমন দুর্লভ বেদনাটা যুদবাবুব উপব দিযেই কাটালি। ব্যামো কবে আজকাল কোন ফল নেই। তাই আজকাল শবীব ভালো বাখবাব প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে। এটুকু লিখিবাব তাৎপর্য ছিল, মৃণালিনীদেবী তখন শোলাপুবে। নাটোবে দিনসাতের বেশি ছিলেন না।"

ভাবতবর্ষ তখন ইংবেজ সবকাবেব অধীন। ইংরেজ সরকাবের প্রতাপসূর্য তখন মধ্যগগনে। এই অবস্থায জাতীয মহাসভা (National Congress) মাত্র কয়েক বৎসব পূর্বে (১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে) বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয। কংগ্রেস তখন নিতান্তই তার শৈশবে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনেব স্বপ্ন দেখারও সাধ্য নেই তার। তাই দেশবাসীর জন্য কিঞ্চিৎ সুযোগসুবিধা অর্জনের জন্য আবেদন-নিবেদন ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অবশ্য

তখনকার অবস্থা বিবেচনা করলে কংগ্রেসের এই কাজকেই যথেষ্ট বলতে হবে। নাটোবের রাজা জগদিন্দ্রনাবায়ণ জমিদার হয়েও কংগ্রেসের এই কাজে নিজেকে যুক্ত করে তাঁব দেশভক্তিব পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রশান্তকুমার পাল বচিত "রবিজীবনীর" (৪র্থ খণ্ড পৃ১৪২) নিম্নোদ্ধৃত অংশ এই ব্যাপারে আলোকপাত কবে। ঃ

"নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আগ্রহে রাজশাহী জেলাব নাটোবে বর্তমান বৎসবের (1897) সম্মেলন (Bengal provıncial conference) আহূত হয়। সিভিল সার্ভিস থেকে সদ্য অবসবপ্রাপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সভাপতি হন। নাটোরেব মহারাজা হন অভ্যর্থনা সমিতিব সভাপতি। তাঁব সঙ্গে ঠাকুব পবিবারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাব ফলে অন্যান্য প্রখ্যাত বাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঠাকুব পবিবাবের অনেকে নাটোরে উপস্থিত হন। কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে কী বকম রাজ সমাদবে তাঁরা নাটোবে পৌঁছেছিলেন তাব সরল বর্ণনা দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।

"রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত শিলাইদহ থেকে নাটোবে যান।

"10 June (বৃহ ২৮ জ্যৈষ্ঠ) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন আবম্ভ হল। বথীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'প্রথমদিনেই যা কন্‌ফাবেন্স হয়েছিল। ঘটনাব অনেকদিন পবে বাবাব কাছে তার একটি গল্প শুনি। ন্যাশান্যাল কংগ্রেস অধিবেশনে ইংবেজি ভাষা ব্যবহাব হয় তাব মানে আছে। কিন্তু প্রাদেশিক সম্মেলনেও ইংবেজিতে বক্তৃতা হবে বাবাব তাতে খুব আপত্তি ছিল। কন্‌ফাবেন্সের সভাপতি মেজজ্যাঠামহাশয়েবও তাই মত দেখে বাবা বললেন, বাংলাভাষা ব্যবহাব হোক। এই মর্মে সভাব প্রাবম্ভেই তিনি এক প্রস্তাব তুলবেন। স্থিব হল মহাবাজা এই প্রস্তাবেব সমর্থন কববেন। প্রস্তাব উপস্থিত হতেই অধিকাংশ সভ্যরা উৎসাহের সঙ্গে তাঁদের সম্মতি জানালেন; প্রস্তাব গৃহীত হল। কিন্তু কংগ্রেসেব যাঁবা প্রকৃত পাণ্ডা তাঁবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন দেখে বাবা তাঁদেব শান্ত কবলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, তাঁদেব ইংবেজি বক্তৃতা তিনি নিজে সঙ্গে সঙ্গে বাংলায তর্জমা কবে দেবেন। তাঁবা তখনকাব মত আশ্বস্ত হলেন বটে. কিন্তু তাঁদেব মনে বাগ বয়ে গেল। সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, বাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসেব মহাবথীবা ববাবব ইংবেজিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাঁদের ইংবেজি ভাষায যেমন দখল, বক্তৃতা দেবাব ক্ষমতাও তেমনি আশ্চর্য। তাঁবা বাংলায় কী কবে বক্তৃতা দেবেন? তাঁবা কযেকজন ইংবেজিতেই বললেন, বাবা সেগুলি বাংলায তর্জমা কবে দিলেন। অধিবেশন ভাঙাব সময উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C Banerjee) ঠাট্টা কবে বাবাকে শোনালেন —Rabı Babu, your Bengalı was wonderful, but do you thınk your Chasas and Bhusas understood your mellifluous Bengalı better than our English

"রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 'রাজসাহী সম্মেলনীতে নাটোরের পরলোকগত মহাবাজা জগদিন্দ্রনাথেব সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় বাংলাভাষা প্রবর্তন কবাব

প্রথম চেষ্টা যখন করি তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশায় প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্র নেতারা আমার প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রুপ করেছিলেন। পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা-কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টার প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। আমার এই সৃষ্টি ছাড়া উৎসাহ উপলক্ষ্যে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্র সভার মতো জায়গায় আমি বাংলা চালাবার উদ্যোগ করেছি। বাঙালির ছেলের পক্ষে যে গালি সবচেয়ে লজ্জার সেইটেই সেদিন আমার প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল অর্থাৎ আমি ইংরেজি জানি নে।

"পরের দিন 12 June (শনি ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। C. L. Buckland লিখেছেন, " At 5 O'clock P.M., of the 12th June 1897, an earth quake shock, varying in severity, was felt throughout the province of Bengal from South Lushai hills on the east to sahabad on the West, and from Puri on the South to Sikhim on the north. The shock was far more severe over the larger area than that of any previous earthquake in Bengal of which any authentic record exists. It was strongest in the districts of Rajshahi division the Kuchbihar state and the districts of Dacca and Mymenshingh.

জীবনানন্দের বনলতা সেন খ্যাত নাটোরের প্রভাব বাংলার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উজ্জ্বল করেছে। পুণ্য শ্লোক রানীভবানীর পবিত্র করা রাজবংশ এই নাটোর থেকে বাংলার তথা ভারতের নানা স্থানে নানা কীর্তি স্থাপন করে গেছেন। বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে নাটোর দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটোরের এই গুরুত্বের পরিচয় দিতেই রবীন্দ্রজীবনী ও রবিজীবনী থেকে উপরি-লিখিত উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হোলো।

নকশাল হোটেলের পাশেই রতন হোটেল। রতনে খাও, রুকাসানায় শোও। রতনে খেতে গিয়ে ম্যানেজারকে বললাম, ভাই। সেই কবে ছেলেবেলা থেকে নাটোরের কাঁচাগোল্লার কথা শুনে আসছি। তা কাচাগোল্লার কথা কি চিরকাল কানেই শোনা কথা হয়ে থাকবে। আজ খোদ নাটোরে এসেও কি সেই বিখ্যাত বস্তুটি রসনায় পড়বে না।

রতনে ঠিক রতন চেনে। হাসিতে মুখ ভরিয়ে ম্যানেজার ভাইটি আমায় বললে, কাচাগোল্লা খাবেন। তা, সে কথা বলবেন তো। বলেই হাঁক পাড়লেন, এই সাবুরে। ব্যাটা থাকিস কোথা। তারপর আমার পানে মুখ ফিরিয়ে বললেন, নাটোরের সবচেয়ে ভালো কাঁচাগোল্লা তো আমারই বানাই।

বলতে পারবো না রতনের বানানো কাঁচাগোল্লা সেরা কাঁচাগোল্লা কিনা। রানীভবানী বা অন্য রাজাদের আমলের কাঁচাগোল্লা তো খাইনি। আর আজকের দিনের অন্য ময়রার

বানানো কাঁচাগোল্লাও খাওয়া হয়নি। তাই পেট ভরে রতনের কাঁচাগোল্লা খেয়ে তাকে সেরা মনে করতে কোন অসুবিধে হোলো না আমার।

পরদিন সকালে বার হলাম 'জয়কালী' মন্দির দেখতে। রাজপ্রাসাদ থেকে সামান্য দূবে এই জয়কালী মন্দির। রানীভবানীর দত্তক-পুত্র রামকৃষ্ণের দুইপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথের বংশকে বড় তরফ এবং কনিষ্ঠপুত্র শিবনাথেব বংশকে ছোট তরফ বলা হোতো। বড় তরফ ছিলো শাক্ত। তাঁরাই এই জযকালী মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য অনেকে বলেন রানীভবানীই এই জয়কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী।

শ্রীশ্রীজয়কালী মন্দিরেব দ্বার সুরক্ষিত, যাতে সহজে কোন শত্রু প্রবেশ করতে না পারে। দ্বার পার হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেই বেশ প্রশস্ত নাট মন্দিরকে কেন্দ্র কবে চাবিপাশে নানা দেবদেবীর মন্দির, ভাণ্ডার, অফিস ইত্যাদি। নাটমন্দিরের একপাশে বয়েছে কালীমন্দিব। তার বিপরীত পাশে মহালক্ষ্মী ও দুর্গামন্দিব। লোকজন, পূজারী, দর্শনার্থী, সব মিলিয়ে জয়কালী মন্দির যেন গম্‌গম্ করছে।

দেবীকে প্রণাম জানিযে বার হলাম দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি দেখতে যাবো বলে। নাটোর শহর থেকে প্রায় আটমাইল দূবে দিঘাপাতিযা বাজবাড়ি। তাই রিকসাঅলা ভাড়া হাঁকলো আট টাকা।

দিঘাপাতিয়াঃ চাঁদ যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণ্যমান, এবং বিজ্ঞানীদেব অনেকের মতে এক সময় চাঁদ ছিলো পৃথিবীব অংশ, দিঘাপাতিয়াকেও তেমনি নাটোবের উপগ্রহ বলা যায। তাহলে, দিঘাপাতিযা রাজবংশেব ইতিহাসটা একটু জেনে নিতে হয।

দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দযাবাম নামে অতিসামান্য এক ব্যক্তি। তাঁব বাড়ি ছিলো বর্তমান নাটোর জেলাব কলম গ্রামে। তখন কলমগ্রাম কাঁসা-পিতল শিল্পের জন্য সারা ভারতে বিখ্যাত ছিলো। এই কলমগ্রামেব অতি দবিদ্র এক ব্যক্তি, নরসিংহ, হাটে হাটে জিলাপি, তেলেভাজা ইত্যাদি বিক্রি করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নরসিংহের পুত্র ছিলেন দয়াবাম।

শোনা যায়, নাটোরের বাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা ভ্রাতৃদ্বয় রামজীবন ও বঘুনন্দন, যখন পুঠিয়ার রাজবাড়িতে সামান্য কাজ করতেন তখন পুটিয়াব বাজা দর্পনারায়ণ কোন এক বিশেষ কাজে রামজীবনকে কলমগ্রামে পাঠিয়ে ছিলেন। সেইসময় রামজীবনেব সঙ্গে নরসিংহের পুত্র দয়ারামের পরিচয় হয়। দয়ারামের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে রামজীবন মুগ্ধ হন এবং তাকে পুঠিয়ায় নিয়ে এসে রাজবাড়ির কোন কাজে নিযোগ কবেন। কর্তবা-নিষ্ঠ দয়ারাম অল্পদিনেই রাজা দর্পনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

তার কিছুদিন পর নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সুপারিশে রামজীবন দিল্লি সম্রাটের কাছ থেকে বাজসাহী ও অন্য কয়েকটি জেলার জমিদাবি ও রাজা উপাধি লাভ করেন। তারপব রামজীবন ও রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দয়ারামকে নাটোর রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন।

সেইসময বাংলার সুবেদাব মুর্শিদকুলী খাঁব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কবেছিলেন যশোরেব অন্তর্গত মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায। সীতাবাম নিজেই রাজা উপাধি ধারণ করেন এবং নবাবেব সৈন্যদলকে কযেকটি যুদ্ধে পবাজিত কবেন। অবশেষে দযারামের বুদ্ধি ও কৌশলে সুবেদার মুর্শিদকুলী খাঁব জয হয এবং পরাজিত রাজা সীতারাম রাযের ফাঁসি হয। নবাব খুশি হযে দযারামকে বায়বাযান উপাধি এবং বগুড়া জেলার কিছু অংশেব জমিদাবি দান কবেন। এইভাবে নাটোবেব পাশেই স্থাপিত হয দিঘাপাতিয়া বাজ্য।

দয়ারাম দানশীল ছিলেন। জনহিতকব অনেক কাজে জমি ও অর্থ দান করেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ৮০ বছর বযেসে দযাবামেব মৃত্যু হয়। তাঁর পর বাজা হন তাঁর পুত্র জগন্নাথ। জগন্নাথেব বাজত্বকালে দেশে ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জগন্নাথ তখন ত্রাণকার্যে বহু অথব্যয করে প্রজা সাধাবণেব প্রাণ বক্ষা করেছিলেন। জগন্নাথও পিতা দযাবামেব মতোই দানশীল ছিলেন ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৪৫ বৎসব বয়েসে জগন্নাথের মৃত্যু হয।

তাবপব বাজা হন জগন্নাথের পুত্র প্রাণনাথ। প্রাণনাথ সৌখিন, সৌন্দর্যপ্রিয় ও সংস্কৃতিবান বাজা ছিলেন। অবশ্য তিনিও মাবা যান ৪১ বছব বযেসে ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে। অপুত্রক প্রাণনাথেব মৃত্যু হলে বাজা হন তাঁব দত্তকপুত্র প্রসন্ননাথ। প্রসন্ননাথেব প্রধান কীর্তি নানাস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয স্থাপন। সেই সব দাতব্য-চিকিৎসালযেব অনেকগুলি আজও বর্তমান বযেছে। প্রসন্ননাথেব মৃত্যু হয ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়েসে। তিনিও অপুত্রক ছিলেন। তাই তাঁব দত্তক-পুত্র প্রমথনাথ বায় পববর্তী রাজা হন। প্রমথনাথ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তাঁব সময়ে দিঘাপাতিয়া রাজ্যেব যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজসাহীর ডিহি-শিবপুর, বিশালপুব, রামপুর, বোয়ালিযা, বৈদ্যবেল, হুগলী-জেলার শেওড়াফুলি, যশোর জেলার মাহমুদপুর তেলিরহাট, নড়াইল, প্রভৃতি স্থানের জমিদারি প্রমথনাথের রাজত্বকালে দিঘাপাতিয়া বাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বাজসাহীতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয স্থাপন করেছিলেন যা এখনো পিত্রন্ বালিকা নামে বিদ্যালয় বর্তমান। রাজসাহী কলেজের জন্যেও তিনি তখনকার দিনের দেড়লক্ষ-টাকা দান করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রমথনাথ বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য মনোনীত হন এবং তাঁর আমলেই পথকর আইন বাতিল করা হয়। প্রমথনাথের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খীস্টাব্দে।

তারপর বাজা হন প্রমথনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদানাথ। প্রমদানাথও পিতার ন্যায় উদোগী পুরুষ ছিলেন এবং রাজ্যের উন্নয়নেব জন্যে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে রাজসাহীতে ডায়মন্ড জুবিলি ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। রেশমশিল্পেব উন্নতির জন্যে তিনি তুঁত চাষের অনেক জমি দান করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার জন্যেই পববর্তীকালে রাজসাহী রেশমশিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আজও বাজসাহী বেশমশিল্পে সমৃদ্ধ। প্রমদানাথ নওখিলাতে মুসলমান প্রজাদের

জন্য একটি বিবাট মসজিদ নির্মাণ কবে দিয়েছিলেন। এইভাবে প্রমদানাথেব কীর্তিসমূহেব সবিস্তাব পবিচয় দান একপ্রকাব অসম্ভব।

প্রমদানাথেব মৃত্যুব পব বাজা হন তাঁব পুত্র প্রতিভানাথ। তিনিই দিঘাপাতিয়া বাজ্যেব শেষ বাজা।

বিকসায় বসে দূব থেকেই দিঘাপাতিয়া বাজপ্রাসাদেব তোবণদ্বাব দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিলো, যে প্রাসাদেব প্রবেশদ্বাব এতো জাকজমক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রাসাদ না জানি কেমন।

কিন্তু কেমন সে বাজপ্রাসাদ আমবা অদেখাই থেকে গেলো। এই প্রাসাদ দেখাব জন্যে অভ্যন্তবে যেতে হলে জেলা প্রশাসকেব বিশেষ অনুমতিব প্রয়োজন। আজ সবকাবী ছুটিব দিন। আমাকে অনুমতি দেওয়াব জন্যে জেলাপ্রশাসক নিশ্চযই ছুটিব দিনে অফিস খুলে বাখবেন না অতএব দুধেব স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় কী। তোবণটিকেই ভালো কবে দেখতে লাগলাম



নাটোব — দিঘাপাতিয়া বাজপ্রাসাদেব দ্বাবদেশ। উপবে সেই কাঠেব ঘড়ি

তা, ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখার মতোই তোরণ। তার মাথার ওপর বসানো রয়েছে একটা বড়ো আকারের ঘড়ি। ঘড়িটি রাজপ্রাসাদের বার এবং ভিতর, দুদিক থেকেই দেখা যায়। তার মানে ঘড়ি দুটির কলকব্জা এক হলেও দুপাশে দুটি ডায়াল। শুনলাম, ঘড়িটি কাঠের তৈরি। তৈরি হয়েছিলো প্রায় দেড়শো বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ঘড়িটিকে নাকি একবারও সারানোর দরকার হয়নি। অথচ ঠিক সময় দিয়ে চলেছে। এই ঘড়ির সময় সংকেত নাকি এক কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়।

রাজপ্রাসাদের ভিতরে না যেতে পারার এবং এতোখানি এসেও সবকিছু স্বচক্ষে না দেখতে পাওয়ার নিশ্চয়ই দুঃখ আছে। তবু গেটের ফাক দিয়ে দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি ফুল ও [illegible] গাছ দিয়ে সাজানো বাগান। তার ওপারে ঝাপসা রাজপ্রাসাদ। দ্বার রক্ষীদের মুখে [illegible] একর জমির ওপর এই রাজপ্রাসাদ। বহু মূল্যবান, আসবাব, চিত্র, সৌখিনদ্রব্য ও প্রস্তর মূর্তিতে সাজানো এই রাজপ্রাসাদ



নাটোর — দিঘাপাতিয়া রাজপ্রাসাদ ও পুষ্পোদ্যান। প্রবেশদ্বার থেকে নেওয়া আলোক চিত্র

স্বাধীনতার পর, ১৯৫৪ সালে, দিঘাপাতিয়ার শেষ রাজা প্রতিভানাথ রায় ভারতে চলে যান স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্যে। আর রাজ্যহারা রাজার তো হারিয়ে যাবার কথা জনারণ্যে। তবু শুনতে পেলাম, শেষরাজা প্রতিভানাথের পুত্র প্রভাতকুমার রায কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়েব একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী।

পাকিস্থানী আমলে এই রাজপ্রাসাদ অধিগ্রহণ করা হয়। তখন এই রাজপ্রাসাদের নাম হয গভর্নব হাউস। পাকিস্থানের কবলমুক্ত হযে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালি-জাতিব জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজপ্রাসাদেব নামকবণ করেন উত্তরা গণভবন।

তাহেরপুর ঃ পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয রচিত 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য'-এ সেই কবে পড়েছিলাম বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজাব কথা। তখন থেকেই তাহেরপুব গিয়ে বাজা কংসনারায়ণের দুর্গাপূজা মণ্ডপ দেখাব বাসনা আমার অন্তরে ফল্গু স্রোতের মতো বযে যেতো। আমাব অন্তরে দীর্ঘ লালিত সেই বাসনা আজ এতো দিনে পূর্ণ হতে চললো।

এলাম নাটোব বাস টাবমিনাসে। অনুসন্ধান অফিসে কর্তব্যবত মানুষটি বললেন, তাহেরপুবে কোন বাস যায না। দেখো কাণ্ড! তাহলে তাহেবপুব যাবো কী করে ! হেঁটে হেঁটে নাকি! মানুষটি মুচকি হেসে বললেন, না ! অতোখানি হাঁটা কি পোষাবে আপনাব এই বযেসে! তা আপনি এক কাজ করেন। বাজসাহীগামী বাস ধরে গিযে পুঁটিয়াপাড়ায নেমে পড়েন। সেখানে নেমেই শুনতি পাবেন অটোঅলাবা হাঁকতিছে—তাহিবপুব! তাহিরপুব! ঐ যে বাজসাহীব বাস ছাড়তিছে। দৌড়ে গিযে উঠে পডলাম গুড়ি গুড়ি গড়ানো, ভেঁপু বাজানো, বাজসাহীব বাসে।

ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতেব শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "দুর্গা-পূজা ঠিক কখন হইতে বাংলাদেশে প্রচলিত সেকথা একেবারে নিশ্চিত করিয়া বলা যায না , তবে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ-শতকে বচিত কতকগুলি দুর্গাপূজা-বিধান পাইতেছি। এই বিধানগুলি মুখ্যতঃ দেবীপুবাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুবাণ, ভবিষ্যপুবাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুবাণ জাতীয় কযেকখানি উপপুরাণ হইতে সঙ্কলিত।"

ডঃ দাশগুপ্ত তাঁর উপরি-উক্ত গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "বর্তমানে আমবা বাংলাদেশে যেভাবে দুর্গাপূজা করি, তাহা সম্ভবত ষোড়স-শতকে প্রচলিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই, আকবরের রাজত্বকালে মনুসংহিতার বঙ্গদেশী প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্টের পুত্র বাজা কংসনারাযণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন। কথিত হয, কুল্লুক ভট্টের পিতা উদয় নারাযণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুকহইয়া রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিবপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন ; রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহাকে দুর্গাপূজা কবিবার উপদেশ দেন এবং নিজেই একখানি দুর্গাপূজা পদ্ধতি বচনা করেন। অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে সেই পূজা সম্পন্ন কবিয়াছিলেন সম্ভবতঃ উদযনারাযণেব পৌত্র রাজা কংসনারায়ণ।"

তা সেইভাবেই, মানে নাটোরের বাস-টারমিনারেব অনুসন্ধান অফিসের মানুষটির পরামর্শ অনুযায়ী বাস আর অটোরিকসা চড়ে যখন তাহেরপুবে এসে হাজির হলাম সুয্যি তখন ডুবুডুবু। আসলে জয়কালী মন্দির দেখতেই বেলা বেড়ে গেলো। স্থির করলাম স্নানাহার সেরে তবে তাহেরপুর যাবো। তার ফলে এমনি করে বেলা যাবে তখন এতো ভাবি নি। এখন যে দেখি, সর্বনাশের উপক্রম। সূর্যের আলো গেলে আলোকচিত্র তুলবো কেমন করে! আমার দরিদ্র ক্যামেরাব চোখে যে আলো জ্বলে না।

সেই সর্বনাশ থেকে আমাকে বাঁচালো একটি অচেনা, অজানা স্থানীয় কিশোর। অটোবিকসা থেকে নেমেই সম্মুখেব চায়েব দোকানে জানতে চাইলাম কংসনারায়ণের বাজপ্রাসাদ যাবার পথ। ঠিক তখনই চা খাওয়া শেষে দাম মেটাতে এলো কিশোরটি। দোকানের মালিক আমাব প্রশ্নের উত্তর দিতে মুখ খোলার আগেই কিশোরটি বললে, আমি ঐ পথেই যাবো। আপনি আমার সঙ্গে আসুন। রাজবাড়ি দেখিয়ে দেবো।

আমার আকুতি শুনে দ্রুত হাঁটতে থাকলো কিশোরটি এবং আঁধারে রাজবাড়িকে সম্পূর্ণ গ্রাস করার আগেই সে আমাকে নিয়ে এলো সেখানে। আলো-আঁধাবির সংশয় নিয়ে ক্যামেরাব সাটাব টিপেছিলাম। ছবি উঠবে কিনা জানতাম না তখন। পরে দেখি, আমার সংশয় নিবসন কবে আমার বৃদ্ধ ক্যামেবাটি আমাকে উপহাব দিয়েছে সেই পূজামণ্ডপের আলোকচিত্র যেখানে যোড়স-শতকে মহারাজ কংসনাবায়ণ নয লক্ষ টাকা ব্যয় করে এখন যেভাবে আমরা দুর্গাপূজা করি সেইভাবে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন।

জন্মান্তর সম্পর্কে আমাব কোন অনুভূতি বা ধাবণা নেই। জন্মান্তর সম্পর্কে কিছু জানাবও সুযোগ হয নি জীবনে। শুনেছি, পূর্বসুকৃতি না থাকলে কোন মহান ব্যক্তি, কোন তীর্থ ও পুণ্যস্থানেব দশর্ন-লাভ হয না। কিন্তু ইহ-জীবনে আমাব তো কোন সুকৃতি নেই। তাহলে তাহেবপুবেব এই পূজামণ্ডপটিব মতো পবিত্র স্থানের দর্শন-লাভ ঘটলো কী কবে। এই পূণ্য দর্শন-লাভ তাহলে কি আমাব পূব-জন্মেব কোন সুকৃতিব ফল।

জমাট বাঁধা অন্ধকাব নেমে আসছিলো আকাশ থেকে। চাঁদ উঠতে তখনো দেবি আছে। তাব মধ্যেই কংসনাবায়ণেব বাজপ্রাসাদেব যতোখানি পাবি দেখে নিই। তবে এই বন-জঙ্গলে ভবা পড়োবাড়িকে বাজপ্রাসাদ না বলে বাজপ্রাসাদেব ধ্বংসাবশেষ বলাই ভালো। এ যেন প্রকৃতির বিনাশশীলতাব হাতে বাজপ্রাসাদটিকে নিক্ষেপ কবে পূর্বকালেব রাজাগণ পবপাবে বসে মজা দেখছেন। অবক্ষিত হয়ে পড়ে আছে রাজপ্রাসাদটি।

ভগ্ন বাজপ্রাসাদটি দেখাতে দেখাতে কিশোবটি আমাকে একটি প্রাচীন বৃক্ষের কাছে নিয়ে এলো। গাছটিব গোড়া কালোপাথর দিয়ে বাঁধানো। কিশোবটি বললে, এইগাছটি লোকমুখে অচিনগাছ এই খেতাব লাভ করেছে। তাব মানে, এইগাছটি যে কী গাছ তা জানে না কেউ। তবে জনশ্রুতি যে কৃত্তিবাস ওঝা এক সময এই বাজবাড়িতে এসেছিলেন এবং এই অচিনগাছেব নীচে বসে বামাযণেব কোন একটি অধ্যায় বচনা করেছিলেন। তবে তাব কোন নির্ভবযোগ্য প্রমাণ নেই জনশ্রুতি ছাড়া। তাছাড়া, সেইগাছটি যার নীচে বসে কৃত্তিবাস বামায়ণ বচনা কবেছিলেন তাব কি আজও বেঁচে থাকা সম্ভব! কে জানে।



তাহেরপুর

রাজা কংসনারায়ণের দুর্গামণ্ডপ এখানে, বর্তমানে আমরা যেভাবে দুর্গাপূজা করি, রাজা কংসনারায়ণ ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে সেইভাবে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন।

কিশোরটি বললো, রাজা কংসনারায়ণ-সম্পর্কে আরও কিছু যদি জানতে চান তাহলে তাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক মশাই-এর কাছে যেতে হবে আপনাকে। আমি আগ্রহ প্রকাশ করতেই ছেলেটি আমাকে নিয়ে এলো তাঁর কাছে। তাঁর বক্তব্যের সবকিছু লিখে নিলেও, পরিতাপের কথা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকমশাই-এর নামটি লিখে রাখিনি। আর আমার অনবধানতার ফাঁকে বিস্মৃতির মুক্তি পথে মন থেকে বার হয়ে গেছে সেই মহান ব্যক্তির নামটি।

প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকমশাই বললেন, তাহেরপুর এক সময় ছিলো সামান্য একটি গ্রাম মাত্র। এখন অবশ্য রিকসা, অটোরিকসা দালান-কোঠা, পাকা রাস্তাঘাট মিলিয়ে তাহেরপুর শহরে পরিণত হয়ে উঠেছে। শোনা যায়, তাহেরপুরের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কামদেব ভট্ট। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী

হয়ে ওঠেন। কামদেব একজন পাঠান জমিদারকে পরাজিত করে তাঁর জমিদারি ও অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি অধিকার করেছিলেন। এইভাবে তাহেরপুরে জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

এই জমিদার বংশে পরবর্তী সময়ে জন্মগ্রহণ করেন উদয়নারায়ণ। তিনি গৌড়ের প্রসিদ্ধ রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। রাজা গণেশ উদয়নারায়ণকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। মনসংহিতার প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশী টীকাকার কুল্লুক ভট্ট ছিলেন উদয নারায়ণের পুত্র। কুল্লুক ভট্টের পুত্র কংস নারায়ণ।

কামদেব ভট্টের বংশধরগণের মধ্যে কংসনারায়ণ-ই ছিলেন সর্বপ্রধান। তিনি খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে এবং ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে তাহেরপুর অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি বার-ভূঁইয়াদের অন্যতম হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। যুদ্ধে মগদের পরাজিত করে তিনি এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট আকবর কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার সুবেদার মানসিংহও কংসনারায়ণকে পরাজিত করতে সক্ষম হননি। এই অ-পরাজয়-ই রাজা কংসনারায়ণের বিচারে ছিলো যুদ্ধ-বিজয়।

সেই কারণে বিজয়োৎসব করতে রাজা কংসনারায়ণ রাজসূয় যজ্ঞ করার সংকল্প করেন এবং রাজ পুরোহিত বিখ্যাত পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ প্রার্থনা করেন। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় কংস নারায়ণ সামন্ত রাজা, সার্বভৌম রাজা নন এবং সামন্ত রাজার পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞ অবিধেয়। আর কলিযুগে অশ্বমেধ ও গো-মেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ। সুতরাং রাজা কংসনারায়ণ ঐ যজ্ঞগুলির কোনটিই করার অধিকারী নন। এই সকল যজ্ঞ করার পরিবর্তে পণ্ডিতগণ রাজা কংসনারায়ণকে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শারদীয়া দুর্গোৎসব করার বিধান দিলেন। পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বহুক্লেশ স্বীকার করে দুর্গাপূজা পদ্ধতি ও বিধান রচনা করেন। সেই পদ্ধতি ও বিধান অনুসারে রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা সম্পন্ন করেন।

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রচিত দুর্গাপূজাপদ্ধতি আজও দুর্গাপূজায় অনুসরণ করা হয়। তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পূজাপদ্ধতিতেও কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

দুর্গাপূজা ক্রমে তাহেরপুরের সীমা অতিক্রম করে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলার জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। এখন তো বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে, এমন কি সারা পৃথিবীতে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা এখন প্রকৃতপক্ষেই আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এই উৎসবের শুরু তাহেরপুরের এই ভগ্নপ্রায় পূজামণ্ডপে, ভাবতে একটু রোমাঞ্চ বোধ হয় বৈকি।

সপ্তম অধ্যায়

বগুড়া-মহাস্থানগড়-পাহাড়পুর

বিদায় নাটোর ! তোমার ইতিহাসেব পথ বেয়ে মধ্যযুগের দিনগুলো ধীরে ধীবে অপসৃত হয়েছে পিছন পানে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকিত আধুনিক যুগ এগিয়ে এসেছে অনাগত সামনের দিক থেকে। একটা যুগের বিদায় এবং আরেকটার আহ্বানেব সাক্ষী হয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছো নাটোর। তোমাকে বিদায় দিতে নমস্কাব জানাই।

নাটোর বাস-টার্মিনাস থেকে বাস ধরে বগুড়া চলেছি। পথে পড়লো আত্তাই নদী। আত্রাই লোকমুখে বিকৃত হয়ে দাঁড়য়েছে আত্তাই-এ। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা থেকে বার হয়েছে আত্তাই। আগে এই নদীর খুব বাড়-বাড়ন্ত ছিলো। তিস্তার অনেক জল বয়ে নিযে করতোয়ায় ফেলতো। এখন তিস্তা আব আদর কবে না আত্তাইকে। তাই এখন মৃতপ্রায়।

আত্তাই পার হয়ে এলাম সিংড়া। এখনো নাটোর জেলায বযেছি। তাবপর নন্দীগ্রাম হয়ে কুন্দারহাট। শেষে বাস এসে থামলো বগুড়ায।

বগুড়া খুব একটা প্রাচীন শহব নয। তাই এই শহরেব দীর্ঘ কোন ইতিহাস থাকাবও কথা নয। এখন থেকে মাত্র পৌনো দুশো বছব আগে ১৮২১ সালে, এই শহবেব জন্ম। জন্মদাতা ভাবতেব বৃটিশ সরকার। বৃটিশ সরকার স্থাপন কবেছিলো বলেই বোধহয় এই শহরের ইংবেজী নাম বোগড়া (Bogra)। তা আমবা, মানে বাঙালিবা, এমন বিদঘুটে শ্রুতিকটু একটা নাম আমাদেব মিষ্টি নামেব দেশে মেনে নেবো কেন ' তাই আমরা বোগড়াকে মিষ্টি মাখিয়ে করে নিয়েছি বগুড়া। অবশ্যই আমাব জানা নেই বোগড়া নামটাব বিশেষ কোন অর্থ আছে কিনা।

বগুড়া জন্ম থেকেই বগুড়া জেলাব সদব শহব। এখন তো জেলায় জেলায় মহকুমা বলে কিছু নেই। মহকুমাগুলি বাংলাদেশে এখন জেলাব মর্যাদা পেযেছে। সুতবাং বগুডা জেলাব মহকুমাগুলিকে ছেটে দিযে নতুন নতুন জেলা বানানোব ফলে বগুডা জেলা আয়তনে ছোট হযে গেছে। অবশ্যই বগুড়া শহরের মর্যাদা কমেনি তাতে।

বাসস্ট্যান্ডে বাস থেকে নেমেই আমাব প্রধান কাজ হোলো মাথা গোঁজাব একটা ঠাঁই যোগাড় করা। আর অল্প দূবের কোথাও যাওয়াব ব্যাপাবে সাবা বাংলাদেশে যাব ওপব ভরসা করা চলে সে হোলো রিক্সাঅলা। অতএব রিকসাঅলাব শরণ নিলাম। বিকসায উঠে বসতে বসতেই বললাম কাছাকাছি কোন একটা হোটেলে নিয়ে চলো ভাই।

নিয়ে এলো সে। তবে মাঝপথে একটু ঘুবিয়ে নিয়ে এলো। তা, মন্দ কী। বগুড়া শহরের খানিকটা দেখাতো হয়ে গেলো। ব্যবসাবাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদিব দিক থেকে বগুড়ার নাম আছে উত্তর বাংলাদেশে। সেই ব্যস্ততার মধ্য দিযেই চলছে আমাদেব বিকসা।

খানিক পরে বড়োসড়ো একটা মোড়ে এনে আমাকে হাজির করলো। এই মোড়টার নাম আমাকে জিজ্ঞেস করতে হোলো না। রিকসাঅলা নিজে থেকেই বললে, এইড়া হইতেছে আপনার সাত মাথার মোড়। শুনে চারিদিকের রাস্তাগুলোর সংখ্যা গুণতে শুরু করলাম। মাঝখানে যানবাহন নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দ্বীপ। সেই দ্বীপ থেকে চারিদিকে চলে গেছে সাতটা রাস্তা। এই মোড়ের একটা ভালো নামও আছে। সেই নামটি হোলে সাতসড়ক।

রিকসাঅলা সাত-সড়কের কাছে থেমে বললো, আপনে কন্ হোটেলে যাবেন বাবু? বোঝো ঠ্যালা। এসে দেখি এক কানার আর এক কানাকে পথ শুধোনের ব্যাপার। পাশে সাজু-গুজু করে দাঁড়ানো এক ট্রাফিক পুলিশ। রিকসা থেকে নেমে তার কাছে গেলাম। বললাম, ভাই ! ভদ্রগোছের কোন একটা হোটেলের নাম-ঠিকানা বলুন, যেখানে দিন দুই থেকে এই অঞ্চলটা দেখতে পারি। পুলিশ ভাইটি আমার করা প্রশ্নের উত্তর রিকসাঅলাকে দিয়ে বললো এই পথে নিয়ে যাও। পুলিশের দেখানো পথ ধরে রিকসাঅলা আমাকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নিয়ে এলো কাজী নজরুল সড়কের হোটেল আল্মাসে।

বিকেলে শহর দেখতে বেরোলাম। আর পাঁচটা শহরের মতো এখানেও লোকজন আর যানবাহনের ভিড়। রাস্তার দুপাশে দোকান-পাট। সাত-সড়কই বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র। যতো সরকারী আর বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই সাত সড়কের আশে পাশে রয়েছে। এখানে বিশেষ করে দেখার মতো আছে নবাব-বাড়ি। তা অনেক নবাব বাড়িই তো দেখা হোলো। এখানের সেই নবাব-বাড়িটা নাই দেখলাম।

শহরের মধ্যে ভিড়-ভাট্টা ছাড়া দেখার মতো বিশেষ কিছু না থাকলেও শহরের আশে পাশে অনেকগুলো স্থান রয়েছে যাদের খ্যাতি বহুকালের। সেই স্থানগুলোর চাকচিক্য নেই। আছে সম্ভ্রম ও ঐতিহ্য। এমনি একটা স্থানের নাম লাহিড়ীপাড়া গ্রাম। বগুড়া থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক উত্তরে। এই গ্রামে কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রানীভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু-পদ্মপুরাণের রচয়িতা। বগুড়া থেকে মাইল সাতেক দূরে রয়েছে দেবীভবন গ্রাম। এখানে রয়েছে বাণফট যোগীদের দেবীপুরী। দেবীপুরীর মধ্যে আছে ধর্মের মন্দির। আর বাইরে আছে ভৈরব, দুর্গা, সর্বমঙ্গলা, গোরক্ষনাথ, প্রভৃতির মন্দির।

পরদিন সকালে মহাস্থান দেখতে বেরোলাম। মহাস্থান কথাটার অর্থ তো মহৎ স্থান বা শ্রেষ্ঠ স্থান অথবা পরম স্থান। তা স্থানটির এমন গৌরবজনক নাম হোলো কেন। তার উত্তর পেয়েছি স্থানটির খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে। এখন সেই স্থানটি তো দেখি আগে।

বগুড়া থেকে সাত মাইল উত্তরে এই মহাস্থান। হোটেল থেকে হেঁটে খানিক এসে অটোরিকসা স্ট্যান্ড। এখান থেকে বাস যায় মহাস্থানে। কিন্তু বাস বড়ো অনিয়মিত। তাই অটোরিকসাতেই চড়ে বসলাম।

যেতে যেতে পড়লো ডানপাশে ক্ষীণ একটা জলরেখা। ছোট্ট একটা নদীর মতো দেখতে। খানিক যেতে যেতে মাঠের মধ্যে ধেনো জমিতে যেন হারিয়ে গেল। আবার দেখি,

আমাদেব যাওযাব পথেব ডানপাশ দিযে চলেছে যক্ষ্মা বোগীব মতো শীর্ণ দেহ নিয়ে। অটো চালকেব কাছে জানতে চাইলাম এই শীর্ণ জলবেখাটিব পবিচয। অটোচালক বললে, এটাব নাম কবতোযা নদী।



বগুড়া—করতোয়া নদী।

কথাটা শুনে দাকণ বিস্ময়ে টানটান উচ্চাবণ আমাব মুখ থেকে বেবিযে এলা—ক-ব-তো-যা! আমার এই বিস্ময়েব কাবণ আছে। এককালে করতোযা যে উত্তব ভাবতেব সর্বপ্রধান নদীগুলিব অন্যতম ছিলো। কতো প্রাচীন, কতো পবিত্র এই নদী তাব পবিচয আছে বহু প্রাচীন গ্রন্থে। ডঃ নীহারবঞ্জন বায় তাঁব "বাঙালীব ইতিহাস"-এ কবতোয়ার দীর্ঘ পরিচয দিযেছেন। এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি।

"উত্তর বঙ্গে সর্বপ্রধান নদী করতোয়া। এই নদীর ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তীর্থ মহিমা বহুখ্যাত। পুবাণে বাব বার করতোয়া মাহাত্ম্য কীর্তিত হইযাছে। তাহা ছাড়া, "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে একখানা সুপ্রাচীন পুঁথি এখনও করতোয়াব তীর্থ মহিমা ঘোষণা করে। লঘু ভারতে বলা হইয়াছে "বৃহৎ পরিসরা পুণ্য কবতোযা মহানদী।" মহাভারতের বনপর্বেব তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও কবতোযা পুণ্যতোযা বলিযা কথিত হইয়াছে। এবং গঙ্গা-সাগব

সঙ্গম তীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুণ্ড্রনগর (পুণ্ডনগর বর্তমান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই করতোয়ার উপরেই অবস্থিত ছিল। খুব প্রাচীন কালেও যে করতোয়া বর্তমান বগুড়া জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানগড়ের অবস্থিতি এবং "করতোয়া মাহাত্ম্য" হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন হইতে কামরূপ যাইবার পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়া ছিলেন। তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই। কিন্তু টাং সু (Tang Shu) গ্রন্থের মতে এই নদীর নাম ক-লো-তু বা Ka-Lo-Tu। Walters সাহেব এই Ka-Lo-Tu কে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে ইহা ভুল। Ka-Lo-Tu স্পষ্টতই করতোয়া। এই নদীই যে সপ্তম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমা এ খবরও টাং সু গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত-এর কবি-প্রশস্তিতেও এই তথ্যের আংশিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। এখানে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে বরেন্দ্রীদেশ (লিপিমালার বরেন্দ্রী, বা বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র মণ্ডল) গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্তীদেশ যাহা হউক, এইসব উল্লেখ এবং লিপিমালার যেসব গ্রাম ও নগর বরেন্দ্রীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে তাহাদের অবস্থিতি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না যে, সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্বদিক ঘিরিয়া, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পূর্বসীমা দিয়া, করতোয়া প্রবাহিত হইত। "করতোয়া মাহাত্ম্য" পড়ে মনে হয়, এক সময়ে স্ব-স্বতন্ত্র নদী হিসাবে গিয়া সাগরে পড়িত। কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। লোক-স্মৃতি সাগর বোধহয় কোন বৃহৎ জলস্রোত একই বুঝিয়া বা বুঝাইয়া থাকিবে। অন্ততঃ মধ্যযুগে করতোয়ার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রশস্ত পদ্মা-পদ্মেশ্বরী সঙ্গমে।

"করতোয়া ভোটান সীমান্তেরও উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসারিত হইয়া দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার ভিতর দিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই উত্তরতম প্রবাহে ইহার নাম করতোয়া নয়, দিস্তাং বা তিস্তা যাহার সংস্কৃতিকরণ হইয়াছে ত্রিস্রোতা। জলপাইগুড়ি হইতে তিস্তার তিনটি স্রোত তিন দিকে প্রবাহিত। দক্ষিণবাহী পূর্বতম স্রোতের নাম করতোয়া, দক্ষিণবাহী মধ্যবর্তী স্রোতধারার নাম আত্রাই, দক্ষিণবাহী পশ্চিমতম স্রোতের নাম পূর্ণভবা বা পুনর্ভবা।

"পুনর্ভবা উনবিংশ শতকে আইয়র গঞ্জের নিকটে মহানন্দার সহিত মিলিত হইত। এই মিলিত স্রোত লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের ভিতর দিয়া আসিয়া করতোয়ায় নিজ জল নিষ্কাশিত করিত।

"আত্রাই তিস্তা হইতে নির্গত হইয়া সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার সহিত মিলিত হইত।

" দেখা যাইতেছে তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি স্রোতই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অংশে ঘুরিয়া প্লাবিত করিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পর্যন্ত ঢালিয়া দিত তৃতীয় স্রোতটিতে, অর্থাৎ করতোয়ায়। এইজন্যই ষোড়শ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত করতোয়া ছিল অত্যন্ত বেগবতী

নদী। আজ করতোযা মৃতপ্রায়। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দের হিমালয় সানুর বিবাট বন্যার বিপুল জলরাশি তিস্তা বহন কবিতে পাবিল না। দক্ষিণপূর্ব দিকে একটি অবলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত ভাঙ্গিয়া সবেগে কুলছড়ি ঘাটে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িল। সেই সময় হইতে তিস্তা ব্রহ্মপুত্রমুখী। সে আর পূণর্ভবা-আত্রাই-কবতোয়ায জল প্রেরণ কবে না। তাই কবতোয়া আজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরা হইয়া মৃতপ্রায়।"

পদ্মা দেখতে চাইলে শিলাইদহেব কুঠি বাড়িব আজিদ আপন কপালে করাঘাত কবে বলেছিলো, হায় হায ! পদ্মায় পানি নেই। তাই দেখে আপনাব চোখ থেকে পানি ঝববে। মুর্মূষু করতোয়াকে দেখে মনে হোলে, কুঠি বাড়ি ফিরে গিয়ে বলি, আজিদ ভাই ! মবা করতোয়াকে দেখে আমার যে মরা-কান্না পাচ্ছে।

পিচের চটা-ওঠা বাস্তার ওপব দিযে অটোরিকসা চলেছে নেচে নেচে। সেই নাচের তালে তাল মিশিয়ে আমার মাথাব ভিতর বিদঘুটে একটা ভাবনা এসে নাচতে থাকলো। ভাবলাম, "আমি যদি জন্ম নিতেম" না, কালিদাসের কালে নয়। আমি যদি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কালে জন্ম নিতাম এবং জন্মাতাম এই বাংলাব কোন অঞ্চলে। ধবা যাক, পুণ্ড্রবর্ধনে। তাহলে আমি দস্যু নামে অভিহিত হতাম। অবশ্য দস্যু কথাটা ঐতবেয ব্রাহ্মণে পরস্বাপহরণকাবী ডাকাত অর্থে ব্যবহাব কবা হয়নি। ব্যবহৃত হয়েছে আর্য সংস্কর ও সংস্কৃতি বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা জাতি অর্থে। "মনুসংহিতায (১০৪৫) উক্ত হইযাছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণেবা ক্রিয়া লোপাদি হেতু বাহ্য জাতি বলিযা পবিগণিত হয আর্যভাষীই হউক আব ম্লেচ্ছভাষীই হউক, উহাবা দস্যু আখ্যা পাইযা থাকে।" (বাঙলাব ইতিহাস, পৃঃ ৫২, প্রভাস চন্দ্র সেন)।

আব যদি আর্যাবর্তে জন্মাতাম। মনুসংহিতা অনুসাবে আর্যাবর্তেব সীমা উদ্ধৃত কবে প্রভাস চন্দ্র সেন বলেছেন, "পূর্ব পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তবে হিমগিবি ও দক্ষিণে বিন্ধ্যগিবি, ইহার মধ্যবর্তী ভূভাগকে পণ্ডিতেবা আর্যাবর্ত্ত বলেন। যথায কৃষ্ণসাব মৃগ স্বভাবতঃ বিচবণ কবে তাহা যজ্ঞীযদেশ। তদ্ভিন্ন স্থান ম্লেচ্ছ দেশ (২২২-২৩)।"

"আমি যদি জন্ম নিতেম " এই আর্যাবর্তে। তাহলে আমি সাধু লোক বলে অভিহিত হতাম। তাহলে তখনকার পণ্ডিত ও ঋষিগণ নিশ্চয়ই আমাকে হুঁশিয়ার কবে দিযে বলতেন "সাধুলোক কদাচ দুই দিন তথায় (পুণ্ড্রবর্ধনে) থাকিবে না।" আবার নীহাব রঞ্জন রায় তাঁব "বাঙালীর ইতিহাস"-এ (১ম অধ্যায পৃঃ ৪২১) বলেছেন, "এইসব জনপদে (পূর্বাঞ্চলে) যাঁহারা প্রবাস যাপন করিতে যাইতেন ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদেব প্রাযশ্চিত্ত কবিতে হইত।"

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন এলো, এই দেশটা তখনকার সেই বেদ উপনিষদের যুগে এতো হীন বলে বিবেচিত হোতো কেন ! উত্তর খুঁজতে আবার প্রভাস চন্দ্র সেন রচিত "বাংলার ইতিহাস"-এর শরণ নিতে হবে। "শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণে (৪/১/১৪-১৭) এইরূপ লিখিত আছে—রাজা বিদেঘ মাথব সরস্বতী তীরে ছিলেন।

অগ্নি ঐ স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে দহন করিতে করিতে গমন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি সমস্ত নদী (দৃষদ্বতী, যমুনা, সবযু, গণ্ডকী, কুশী)-কে অতিক্রম করিযা বিদগ্ধ কবিল, কিন্তু উত্তবগিবি বিনির্গত সদানীবা (কবতোযা) নদীকে অতিক্রম করিযা বিদগ্ধ কবে নাই।' এই জন্য ব্রাহ্মণেবা পুবাকালে ঐ নদী পাব হইতেন না।"

ঐতবেয ব্রাহ্মণে আব একটি প্রবাদের উল্লেখ আছে। "একদা বিশ্বামিত্র অজিগর্ত ঋষিব পুত্র শুণঃশেপ (মধুচ্ছন্দা)-কে পুত্রত্বে ববণ কবিযা নিজ শত পুত্রকে বলিলেন, তোমবা নিজদিগকে শুনঃশেপেব জ্যেষ্ঠ ভাবিও না। যে পঞ্চাশজন শুনঃশেপের বযোজ্যেষ্ঠ তাহাবা পিতাব আদেশ মান্য কবিল না। বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে শাপ দিলেন, তোমাদেব বংশধবগণ প্রত্যন্ত প্রদেশ ভোগ করুক।"

কিন্তু তখনো পর্যন্ত এই প্রত্যন্ত প্রদেশেব কোন নামেব উল্লেখ পাওযা যায় নি। প্রথম উল্লেখ 'পাওযা যায মহাভাবতেব একটি কাহিনীতে। কাহিনীটি অবশ্য বৈদিক আমলের। কাহিনীটি নিম্নরূপ।

এক সময়ে জন্মান্ধ ঋষি দীর্ঘতমা তাঁব স্ত্রী প্রদ্বেষীব পতিভক্তিহীনতা দেখে তাঁকে অভিশাপ দেন। তখন প্রদ্বেষী ক্রোধান্ধ হয়ে দীর্ঘতমাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কবাব জন্য পুত্রদের আদেশ দিলেন। মাযেব আদেশে পুত্রগণ দীর্ঘতমাকে একটা ভেলায় বেঁধে গঙ্গায় নিক্ষেপ কবে। অন্ধ দীর্ঘতমা সেই ভেলায ভাসতে ভাসতে নানা দেশ অতিক্রম কবে অসুবদেব রাজ্যে উপস্থিত হন। অসুব বাজ বলি তখন গঙ্গায স্নান করতে এসেছিলেন। দীর্ঘতমাব মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বলি তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে যান। বলিরাজ অপুত্রক ছিলেন। তাই তিনি সেই যুগেব প্রথা অনুসাবে নিজ পত্নী সুদেষ্ণাব গর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্য ঋষি দীর্ঘতমাকে নিয়োগ কবেন।

ঋষি দীর্ঘতমা বলি-পত্নী সুদেষ্ণাব অঙ্গস্পর্শ কবে বলেন, তোমার গর্ভে সূর্যেব ন্যায় তেজস্বী অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামের এই পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ কববে। সেই পুত্রদেব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত বাজ্যগুলিব নাম প্রতিষ্ঠাতাদেব নামানুসারে হবে। এইভাবে অঙ্গের প্রতিষ্ঠিত বাজ্যেব নাম হবে অঙ্গ, বঙ্গেব বঙ্গ, কলিঙ্গেব কলিঙ্গ, পুণ্ড্রের পুণ্ড্র এবং সুহ্মের রাজ্যের নাম সুহ্ম হবে।

বৈদিক যুগে আর্যাবর্তেব অধিবাসীরা পূর্বভারতেব অন্-আর্যদের শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো না। তাদের ভাষাও আর্যদের কাছে বোধগম্য ছিলো না। তাই আর্যগণ পূর্বভারতের অধিবাসীদেব দস্যু, অসুব, ম্লেচ্ছ, পাপকোম ইত্যাদি নামে অভিহিত কবতো এবং এইভাবে তাদেব প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ কবতো।

এই অবজ্ঞা ও উন্নাসিকতা অবশ্য বামায়ণ-মহাভাবতেব যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হযনি। রামায়ণে রয়েছে, পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদেব সঙ্গে অযোধ্যা বাজবংশের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো। মহাভাবতে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমেব দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে অন্-আর্য পূর্বাঞ্চলেব উল্লেখ রয়েছে। কর্ণ

পবাজিত করেছিলেন সুহ্ম, পুণ্ড্র ও বঙ্গরাজকে। তাহলে কর্ণ নিশ্চয়ই ঐ সব রাজ্যে এসেছিলেন এবং বিজিত প্রজাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কবেছিলেন। ভীমও এক পৌণ্ড্রক বাজাকে পরাজিত কবেছিলেন। তাবপব একে একে বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের রাজাদের জয় করেছিলেন। তিনি সমুদ্র তীরবাসী ম্লেচ্ছদেবও জয় করেছিলেন। সেই জয়েব স্মরণে আজও মেদিনীপুবের কোন কোন অঞ্চলে ভীমের পুজো কবা হয়।

সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোলো কৃষ্ণ-বাসুদেব ও পৌণ্ড্রক-বাসুদেবেব যুদ্ধ। "মহাভারত ও হরিবংশে এই পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব 'পৌণ্ড্রক-বাসুদেব' নামে অভিহিত হইযাছেন। হবি বংশেব মতে (১৩২ অঃ) যদুবংশীয বসুদেবেব অপর পত্নী সুতনুব গর্ভে ইহাব জন্ম হয়। দ্রৌপদীব স্বযম্বর সভায সমাগত বাজন্যগণ মধ্যে (মহাভাবত, আদিখণ্ড, ১৮৬ অঃ) ও যুধিষ্ঠিবের রাজসূয যজ্ঞে সমাগত নৃপতিবৃন্দ মধ্যে (সভাপর্ব্ব, ৩৪ অঃ) আমবা এই পরাক্রান্ত পৌণ্ড্রক-বাসুদেবকে দেখিতে পাই। এই বাজসূয় যজ্ঞে পুণ্ড্রগণ কৌষেয় বস্ত্রাদি লইবা উপস্থিত ছিলেন। পৌণ্ড্রক-বাসুদেব কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন এবং কৃষ্ণেব সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্রকগণ পবাক্রান্ত হস্তী সৈন্য লইযা কৌবব পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন (মহাভাবত, কর্ণপর্ব্ব, ১/২৩ অঃ)।

ঐতিহাসিক কালে, মহাস্থানেব, অবশ্যই অন্য নামে, উল্লেখ পাওযা যায় আলেকজাণ্ডারের ভাবত আক্রমণের সময। আলেকজাণ্ডাব বিপাসা নদীব তীবে খ্রীঃ পূঃ ৩২৫ অব্দে পৌঁছে সংবাদ পেলেন, প্রাসিযই এবং গণ্ডারিডই (Prasioi and Gandaridoi) নামে দুটি পরাক্রান্ত জাতি অসংখ্য সৈন্য নিয়ে তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ কবাব জন্য অপেক্ষা কবছে। এই সংবাদ শুনে আলেকজাণ্ডাব আব পূর্বমুখে অগ্রসর হননি। (ফুটনোট, পৃঃ ২৭, বাঙলাব ইতিহাস. প্রভাসচন্দ্র সেন।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তেব সভায গ্রীক বাজদূত মেগাস্থিনিস এব 'ইণ্ডিকা' থেকে উদ্ধৃত করে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকে ঐতিহাসিক ডিওডোবাস জানান, পূর্ব দেশে প্রাসিযই এবং গণ্ডারিডই নামে দুটি পবাক্রান্ত জাতি বাস কবে । পববর্তী ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন গণ্ডাবিডই এবং প্রাসিযই হচ্ছে গৌডীয়গণ এবং পলাশ মগধেব গ্রীক রূপান্তব।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনেব নাম পাওযা যায। অশোকাবদান অনুসারে বাজা অশোক পুণ্ড্রবর্ধনের বহু দিগম্বব জৈনকে তাদেব বৌদ্ধ-বিদ্বেষের জন্য হত্যা করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব সমসাময়িক 'কল্পসূত্র' বচযিতা ভদ্রবাহুব মৃত্যুব পব জৈন মতাবলম্বীবা দুই ভাগে বিভক্ত হযে যায। তাদেব এক ভাগকে বলা হয কোটি-বর্ষীয এবং অন্য ভাগকে বলা হয পুণ্ড্রবর্ধনীয।

ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেনেব মতে "পূর্ব্ব-গৌড বা ববেন্দ্রীর বাজধানীব নাম ছিল পুণ্ড্রনগব। এই পুণ্ড্রনগব যে বগুড়া জেলাব মহাস্থানগড়েব সহিত অভিন্ন তাহা মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকেব একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায়। এই লিপিটি একটি ক্ষুদ্র লালপাথরে মৌর্যযুগেব মাগধী প্রাকৃতে ব্রাহ্মী অক্ষবে ক্ষোদিত।

"বুহ্লাবেব (Buhler) মতে ইহা অশোকেব পূর্ব্বকালেব লিপি। এই মতে মহাস্থান লিপিটি সম্ভবতঃ অশোকেব পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব আদেশলিপি। আমাব মতে এই লিপিটিব পাঠ এইরূপ ঃ—

১। [বাএঃবচ]
২। নেন সব গিয়ানং তেল দিনস। দুমদি [নেমহা]
৩। মাতে। সুলখিতে পুংডনগলতে। এতং
৪। [নি] বহিপযিসতি। সবগিযানং [চ] দিনে
৫। ধানিযং। নিবহিসতি। দগাতিযা গি কে পি অ [গি অ]
৬। [যিযা] ধাকসি। সু অতিযাযিক [সি] পি গংডে [কে হি]
৭। [কাকণি] [যি] কে হি এস কোঠাগালে কোসং [ভল]
৮। [নিযে]

অনুবাদ :— রাজার আজ্ঞা (বচন) দ্বারা ষড়বর্গীয় দিগকে তেল প্রদানের জন্য ধান্য বা ... প্রদানের ... প্রতি। তিনি সুলক্ষীবাক্ত পুণ্ড্রনগর হইতে ইহা সরবরাহ করাইবেন। ষড়বর্গীয় ভিক্ষুদের ... ও পরিবহন করিবেন। উদকঘটিত (বন্যাজনিত) আপদের, অগ্নিজনিত আপদের ও শুকপক্ষীজনিত আপদের (প্রতিবিধানের) জন্য এই (পুণ্ড্র নগর) ... কোষাগারে গণ্ডক ও কাকনিক (মুদ্রা) দ্বারা পূর্ণ রাখিতে হইবে।"

এই আদেশলিপি থেকে জানা যায় পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী পর্যন্ত মৌর্যাধিকার বিস্তৃত ছিলো। 'এস কোঠাগালে' কথাটি থেকে মনে হয় শিলালিপিখানি কোষাগারের গায়ে সংযুক্ত ছিলো। সে কালে শ্রমণগণকে তেল ও কাঠ রাজকোষ থেকে দেবার নিয়ম ছিলো, কিন্তু মৌর্যরাজ ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সংঘকে তেল, কাঠ ও ধান দিতেন এবং বন্যা, অগ্নি ও শুকপক্ষী জনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করতেন।

মৌর্যসাম্রাজ্যের পতনের পর পুণ্ড্রনগরের রাজনৈতিক অবস্থা কী হয়েছিলো তা আজ তার জানার উপায় নেই। তবে গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে পুণ্ড্রনগর কোনও রাজ্যের মধ্যে ছিলো এমন অনুমান করা যায়. অবশ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের পর প্রথম কুমার গুপ্ত উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামে এক শাসন বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত পুণ্ড্রনগর এই বিভাগের রাজধানী ছিলো। কিন্তু ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হুন আক্রমণ ও মালবরাজ যশোবর্মণেব আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

সপ্তম শতাব্দীব প্রথম ভাগে গৌড়বাজ্যে সর্বপ্রথম একজন স্বাধীন নবপতির উদয় হন। তিনি বাজা শশাঙ্ক। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দেব আগেই তিনি গৌড় ও কর্ণসুবর্ণের বাজা হন। বাজা শশাঙ্ক একদিকে হর্ষবর্ধন এবং অন্যদিকে কামরূপবাজ ভাস্কব বর্মাকে প্রতিহত কবে গৌড় বাজ্যেব বিস্তার ও সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুব পব প্রায় এক শতাব্দী গৌড়েব ইতিহাস কুয়াসাচ্ছন্ন। সেই সময সমগ্র

বঙ্গভূমিতে চলছিলো চবম অবাজকতা। এই অবস্থাকে ঐতিহাসিকগণ মাৎস্যন্যায বলেছেন। অবশেষে বাংলাব জনসাধাবণ গোপাল নামে পুণ্ড্রবর্ধনেব এক ক্ষত্রিয নেতাকে বাংলাব বাজা নির্বাচিত কবেন। গোপাল ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই গোপাল থেকেই বিখ্যাত পাল বাজবংশেব সুচনা হয।

গোপালেব পুত্র ধর্মপাল ৭৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে বাজত্ব কবেছিলেন। এই ধর্মপালকেই পাল সাম্রাজ্যেব প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয। তাঁব সময পাল সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তব ভাবত অতিক্রম কবে গান্দাব পর্যন্ত বিস্তাব লাভ কবে। ধমপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি বর্তমান ভাগলপুবেব কাছে বিক্রম শিলা এবং ববেন্দ্র ভূমিব পাহাড়পুবে সোমপুবি বিহাব নির্মাণ কবেছিলেন।

ধর্মপালেব পুত্র দেবপালেব বাজত্বকাল ছিলো ৮১০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁব সমযেই পাল সাম্রাজ্য উন্নতিব চবম সীমায আবোহণ কবে। তাঁব সেনাপতি লাউসেন দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পূর্বে আসাম জয কবেছিলো। দেবপালেব বাজত্বকালে বাজধানী পুণ্ড্রনগব বাজ্যেব সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগব হযে উঠেছিলো।

দেবপালেব পব কোন শক্তিশালী বাজা পালবংশেব উত্তবাধিকবী হন নি। এই সময কম্বোজবাজ পালবাজ্য আক্রমণ কবে দুর্বল কবে দেয। তাছাড়া পালবাজ্যেব কিছু অংশ শুববংশেব ও চন্দ্রবংশেব বাজাবা অধিকাব কবে নেয, তাব ফলে পালবাজা দুর্বল হযে পডে। এই দুর্বলতাব সুযোগে কৈবর্ত নেতা দিব্বোক ববেন্দ্রী অধিকাব কবেন।

পালবাজ সভাব সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকব নন্দী। তিনি বামপালেব পুত্র মদনপালেব সময বর্তমান ছিলেন। তিনি "বামচবিতম" নামে বিখ্যাত এক কাব্য বচনা কবেন। এই কাব্যে পাল বংশেব ইতিহাস বর্ণনা কবা হযেছে। মহাস্থান গডে নন্দীবংশেব প্রশস্তি যুক্ত এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হযেছে। এই শিলালিপি থেকেই সন্ধ্যাকব নন্দী সম্পর্কে জানা যায

ক্রমে পালবাজাদেব শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতব সমযে আসে। সেই সময একাদশ শতকে, কর্ণাট থেকে আগত সেন বাজাগণ বাংলাব বাজ সিংহাসন অধিকাব কবেন। সেন বাজগণেব মধ্যে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনেব নাম উল্লেখযোগ্য।

সেন বাজবংশেব পুণ্ড্রনগব ধ্বংসেব কাবণ স্বরূপ বিশেষ একটি কাজেব উল্লেখ কবা যায। স্মবণাতীত কাল থেকে বহু শতাব্দী ধবে পুণ্ড্রনগব বা মহাস্থান ছিল বাংলাব বাজধানী। এই নগব বহু বাজবংশেব উত্থান পতনেব নীবব সাক্ষী। কিন্তু সেন বাজগণ বাংলাব সিংহাসন অধিকাব কবে পুণ্ড্রনগব থেকে বাজধানী সবিযে নিযে যান সুবর্ণ গ্রামে। ফলে পুণ্ড্রনগব উপেক্ষিত হযে পডে।

ঐতিহাসিক প্রভাস চন্দ্র সেন বচিত "বগুডাব ইতিহাস" অনুসাবে মহাস্থানেব শেষ হিন্দুবাজা ছিলেন পবশুবাম। তিনি শাহ্ সুলতান বাল্কহি মাহেওযাব কর্তৃক ১০৪৩ খ্রীস্টাব্দে পবাজিত ও নিহত হন। মহাস্থানে মুসলমান অধিকাব প্রতিষ্ঠিত হয।

ঔবংগজেবেব পব ভাবতেব মুঘল বাজশক্তি যখন অস্তাচলে নেমে এসেছে সেই সুযোগে প্রাদেশিক শক্তিগুলি প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাদেশিক বাজশক্তিগুলি আপন আপন বাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা কবতে পাবেন নি। বাংলাব নবাব আলীবর্দী খাঁ ও তাব দৌহিত্র সিবাজদ্দৌলাব সময় বাংলা কুশাসন ও অবাজকতায় পুর্ণ হয়ে উঠেছিলো। এমনি অবাজকতাব দিনে মহাস্থান ও তাব চাবপোশেব অঞ্চল বন্যা মহামাবী ও দুর্ভিক্ষেব কবলে পড়ে বাব বাব। তখন এই অঞ্চলেব অধিবাসীগণ পিতৃ পিতামহেব বাসভূমি ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মহাস্থান ঢাকা পড়ে যায় বিস্মৃতিব অতলে।

ঘন গাছেব ছায়ায় এসে বিকসা থামলো।.চেয়ে দেখি, বাঁ পাশে গেটেব ওপব লেখা—মহাস্থানগড যাদুঘব। গেটে ঢুকতেই বাঁ পাশে টিকিট-ঘব। টিকিট কাটলাম। প্রবেশ দ্বাবেব পব ব'ধানো পথ সোজা চলে গেছে যাদুঘবে। সেই পথেব ওপব পব পব তিনটি গেট। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কবতে কবতে নানা স্থানে পাওয়া গেছে পাথবেব ওপব কাজ কবা এই গেটগুলি। এখানে এনে পথেব ওপব বসানো হয়েছে সেই গেটগুলিকে। গেটগুলিব ওপব ক্ষোদিত লিপি স্পষ্ট। কিন্তু আমাব কাছে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। আমি যে নিবক্ষব। ঐ সব অক্ষব আমি পড়তে পাবি না।

পথেব দু'পাসে নানা ফুল দিয়ে সাজানো আযতকাব উদ্যান। দুই পাশেব উদ্যানগুলিব সৌন্দর্য উপভোগ কবতে চাইছে আমাব চোখ দুটি। দু'চোখ ভবে সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এসে পৌঁছুলাম যাদুঘব। যাদুঘবেব আযতন বিশাল। কতো যে সংগ্রহ। চাবিপাশেব গ্রামগুলিব মাঠেঘাটে আছে নানা আকাবেব ঢিবি। সেই ঢিবিগুলি খোঁড়াখুঁড়ি কবে পাওয়া গেছে কতো দেবদেবীব মূর্তি ভাঙা হাড়িকুঁড়ি, তৈজসপত্র, পটৌলী তাম্রশাসন। দীর্ঘ সময় ধবে এই সব সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসগুলি দেখলাম। তাবপব এলাম যাদুঘবেব অফিসে। বসেছিলেন কিউবেটব। তাব কাছে জানতে চাইলাম, কীভাবে মহাস্থান দেখব আব কে-ই বা দেখাবে আমাকে মহাস্থান।

কেউবেটব বললেন মহাস্থান দেখাবাব জন্যে গাইডেব কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া, মহাস্থান তো কোন ঘন সন্নিহিত স্থান নয়। মহাস্থান ছড়িয়ে আছে দশ-পনেবোখানা গাঁয়েব মাঠে ঘাটে। ওই সব গাঁয়েব মাঠেঘাটে অটোবিকসা বা দ্রুতগামী কোন যান যাবাব কোন পথ নেই। তবে আপনি প্যাডেল বিকসা চড়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখতে পাবেন মহাস্থানেব ধ্বংসাবশেষ।

যাদুঘব থেকে বেবিয়ে গেটেব কাছে এসে দেখি আমাকে বগুডা থেকে যে বিকসাঅলা এনেছে গাছেব ছায়ায় আব পাঁচজন বিকসাঅলাব সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছে। আমাকে বেবোতে দেখেই এগিয়ে এলো সে। বললে, বাড়ি যাবেন বাবু ? বললাম, এখানে আমি বাড়ি কোথায় পাবো ভাই। এখানে যে আমি গৃহহীন। বিকসাঅলা কী বুঝলো সেই জানে। আমাব দিকে হাঁ কবে চেয়ে আছে দেখে বললাম এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ছড়ানো মহাস্থান দেখবো ভাই। দেখাতে পাববে তুমি ? সে বললে কেনে পাববো না, বাবু। তবে কথাটা হচ্ছে কি, ভাড়াটা লাগবে একটু বেশি। এই ধবুন, একশো টাকা।

সর্বনাশ ! বিকসা ভাড়া লাগবে একশো টাকা ! গেটের পুলিশ ভাইটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলো সব চুপটি করে। এতোক্ষণে সে বা-কাড়লো। বললো, বিকসাঅলা আপনাকে ভাড়া বেশি বলেনি, স্যার ! ছড়ানো-ছিটানো মহাস্থানের সবটা দেখাতে ওর সারাটা দিন লেগে যাবে। সন্ধে পার হয়ে যাবে। তাই শুনে বিকসাঅলা আমাকে বললো, আমি পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়ি বাবু। আমি আপনাকে ঠকাবো না। আমার মনের মধ্যে কৌতুকটা তখন নাচানাচি করছে। সে চুপি চুপি বললো, বাবা ঠকায় অপরকে. তারা ক' ওক্ত নামাজ পড়ে, শুধোও তো তোমার বিকসাঅলা ভাইটিকে। তাই শুনে ফচকে ছোঁড়াটাকে কষে একটা ধমক দিয়ে বললাম ঐসব ধর্মকর্মের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে হয় না।

খানিক নিয়ে এসে বিকসাঅলা বললে এই হোলো আপনার আসল মহাস্থান। এর নাম মহাস্থানগড়। এটা হোলো মহাস্থানের গড় এলাকা। বিকসাঅলার কথাটাকে পরিষ্কার করার জন্যে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙালীর ইতিহাস" (পৃঃ ৩৬০) গ্রন্থ থেকে সম্পৃক্ত অংশ উদ্ধৃত করছি।

"করতোয়ার পশ্চিমতীরে ৩০ বর্গ মাইল [illegible] মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত। নগর প্রাকার, প্রাসাদ [illegible] বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যের বিহার, মন্দির, স্তম্ভ প্রভৃতির আবিষ্কৃত [illegible] প্রাচীন নগরীটির যে চিহ্ন মুদ্রিত [illegible] তাহা কোন অংশেই [illegible] কৌশাম্বীর নগর নিদর্শন তুলনায় [illegible] বলিয়া মনে হয় না। [illegible] মাটি পাথর-প্রস্তর মূর্তি, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, মুদ্রা, সীল ইত্যাদি [illegible] ধ্বংসাবশেষের ভিতর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"নগরটির দুই অংশ, একটি অংশ প্রাকার চিহ্নিত ও প্রকার বেষ্টিত, এই অংশই যথার্থ নগর। অন্য অংশ [illegible] নগরটি চারিপাশের সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু, চারিদিক [illegible] প্রাকার, [illegible] চারিটি উচ্চতর প্রান্ত। [illegible] প্রাকারের বাহিরেই উত্তর দক্ষিণে ও পশ্চিমে দিকে পরিখা। পূর্বদিকে করতোয়া প্রবাহমান। নগরটির দৈর্ঘ্যে উত্তর দক্ষিণে ৫০০০ ফুট, প্রস্থে ৪৫০০ ফুট, সমস্ত নগরটি জুড়ে বৃহৎ মাটি ইট-পাথরের স্তূপ এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুকরায় আকীর্ণ। নগর হইতে নগর [illegible] বাহিরে যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি করিয়া সুপ্রশস্ত নগরদ্বার। পশ্চিম দিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার। এখনো এই দ্বার তাম্র দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্ব দিকে ঠিক ইহার বিপরীত কোণে শিলাদেবীর ঘাটে যাইবার জন্য আর একটি দ্বার এই শিলাদেবীর ঘাটই করতোয়া স্নানের প্রধান তীর্থকেন্দ্র। একটি প্রশস্ত লম্বমান সোজাপথ এক দ্বার হইতে আর একদ্বারে বিলম্বিত, এখনও সেইপথ দুরাপসৃত করতোয়ায় গিয়া নামিয়াছে।....." শিলাদেবীর ঘাট সম্পর্কে একটি লোক প্রবাদ প্রচলিত আছে। শিলাদেবী ছিলেন মহাস্থানের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা পরশুরামের কন্যা। মুসলমান অভিযানকারীদের নেতা সুলতান বাল্খী মাহেসোবার রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর তিনি পরশুরামকন্যা শিলাদেবীকে জোর করে বিয়ে করতে চান। অনন্যোপায়

শিলাদেবী তখন কৌশলে সুলতান বাল্কীকে ছুবিকাঘাত কবে কবতোযায জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু ববণ কবেন। যে স্থানে শিলাদেবী জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন পববর্তী কালে তাঁব স্মৃতিবক্ষার্থে সেখানে একটি ঘাট নির্মাণ কবা হয। এই ঘাটটিই শিলাদেবীব ঘাট নামে খ্যাত। শিলাদেবীব ঘাট গোবিন্দ ভিটা ঢিবিব কাছে অবস্থিত। এখনো শিলাদেবীব স্মবণে প্রতি বৎসব পৌষ মাসে শিলাদেবীব ঘাটে হাজাব হাজাব পুণ্যার্থী পৌষনাবাযণী স্নান কবে।

গড়েব মধ্যে পূর্বদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ঢিবি বযেছে। লোকমুখে এই ঢিবিগুলো নানা নামে পবিচিত। এইসব ঢিবিব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৈবাগী-ভিটা, খোদাব-পাথব ঢিবি, মান-কালীব কুণ্ড পবশুবামেব প্রাসাদ, জীযৎ কুণ্ড, মুনিব ঘোন, এবং নবসিংহেব বাপ। গড়েব পশ্চিম দিকটা উঁচু সমতলভূমি। তাব ওপব বড়ো বড়ো গাছ ও আধুনিক কালেব কিছু ঘববাড়ি।

স্বাধীনতাব প্রায় দুই দশক আগে তৎকালীন অবিভক্ত ভাবত সবকাবেব (তখন বাংলাদেশেব জন্ম হযনি) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগেব মিঃ কে এন্ দীক্ষিতেব পবিচালনায ১৯২৮ সালে সর্ব প্রথম মহাস্থানে খনন কার্য চালানো হয। এই সময গড়েব অভ্যন্তবে বৈবাগী ভিটা ও গড়েব বাইবে গোবিন্দ ভিটায খনন কার্য কবা হয। আযতাকাব বৈবাগী ভিটা চাবিপাশেব ভূমি থেকে প্রায দশ ফুট উঁচু এবং তাব দৈর্ঘ্য প্রায তিনশো ফুট ও প্রস্থ আড়াইশো ফুট। সেই সময মাটি খুড়ে খুব বড়ো বড়ো দুটি মন্দিবেব ভিত্তি-ভূমি আবিষ্কৃত হয। প্রত্নতাত্ত্বিকদেব মতে এই মন্দিব দুটিব একটি নির্মিত হযেছিলো পালযুগেব প্রথম দিকে আব অন্যটি পালযুগেব শেষেব দিকে নির্মিত হযেছিলো।

গোবিন্দ ভিটাব পুবানো নাম গোবিন্দ দ্বীপ। এই ভিটা বযেছে কবতোযাব ঠিক মাঝখানে। আগে এই ভিটাব চাবিপাশ দিযে কবতোযা বযে যেতো বলেই গোবিন্দ ভিটাকে দ্বীপ বলা হোতো। ঐতিহাসিকদেব মতে এই স্থানেই প্রাচীন মহাস্থানেব প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দিব ছিলো। খনন কার্যে অবশ্য সেইরূপ কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয নি।

গোবিন্দ ভিটাব ঠিক পাশ দিযে প্রবাহিত হযে ছোট একটা খাল কবতোযায গিযে পড়েছে। খালটি বাব হযেছে মহাস্থানগড়েব পাশে কালীদহ-সাগব থেকে। গোবিন্দ ভিটা সংলগ্ন কবতোযা ঘাট খুবই পবিত্র বলে মনে কবা হয় প্রাচীন কাল থেকেই। বারুণী এবং পৌষ সংক্রান্তিব দিন অনেক দূব দূব থেকে যাত্রিগণ এই ঘাটে স্নান কবতে আসেন। আর পৌষ সংক্রান্তিব সঙ্গে 'নাবাযণী যোগ' যুক্ত হলে তো কথাই নেই। তখন হাজাব হাজাব পুণ্যার্থী পুণ্য-স্নানেব জন্য এই ঘাটে উপনীত হন। সাধারণতঃ বারো বৎসর অন্তব পৌষ সংক্রান্তিব সঙ্গে নাবাযণী যোগ মিলিত হয।

মহাস্থানগড়েব পূর্ব দিকেব প্রাচীরেব অনেকখানি আজও অটুট রযেছে। গড়ের ভিতব সেই প্রাচীবেব দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বযেছে শাহসুলতান বাল্কহি মাহেসোবাব এব সমাধি। এই সমাধিব কাছে খোদাব পাথব ও মানকালীব কুণ্ড নামে দুটো ঢিবি বযেছে। মানকালীব কুণ্ডেব প্রায দুশোগজ দূবে বযেছে মহাস্থানগড়েব শেষ ক্ষত্রিয বাজা পবশুবামেব বাজপ্রসাদেব ধ্বংসস্তূপ। বাজপ্রাসাদেব ধ্বংসস্তূপেব পূর্ব দিকে রযেছে জীযৎ কুণ্ড ও সঞ্জীবনীকূপ।

এই জীযৎ কুণ্ডুকে নিযে একটি লোক কাহিনী আজও প্রচলিত আছে। জীযৎ কুণ্ডেব জলেব ছিলো সঞ্জীবনী শক্তি। এই শক্তি দ্বাবা বাজা পবশুবাম মৃত সৈনিকদেব পুনবায জীবিত কবতে পাবতেন। তাব ফলে বাজা পবশুবাম ছিলেন অজেয। শাহসুলতান বাল্কহি মাহেসাবাবও এই কাবণে তাঁব কাছে প্রায পবাজিত হযে এসেছেন। এমন সমযে তিনি গুপ্তচব মুখে এই সঞ্জীবনী শক্তি সম্পন্ন জীযৎকুণ্ডেব সংবাদ পেলেন। তখন তিনি গোমাংস নিক্ষেপ কবে এই কুণ্ডেব সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট কবে দেন। যাব ফলে শেষ পর্যন্ত বাজা পবশুবাম পবাজিত হন। এই আজগুবী লোক কাহিনীটি যাব ভিত্তি বাস্তবেব ওপব প্রতিষ্ঠিত বলে মেনে নেওযা কোন ক্রমেই সম্ভব নয।

মহাস্থানগড থেকে মাইলখানেক দূবে গোকুল গ্রাম। সেখানে বযেছে বিবাট একটা ধ্বংসস্তূপ। এই ধ্বংস স্তূপেব প্রচলিত নাম গোকুলেব মেঢ। অনেকে এই মেঢকে লখীন্দবেব মেঢ বলে। কিন্তু আসলে এই স্তূপটি ছিলো একটি বৌদ্ধ মন্দিব পুবাতত্ত্ববিদগণ মনে কবেন এই মন্দিবটি নির্মিত হযেছিলো গুপ্তযুগে।



বগুডা—মহাস্থানগড বৌদ্ধ বিহাব
(বাসুবিহাব)

মহাস্থানগড়েব প্রায় চার মাইল পশ্চিমে বয়েছে বিহার ও বাসুবিহার নামে দুটি গ্রাম। নাগব নামে একটি নদী বিহার গ্রামের পাশ দিয়ে বযে চলেছে। এই ছোট্ট নদীটির পশ্চিম তীবে খুব বড়ো একটা ঢিবি রয়েছে। বিহাব গ্রামের প্রায এক মাইল উত্তব পশ্চিমে বাসুবিহাব গ্রামে বিশাল একটা ঢিবি বযেছে। তাব উচ্চতা তিরিশ ফুটেব কম হবে না। এই ঢিবিব লোকমুখে প্রচলিত নাম নবপতিব ধাপ। বিখ্যাত চৈনিক পবিব্রাজক য়ুয়াং চুযাং সপ্তম শতাব্দীতে পুড্রবর্ধনে এই বাসুবিহাবে এসেছিলেন। তাঁব ভ্রমণবৃত্তান্তে পুড্রবর্ধনকে চৈনিক উচ্চাবণে লিখেছিলেন pan-na-fa-han-na এবং বাসুবিহাবেব নাম লিখেছিলেন po-shı-po এইস্থানে তিনি গগনস্পর্শী চূড়াসহ এক বৌদ্ধ বিহার দেখেছিলেন। সেই বৌদ্ধ বিহাবে তখন সাতশত ভিক্ষু এবং বহু শ্রমণ বাস কবতেন।

বাসুবিহারেব কাছে যুযাংচুযাং একটি স্তুপ দেখেছিলেন। সম্রাট অশোক এই স্তুপটি নির্মাণ কবে দিযেছিলেন। এখানে ছিলো একটা সংঘাবাম যেখানে ভগবান বুদ্ধ তিনমাস বাস কবেছিলেন। তথাগত তাঁর শিষ্যাগণেব কাছে তাঁব ধর্মেব ব্যাখা কবেছিলেন। এই সংঘারামেব কাছেই ছিলো অবলোকিতেশ্ববেব এক প্রতিমা।

মহাস্থানগডেব চাবমাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বযেছে যোগীব ভবন এবং দুই মাইল দক্ষিণে বযেছে স্কন্দেব দাপ। 'কবতোযা মাহাত্ম্যে পুড্রবর্ধনেব দক্ষিণসীমায় যে কার্তিকেব মন্দিবেব উল্লেখ আছে, অনুমান কবা হয স্কন্দেব ধাপই সেই কার্তিকের মন্দিবেব ধ্বংসস্তুপ। এখানেই বযেছে 'ভীমেব জাঙ্গাল' নামে এক দীর্ঘ বাঁধ। এই বাঁধ সিবাজগঞ্জেব সীমান্ত থেকে শেবপুবেব উপব দিযে বংপুব জেলা হযে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত।

মাটি দিযে তৈবি এই বিখ্যাত বাঁধ সম্পর্কে বলা হয, এই বাধটি বেঁধে ছিলেন কৈবর্ত সর্দাব ভীম একাদশ শতকে। সন্ধ্যাকব নন্দীব 'বামচরিতম'-এব বিববণ অনুসাবে ভীম তাঁব পিতা রুদ্রক এবং খুল্লতাত দিব্বোকেব পব কৈবর্ত-বাজ্যেব অধিপতি হন এবং পাল-রাজবংশেব দ্বিতীয মহীপালের সময় ববেন্দ্র রাজ্যেব বাজসিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিছুকাল বাজত্ব কবার পব ভীম মহীপালেব পুত্র বামপাল কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ভীম তাঁব স্বল্পস্থাযী রাজত্বকালের মধ্যে এমন কাজ বাংলার কৃষকদেব জন্যে কবে গেছেন যাব জন্য আজও তাঁকে শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণ কবা হয়। তাঁর জনহিতকব কাজেব নীরব সাক্ষীরূপে 'ভীমেব জাঙ্গাল' আজও দাঁড়িযে আছে।

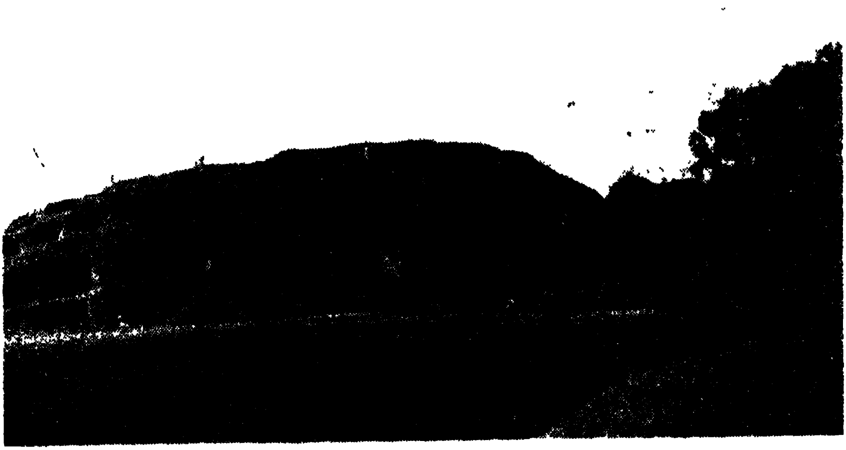
মহাস্থানগডেব চাবিপাশে তিবিশ মাইল ব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে মাঠে ঘাটে ছড়িযে আছে মাটি-চাপাপড়া কতো প্রাচীন নির্দশন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি ঢিবির আকাবে রযেছে। এইসব ঢিবিব কিছু কিছু খনন কবে প্রাচীন কলেব ঘববাড়ি, মন্দির এবং পুবাতাত্ত্বিক মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কাব করা হয়েছে। অধিকাংশই পড়ে আছে অনাবিষ্কৃত হয়ে। বিস্তৃত এই অঞ্চল ঘুরে ঘুবে খুঁটিনাটি দেখাব সাধ বয়েছে, কিন্তু সাধ্য ও সময় নেই আমাব। তাই সাধে জলাঞ্জলি দিযে যেটুকু দেখেছি তার বিববণ দিলাম আর কয়েকটির উল্লেখ কবছি মাত্র। সেগুলি হোলো · তেঘর গ্রামে রযেছে ঃ—

খামার-ভিটা, বলাই-ধাপ, দুলু-মাঝিব ভিটা, ধন্বন্তবি, পদ্মাদেবীর ভিটা, রাসতলাঢিবি, ষষ্ঠিতলা-ঢিবি, ধনভাণ্ডাব-ঢিবি, চাঁদের-ভিটা, সিংঘিনাথ-ধাপ, শালবন রাজাব কাছাবি-ঢিবি, শালবন রাজাব বাড়ি, কচেব আঙিনা ঢিবি, সন্ন্যাসীব ধাপ, নবপতিব ধাপ, মংগল নাথেব ধাপ।

বামনপাড়াগ্রামে বয়েছেঃ—

কানাই ধাপ, যোগীব ধাপ, ধনিকেব ধাপ, মাদাবিগড়, পদ্মাবতী ঢিবি, যোগিনী ধাপ।

মহাস্থানগড়েব উত্তর-পশ্চিমে সিকান্দবাবাদ, ঘাঘব দুযাব গ্রামেও মাঠে মাঠে ছড়ানো পড়ে আছে প্রাচীন ঢিবি, কাভি[illegible] সুবর্ণদীঘিব ধাপ, কুলনা ঢিবি ইত্যাদি।



বগুড়া- মহাস্থানগড়

এই সব ঢিবি ও ধাপেব অধিকাংশই পড়ে আছে অনাবিষ্কৃত অবস্থায়। তবে আশার কথা, বাংলাদেশ সবকার ফরাসী সরকারেব সহযোগিতায় নতুন উদ্যমে খনন কার্য শুরু করেছেন নানা স্থানে। তাঁদের এই কাজের ফলে হয়তো অনাগত কালে বিগত কালের মানুষদের সমাজ শিক্ষা ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে নানা কথা জানা যাবে।

পাহাড়পুর

পবদিন যাত্রা করলাম পাহাড়পুরেব উদ্দেশে। বাংলাদেশে কাছাকাছি কোথাও যেতে হলে বিকসা ছাড়া গতি নেই। আব দূরেব পথে বাস-ই অগতিব গতি। বেলপথ অবশ্য আছে, কিন্তু প্রয়োজনেব তুলনায় বড়ো কম। অতএব পাহাড়পুবের পথে বাসেই উঠে বসলাম। বাসখানি খানিক গেছে কি যায় নি, দেখি, যেখানে থামলো এসে, সেই জায়গাটা খুব চেনা চেনা লাগছে। কী ব্যাপার ! কেমন করে হোলো চেনা! আমি কি গত কোন জন্মে এখানে এসেছিলাম। তা আমিতো জাতিস্মব নই! তাহলে পূর্বজন্মের চেনা আজও চেনা মনে হচ্ছে কেন।

চোখদুটোকে একটু বগড়ে নিয়ে চাইতেই দেখি, ও হবি! এযে দেখি সেই গেট ! মহাস্থান যাদুঘরেব সামনে সেই গেট ! গত জন্মে নয় গত কাল ই এসেছিলাম এখানে। এতো বড়ো একটা দুরূহ সমস্যা এতো সহজে সমাধান হয়ে যেতেই স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেললাম। বাসও ছেড়ে দিলো মহাস্থান যাদুঘরের গেটকে পিছনে ফেলে।

খানিক যেতেই এলো মোকাইতলা। জায়গাটার নাম কলাতলা হলে ভালো হোতো। পথের দুপাশে পাকা-কলাব ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে ব্যাপারীবা। যেন কলাব হাট বসেছে। বাসেব জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক কলাওয়ালাকে বললাম, কলা-পাকার দর, কতো করে? গোটা কলাগুলো দেখিয়ে বললে, দুটাকা খালি।

'খালী' কথাটি যা আমার জানা হলো সেও বাংলাদেশে এসেই। পশ্চিমবঙ্গে আমরা, বিশেষ করে বর্ধমান-বীরভূমে বলে 'গণ্ডা'। চারটেতে এক গণ্ডা। এক গণ্ডা কলার দাম দু'টাকা। আর এখানে বলে খালী। সেই যে কথায় আছে না, যাকে বলে ভাজা চাল তাকেই বলে মুড়ি। সেই ব্যাপার আর কি! যাকে বলে এক গণ্ডা তাকেই বলে এক খালী।

তা এতো সব ভাবতে গেলে বাস তো বসে থাকবে না। বাসে বসে বসে আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্বেব কথা নিয়ে ভাববাব জন্যেতো লোকে বাসে উঠে না। ছাড়বাব জন্যে ভোঁ ভোঁ কবে বাসে হর্ন দিতে শুরু কবলো। হর্ন শুনে তাড়াতাড়ি আবাব জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আমাকে একখালী কলা দাও না গো, কলাবেচা ভাইটি !

মোকাইতলা ছাড়িয়ে বাস মাঠে পড়তেই দেখি মাঠ জোড়া জমি কলাগাছে ভর্তি। তাই বলি, মোকাইতলার হাটে এতো কলা এসেছে কেন। ওবে কলা, ওবে কলা! মাঠভর্তি কলাগাছ আব হাটভর্তি কলা। মহাবাষ্ট্রের ভুশুয়াল না কোথায় যেন, ঠিক মনে পড়ছে না, কলাগাছের জমি-ভর্তি মাঠ দেখেছিলাম। যতো দূব চোখ যায়, কলাগাছ আব কলাগাছ। বড়ো হিংসে হয়েছিলো তাই দেখে। আজ আমাব মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাবাঠিদেব ডেকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো, দেখে যাও, মারাঠি কলাচাষী-ভাইয়েরা! আমাদেব মোকাইতলার

বাঙালি কলাচাষী ভাইয়েবাও কলা কম ফলায না। কিন্তু ডেকে বলাব ইচ্ছেটাকে মনেই চেপে বাখতে হোলো। গলা ফাটিয়ে যতো চিৎকাবই করি না কেন, ভুশুযালেব কলা-চাষী ভাইরা আমাব কথা শুনতে পাবে না।

ততোক্ষণে উদবস্থ আমার এক ফালী পাকা কলা। শেষ কলাটিব খেসা জনালা দিযে ছুড়ে ফেলতে গিযে দেখি আমাদেব বাস পার হচ্ছে ছোট্ট একটি সেতুব ওপব দিযে। সেতুর নীচে একটা নালা। পাশেব যাত্রী ভাই বললেন, এটা নালা নয, কবতোযা নদী। কপালে করাঘাত করে বললাম, হায় করতোয়া! তোমাব এই দশা।

করতোযা পাব হয়ে এলাম কীচক বাজাব। নামটা যেন খুব চেনা চেনা লাগছে। মহাভারতেব বিবাট বাজাব শ্যালকেব নামটা কীচক ছিলো না। তা, সেই শ্যালক মশাই কি এখানে আসতেন বাজাব কবতে। তাই এর নাম কীচক বাজাব। পণ্ডিতেবাও বলেন বিবাট নগব ছিলো এই বগুড়াব কাছাকাছি। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁব "বাংলা ভাষাব অভিধান"-এ বিবাট কথাটার অর্থ লিখেছেন বগুডাব সন্নিহিত দেশ, উত্তরবঙ্গ। তাহলে তো বলতেই হয বিবাট বাজামশাই এই কীচক বাজাবেব ধাবে কাছেই বিয়ে কবেছিলেন। তা এখন পুরাণেব কথা থাক। বর্তমানেব কথায ফিবে আসি।

কীচক বাজার ছাড়িযে আবাব আমাদেব বাস মাঠে পড়লো। বাস্তাব দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। উচ্চফলনশীল বোড়োধানেব গাছে দুপাশেব মাঠ সবুজ হযে আছে। শস্য শ্যামলা দেশমাতা। চিবন্তন বাংলাব সেই চিবনতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে এসে পড়লাম পুনটহাটে। একটা দোকানেব সাইন-বোর্ডে লেখা—পুনটহাট, থানা কালোই, জেলা জয়পুবহাট। পুনটহাট থেকে কয়েক মিনিটেই বাস এসে হাজির হোলো জয়পুবহাটে।

জযপুবহাটের বাসস্ট্যান্ড থেকে বিকসা করে এলাম বেবি-ট্যাক্‌সি স্ট্যান্ডে। বেবি ট্যাক্‌সি করে যেতে হবে পাহাড়পুরে। বেবি-ট্যাক্‌সিতো সময মেনে ছাড়ে না। ছাড়ে যাত্রী বোঝাই হলে। অতএব বসে থাকো কখন যাত্রীবা এসে বোঝাই হবে সেই পথ চেযে। আর যাত্রার দেবতাকে ডাকো তিনি যেন যথাশীঘ্র যাত্রীদের এনে আমাদের যানখানিকে বোঝাই করে দেন। তা দিলেন তিনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কবে। আমি এসে নামলাম পাহাড়পুবে।

বেবি-ট্যাক্‌সি যেখানে নামিয়ে দিলো সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটাব দূবে পাহাড়পুব বিহার। ঐ পথটুকু আদি ও অকৃত্রিম যান পদযুগলেব ওপব ভবসা কবেই এসে পৌছুলাম অভীষ্ট স্থলে। হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি গগনচুম্বী পাহাড়পুর বৌদ্ধ-বিহাবের শীর্ষদেশ। ক্রমশঃ সমগ্র বিহাব পরিস্ফুট হযে উঠলো। আমি তাব পাদদেশে এসে পৌছুলাম।

পুবাতাত্ত্বিকেবা বলেন, হিমালয়েব দক্ষিণে এতো বড়ো বৌদ্ধ বিহাব আব ছিলো না। ডঃ নীহাব রঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস"-এ (৩৬০ পৃঃ) লিখেছেন, "বাজসাহী জেলাব পাহাড়পুরও খুব পুবাতন তীর্থনগর বলিযা মনে হয; খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে এই স্থানেব অন্তত একাংশেব নাম ছিল বটগোহালী (বর্তমান গোয়ালভিটা) এবং সেখানে জৈন

শ্রমণাচার্য গুহনন্দীব একটি বিহার ছিল। ধর্মপালেব আমলে এই স্থান সোমপুবি নামে খ্যাতি লাভ কবে, এবং এইখানেই সোমপুব মহাবিহার (বর্তমান পাহাড়পুর) গডিযা উঠে। পাহাডপুবেব সন্নিকটবতী ওমপুব আজও পুবাতন সোমপুরি নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। সোমপুরি মহাবিহাব সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিব অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থনগব ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ কবিবাব অবকাশ নেই। একাদশ শতকে (বর্মণ বাষ্ট্রের?) বঙ্গাল সৈন্যবা এই মহাবিহাবেব একাংশ আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিযাছিল।"

ঐতিহাসিক প্রভাসচন্দ্র সেনও তাঁব "বাঙলার ইতিহাস"-এ (পৃঃ ১৪৫) পাহাড়পুব সম্বন্ধে বলেছেন, "ধর্মপালদেবের প্রতিষ্ঠিত অপব একটি মহাবিহারের নাম 'সোমপুর মহাবিহাব'। ববেন্দ্রীব অন্তর্গত (বর্তমান বাজশাহী জেলাব) প্রসিদ্ধ পাহাড়পুর নামক স্থানের নিকটবর্তী 'ওমপুব গ্রাম এখনও ইহাব স্মৃতিবহন কবিতেছে। পাহাড়পুরের স্তুপ খনন কালে এই বিহাবেব কতকগুলি মুদ্রা (Clay Seals) পাওয়া গিযাছে। তাহার উপর দুই পার্শ্বে দুইটি মৃগমূর্ত্তিসহ ধর্মচক্র ও 'শ্রী সোমপুবে শ্রীধর্ম পালদেব মহাবিহারীয ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য' কথাগুলি অঙ্কিত আছে।"

বাজা ধর্মপালদেব ৭৭০ খ্রীস্টাব্দে থেকে ৮২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। সুতবাং নিশ্চিত ভাবেই বলা যায সোমপুর বিহার ঐ সমযকালেব মধ্যে, অর্থাৎ ৭৭০-৮২০ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ধর্মপালদেবেব রাজত্বকাল থেকে পালরাজত্ব কালের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বাদশ শতকেব প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই মহাবিহার পালরাজগণেব পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলো। দীর্ঘ ঐ চাব শতাব্দী ধরে এই মহাবিহার তৎকালীন বাংলাব শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার কবেছিলো। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য শ্রমণ, ভিক্ষু, শিল্পী ও স্থপতিবিদ এই মহাবিহাবে তাঁদের জ্ঞান ও নৈপুণ্য বিতবণ কবে গেছেন।

সোমপুব মহাবিহার স্থাপনের স্থান নির্বাচনও গভীব বিবেচনার সঙ্গে নানাদিক চিন্তা করে করা হয়েছিলো। পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর কোলাহল থেকে অনেকদূরে নির্জন স্থানে ও শান্তিময় পরিবেশ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ যাতে জ্ঞান ও ধর্ম সাধনায় একাগ্র চিত্তে ব্যাপৃত থাকতে পাবেন সেই জন্যেই এইরূপ একটি স্থান বেছে নেওয়া হয়েছিলো বলে মনে হয়। অবশ্য সোমপুর মহাবিহাব প্রতিষ্ঠার পূর্বে এখানে চর্তুমুখ এক জৈন মন্দিব ছিলো বলে অনুমান করা হয় এবং তাব নিদর্শনও পাওযা গেছে। সোমপুব মহাবিহাব নির্মাণে সেই জৈন মন্দিরের গঠনবীতি অনুসবণ করা হযেছিলো।

সোমপুব মহাবিহারেব গঠন শৈলী ভারতীয় স্থাপত্যবীতিতে নতুন এক অধ্যাযেব সংযোজন ঘটিয়েছিলো। ভারতেব মধ্যে এই ধবনের স্থাপত্যরীতি অন্যত্র দেখা যায় না, যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াব ব্রহ্মদেশ (মাযানমার), কম্বোজ ও যবদ্বীপের বিশাল মন্দিবগুলির গঠনে এই স্থাপত্যেব মিল দেখা যায়। তাহলে অনুমান করা বিচিত্র নয যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায ভাবতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাংলার অপরিসীম অবদান ছিলে।

মহান সন্ন্যাসীর পূত সমাধিব ওপব স্তুপ নির্মাণ কবাব প্রথা বহুপ্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বৌদ্ধ বিহাবে ভগবান বুদ্ধেব অস্থি বা অন্য কোন স্মৃতি চিহ্নেব ওপব বিশাল স্তুপ নির্মাণ কবা অতি আবশ্যিক ছিলো। কিন্তু সোমপুব বিহাবে যে স্তুপ নির্মাণ কবা হয়েছিলো এতো বিশাল স্তুপ ভাবতের আব কোথাও সম্ভবত নির্মিত হয়নি। এই বিশালকাব স্তুপকে ঘিবে চাবিদিকে বর্গাকাব বিহাব প্রাচীর দিয়ে ঘেবা। এই প্রাচীব উত্তব-দক্ষিণে ৭২২ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৭১৭ ফুট দীর্ঘ। চাবিদিকেব প্রাচীব সংলগ্ন ১৭৭টি কুঠবিব প্রবেশ দ্বাবে· ছোটছোট উপাসনা কক্ষেব জলাধাবেব, কূপেব ধ্বংসাবশেষ আজও এমন অবস্থায় বয়েছে যেগুলি দেখে সহজেই বোঝা যায় ঐগুলি কী ছিলো।



পাহাড়পুর– বৌদ্ধবিহাব

মহাবিহাবেব মধ্যমণি গগনস্পর্শী পাহাড সদৃশ স্তুপ। স্তুপেব ওপব ওঠাব জন্য চাবিদিকের চাব সাব সিঁডি উঠে গেছে। পূর্ব দিকেব সিড়িটিই প্রধান। এই প্রধান সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম একতলায়। দেখি, স্তুপকে ঘিবে প্রশস্ত এক প্রদক্ষিণ পথ। সেই প্রদক্ষিণ পথ ধবে স্তুপকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলাম। খানিক গিয়ে দেখি স্তুপেব গায়ে সাবি সাবি পোড়া

মাটিব টালি বসানো। সেই টালি গুলিব উৎকীর্ণ নানা বকম জীব জন্তু, কর্মবত ও নৃত্যবত মানুষ ইত্যাদিব মূর্তি। কোন টালিতে পঞ্চতন্ত্রেব কাহিনী মূর্তিলাভ করেছে। কোনটিতে হিতোপদেশ, কোনটিতে বানব-কাঁচক কথা, আবাব কোনটিতে সিংহশশক কথা মূর্তিতে প্রকাশিত। আবও খানিক এগিযে দেখি, বামাযণ ও মহাভাবতেব কত মূর্তিমান কাহিনী। অসংখ্য টালি বসানো স্তুপেব দোতলাব চাবিধাবে। দেখে শেষ কবা যায় না।



[illegible]

টেবাকোটাব এই শিল্প কলাব সম্ভাব বর্তমান বাংলাদেশেব ও পশ্চিমবাংলাব সর্বত্র মন্দিবে মন্দিবে ছড়িযে আছে। অনেকস্থানে অযত্নে ও অবহেলায হাবিযে গেছে, মহাকালেব অতলে তলিযে গেছে। এখনো যা, অবশিষ্ট আছে তাবা কতো দিন মহাকালকে ফাঁকি দিযে টিকে থাকবে কে জানে। বর্ধমানের মাধবপুবেব প্রাচীন মন্দিরগুলো সম্প্রতি ধবাশাযী হযেছে। সঙ্গে নিযে গেছে তাদের গাযেব লাগানো টেবাকোট্টাব কাজ করা টালি গুলি। বাঁকুড়াব বিষ্ণুপুবেব মন্দিবগুলি ববাত জোবে সবকাবেব সংবক্ষণ সহাযতা লাভ কবেছে। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে তাবা। তা এই সব টেরাকোট্টাব কাজ তো তুলনায সাম্প্রতিক কালেব। বড জোব পাঁচশত বছব আগেকাব। কিন্তু সোমপুবের বিহাবেও টেবাকোট্টাব

কাজ দেখে বিস্ময় জাগে। টেবাকোট্টাব কাজ দিযে বিশেষ করে মন্দির গাত্র অলংকবণেব বীতি তাহলে তো খুবই প্রাচীন।



পাহাড়পুব বৌদ্ধবিহাবেব গাযে টেবাকোট্টা

প্রদক্ষিণ পথ ধবে স্তুপেব চাবিপাশ ঘুবে এলাম। তখন মনে হোলো, যাই না আর একটু উপবে—একেবাবে স্তুপের মাথায। তা, মনের সাধ মনেব মধ্যে পুষে রাখি কেন। ধীব পদক্ষেপে উঠতে শুরু করলাম এবং খানিক বাদে বুঝলাম, ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে Slow but steady wins the race সত্যি। সতিই আমি ধীর গতিতে স্তুপেব শীর্ষদেশে উঠে এলাম।

মহবিহাবের সবকিছু এখন আমি এক নজবে দেখতে পাচ্ছি। অপূর্ব পবিকল্পনায় নির্মাণ করা হয়েছিলো এই বৌদ্ধ সংঘাবাম। চারিপাশে দেযাল দিয়ে ঘেবা বিশাল প্রাঙ্গণের চারিপাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ। কক্ষগুলির সম্মুখ দিযে সোজা পথ, সমস্ত কিছুই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। আকাশ পরিষ্কার। ঝলমলে বোদে সমস্ত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোথাও অস্পষ্টতা নেই।

চারিদিক ভালো করে দেখার পর নেমে এলাম পাহাড় সদৃশ সেই স্তূপের মাথা থেকে। পাহাড়-সদৃশ কথাটা মনে হতেই এতোক্ষণ ধরে জমে থাকা একটা প্রশ্নের উত্তর আপনা আপনিই পেয়ে গেলাম। পাহাড়পুর যাবো স্থির করার পর আমার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিলো, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলাদেশের সর্বত্রই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ যার শেষে আকাশ নেমে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছে। এখানে পাহাড় এলো কোত্থেকে। এখন বুঝলাম, আকাশ পানে মাথা-তোলা এই স্তূপ লোকের মনে গভীর দাগ কেটে পাহাড়ের এমনি একটা ছবি এঁকে দিয়েছে যে লোকে ভুলেই গেছে জায়গাটার আসল নাম। সোমপুর হয়ে গেছে পাহাড়পুর।

স্তূপের মাথা থেকে নেমে আসতেই বছর বারোর একটা ছেলে এসে সামনে দাঁড়ালো। ভাবলাম, ভিক্ষে-টিক্ষে কিছু চাইবে হয়তো। বললে, না বাবু। আমি ভিক্ষে করি না। গাইড-গিরি করি। গাইড-গিরি করে। কৌতূহল হোলো।

কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হলাম। বারো বছরের ওয়াজুল হোসেন স্কুলের মুখও দেখেনি। সেই ওয়াজুল ঝর ঝর করে বলতে শুরু করলো, এই বৌদ্ধ-বিহারের নাম ছিলো সোমপুর বিহার। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাল রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালদেব। দীর্ঘ চারশো বছর ধরে এই বৌদ্ধ-বিহার পাল রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছিলো। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত এই মহাবিহার তিব্বতীয়দের কাছে তীর্থস্থান রূপে গণ্য হোতো। তিব্বতীয় পন্ডিত ও শ্রমণগণ এখানে আসতেন তীর্থ করতে। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তাঁর জীবনের প্রথম অংশ এই মহাবিহারে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন এই মহাবিহারের অধ্যক্ষ মহাস্থবির শান্তি। ওয়াজুল কি তোতা পাখীর মতো মুখস্থ বলছে না, জানে কিছু।

আমার তখন চুপটি করে শোনার এবং ওয়াজুলের সোমপুরের মহাবিহারের ইতিহাস আউড়ে যাওয়ার পালা। ওয়াজুল আবার বলতে শুরু করলো, পাল রাজত্ব কালে এই বঙ্গ ভূমি শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এবং শিল্প বাণিজ্যে উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলো। ভারতের আর কোন রাজ্য তখন পালরাজ্যের সমকক্ষ ছিলো না। সেই সময় ধীমান ও বীতপালের ন্যায় শিল্পী ও ভাস্কর সারা বিশ্বের আর কোথাও ছিলো না। এখানে পাথরের যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে, মনে করা হয়, সেগুলি ধীমান, বীতপাল এবং তাঁদের শিষ্যদের তৈরি।

একেবারে শুদ্ধ ভাষায় সব কিছু বলে গেলো ওয়াজুল। অবশ্য উচ্চারণে-আঞ্চলিক টান রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বারো বছরের একটা স্কুলে-না-পড়া ছেলের এই সব আয়ত্ত করা সম্ভব হোলো কি করে। আমি চল্লিশ বছরের ওপর স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। ছেলেমেয়েদের ইতিহাস ভূগোল অথবা অংক শেখাতে গিয়ে কতো তিক্ত অভিজ্ঞতাই না সঞ্চয় করেছি। অথচ শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ দিতে পারি নি আমার ছাত্রছাত্রীদের। দেখেছি, মা বাবা ও শিক্ষক শিক্ষিকার তাড়নায় ছাত্রছাত্রীরা তেতো ওষুধ গেলার মতো কিছু মুখস্থ করে অল্পকাল পরে ভোলার জন্য। অন্তরের সঙ্গে শিক্ষনীয় বিষয়টি গ্রহণ করতে পারে না।

ছাত্রছাত্রীদেব শিক্ষাদানেব এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাব ধাবণা হয়েছে আমাদেব শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদেব জীবনেব সঙ্গে যুক্ত নয। শিক্ষার মধ্যে প্রাণ নেই। তাই আনন্দ নেই ছাত্রছাত্রীদেব শেখাব মধ্যে। তাই প্রাণহীন আনন্দহীন শিক্ষা তাবা গলধঃকবণ করে, অন্তব দিয়ে গ্রহণ করে না। প্রাচীন মিশরেব বাজাবানীবা দৈহিক সৌন্দর্যে তো অতলনীয ছিলেন। কিন্তু তাঁদেব দেহেব মমিতে সেই সৌন্দর্য নেই। মমি-কবা দেহে প্রাণ নেই যে সৌন্দর্য থাকবে কী করে।

কিন্তু বাবো বছবেব ইস্কুলে-না-পড়া এই ওযাজুল হক। এই ছেলেটা ইতিহাসেব এতো সব কথা শিখলো কী করে। আমাব ধাবণা, এই শিক্ষা তাব জীবনেব সঙ্গে জড়িত বলে। মিনু মাছওযালীব ছেলেদেব এমনি দেখতাম। পঁযতিরিশ টাকা কিলোদবেব সাড়ে তিনশো মাছ নিয়ে যতোক্ষণ মনে মনে পঁযতিরিশকে দশ দিয়ে ভাগ করে সাড়ে তিন দিয়ে গুণ করতে [illegible] মিনুর মাছওযালীর ছেলে তাব [illegible] টাকা [illegible] পয়সা দিয়ে [illegible] মিনু মাছওযালাব [illegible] আনন্দের সঙ্গে হিসেব শিখেছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] বাঙালিয়া সংস্কৃতি [illegible] এবং [illegible] সত্যপীবও [illegible] সঙ্গে [illegible] আব [illegible] সেই থেকে এই [illegible] ভিটা হলো।

ওযাজুলেব বলা গল্পটা [illegible] কিন্তু [illegible] সত্যপীব ভিটাব স্তূপ-মন্দিবাদিব ধ্বংসাবশেষেব ঠিক [illegible] পেলাম না। [illegible] তবু যতোখানি পবিচয দিয়েছে তাতেই আমি খুশি। [illegible] কবতে আমাবও কোনো দ্বিধা হোলো না।

ওযাজুল বিদায নিলে এলাম পাহাড়পুব যাদুঘবে যাদুঘব দেখবো বলে। টিকিট কাউন্টাবে টিকিট কাটতে গেছি। সেখানে শ্রীমান উত্তম দাসেব সঙ্গে পবিচয় হোলো। সে টিকিটবাবু। বললো, আপনি যাদুঘবটা ভালো করে দেখে আসুন। তাবপব ভালো করে আপনাকে সত্যপীবেব ভিটা দেখাবো।

যাদুঘবে সাজানো বয়েছে পাহাড়পুব বিহাবে পাওয়া নানা দেবদেবীব মূর্তি, ব্যবহৃত মৃৎপাত্র, ধাতবপাত্র ইত্যাদি। এই সব মূর্তিব কোনটি বীতপাল বা ধীমানেব তৈবি কে জানে। ওপব ওপরেই দেখলাম সব। খুঁটিয়ে দেখে শেষ কবতে পাববো না তাছাড়া শিল্পে ও ভাস্কর্যে যে প্রাথমিক জ্ঞানটুকু থাকলে এই শিল্প নিদর্শনগুলি দেখে আনন্দ পাওয়া যায় তাব কণামাত্রও নেই আমাব। এই ব্যাপারে চোখ থাকতেও যে আমি অন্ধ।

ফিবে এলাম টিকিটবাবু শ্রীমান উত্তম দাসেব কাছে। তাব সঙ্গে আবাব এলাম সত্যপীরেব ভিটায়। উত্তম বললে, অষ্টভূজা দেবীমূর্তি সহ অনেক টেবাকোট্টা টালি এই সত্যপীবেব ভিটায় পাওয়া গেছে। তাব থেকে পণ্ডিতেবা প্রমাণ কবেছেন এখানে বৌদ্ধদেবী তাবাব মন্দিব ছিলো। টালিগুলিতে যেসব মূর্তি উৎকীর্ণ বয়েছে তা দেখে মনে হয় সেই মূর্তিগুলি দেবী তাবাব এক একটি রূপ। দেবীব সেই রূপগুলিব মধ্যে একটি নাম সীতাতপত্র। এই সীতাতপত্র নামেব সঙ্গে মিল আছে হিন্দু মুসলমানেব লৌকিক দেবতা সত্যপীবেব নামেব সঙ্গে। তাই অনেকে মনে কবেন বৌদ্ধদেবী সীতাতপত্রেব অধিষ্ঠান ক্ষেত্র পবিণত হয়েছে সত্যপীবেব ভিটায়। সত্যপীবেব ভিটাব চাবিদিকে দেয়াল ছিলো তাব চিহ্ন আজও স্পষ্ট। প্রায় ম[illegible] দেবী তাবাব মন্দিবেব ধ্বংসাবশেষ। মন্দিবেব উত্তবাংশে ছিলো পূজো [illegible] আব দক্ষিণাংশে ছিলো একটি অপেক্ষাকৃত বড়ো হল-ঘব যাব থামগুলিব [illegible] দিকে ছিলো প্রদক্ষিণ পথ। দেবদেবীব মন্দিবকে প্রদক্ষিণ কবাব প্রথা সব প্রাচীনকাল থেকেই আছে বেশ বোঝা যায়। খননকাবেব সময় [illegible] পূজাব বেদি আবিষ্কৃত হয়েছে পাওয়া গেছে পাথব পোড়ামাটি ও [illegible] নিদর্শন নাই। সেইগুলি যাদুঘবে সাজানো আছে।

[illegible] একটু [illegible] ধবেছে। সুতবাং [illegible] তেষ্টাও পেয়ে [illegible] কাউন্টাব থেকে কেটে গেলে [illegible] সে [illegible] পাহাড়পুব বিহাব [illegible] এবং [illegible] একটা বোতল ধবিয়ে দিয়ে [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] টিকিট ঘব থেকে। [illegible] সত্ত্বেও বিদায় নিতে [illegible] এবাব [illegible] মুহূর্তে [illegible] যত্ন কবে খাওয়ালেন [illegible] উত্তমেব উষ্ণ স্পর্শে সে [illegible] পাবেনি।

[illegible] বোতলটা [illegible] সত্যপীবেব [illegible] টেবিলেব অপব দিকে সুমুখে এসে বসলেন বাংলা দেশ সবকাবেব বনবিভাগেব তরুণ প্রশাসক (Forest Officer) জনাব মোশাববফ্ হোসেন সাহেব। অতি সুদর্শন। চোখ ফেবানো যায় না তাঁব দিক থেকে। একটু ইতস্ততঃ কবে বললেন। আপনাকে এখানকাব মিউজিয়ামে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে এবং নোট কবতে দেখলাম কিছুক্ষণ আগে। আপনাব পবিচয় জানতে ইচ্ছে কবছে খুব। যদি আপনাব আপত্তি না থাকে।

পবিচয় দিতে পারি এমন কোন সম্পদ আমাব নেই। আব সেই সম্বলহীন পবিচয় দিতে আমাব আপত্তিই বা কী থাকতে পাবে। বললাম, আমাব সৌভাগ্য যে বাজভিখাবী আমাব

মতো দীন-ভিখারীর কাছে ভিক্ষে চাইছেন। মোশার্‌রফ্ সাহেব হয়তো আমার কথা ঠিকভাবে অনুধাবন করলেন না। তাই অবোধ চোখ দুটি দিয়ে চেয়ে রইলেন আমার পানে।

বললাম, মোশাব্‌রফ্ সাহেব! দেবার মতো কোনো পবিচয় আমার নেই। থাকি কলকাতায়। দেশ দেখে বেড়ানো আমার নেশা। আব যা দেখি তার লিপিবদ্ধরূপ আমাব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের হাতে তুলে দেওয়া আমার শখ। বাংলাদেশের মানুষেরা আলাদা হয়ে এসেছেন প্রায পঞ্চাশ বছব পার হয়ে গেলো। দেশটাকে আপন মনেব মতো গড়বেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে। তা, তাঁরা মাতৃভূমিকে কেমন গড়লেন এই অর্ধশতাব্দী সমযে দেখাব খুব সাধ হোলো. তাই চলে এলাম এখানে। ঘুবে ঘুবে দেখছি বাংলাদেশটাকে। বাংলাদেশেব অতীত ও বর্তমানকে।

শুনে খুব খুশি হলেন মোশাব্‌বফ্ সাহেব। তিনি এই বাংলাদেশের নাগবিক হলেও পাহাড়পুব দেখেননি এব আগে। তাই দেখতে এসেছেন এই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহাব। সঙ্গে এসেছেন তাঁর বিদুষী স্ত্রী ও শ্যালিকা। স্মিত মুখে তাঁবা আমাকে অভিবাদন জানালেন।

মোশাব্‌রফ্ সাহেব জানতে চাইলেন, বাংলাদেশেব কোন্ কোন্ স্থান দেখলাম। আমাব দেখা স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিববণ শুনে ভালো লাগলো তাঁব। তাই পবামর্শও দিলেন কতকগুলো প্রসিদ্ধ স্থান দেখাব। সবচেয়ে ভালো লাগলো, যখন তিনি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বিভাগগুলিব বিস্তৃত পবিচয দিলেন।

এমন সময় মোশাব্‌বফ্ সাহেব ও তাব পবিবাবেব সদস্যাদেব জন্যে দ্বিপ্রাহবিক আহাব এলো। মোশাব্‌বফ্ সাহেবেব বিদুষী বেগম এবং বিশ্ববিদ্যালযেব বত্নস্বরূপা শ্যালিকা-বত্ন হাত জোড় কবে এসে দাঁড়ালেন আমাব সম্মুখে। বললেন. অতিথিরূপে আপনাকে পেলে আমাদেব আনন্দেব সীমা থাকবে না।

মনে মনে কলকাতাস্থ বাংলাদেশেব মাননীয ডেপুটি হাইকমিশনাব জনাব শেখ আহ্‌মেদ জালাল সাহেবেব উদ্দেশ্যে বললাম, জালাল সাহেব ! ভিসাব আবেদন পত্রে কৌতুকেব সঙ্গে লিখে ছিলাম, বাংলাদেশেব আতিথেযতাব সুনাম আছে। তখন তো ভাবিনি. আমাব কৌতুকটি এমন মধুময সত্যে পবিণত হয়ে উঠবে।

অষ্টম অধ্যায়

ঢাকা

পাহাড়পুর থেকে ফিরে গত সন্ধেয় এসেছিলাম সাত-সড়কে। দূর গামী বাসের যতো অফিস তাদের প্রায় সবগুলো এখানেই। অফিসগুলোর সমুখ দিয়ে তাদের সাইন-বোর্ডে লেখা নামগুলো পড়তে পড়তে যাচ্ছি। দেখি, একটা বাস-অফিসের সাইন-বোর্ডে লেখা শ্যামলী। খুব পছন্দ হয়ে গেলো নামটা। সত্যিকথা কবুল করে বলি। শ্যামল, শ্যাম্‌লা, শ্যামলী কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। ঢুকে পড়লাম অফিসে। জিজ্ঞেস করতেই কাউন্টারে বসা তরুণটি বললো, কাল সকালে সাড়ে-সাতটার সময় বাস ছাড়বে। বগুড়া থেকে ঢাকা-যাওযার ভাড়া লাগবে একশো পঞ্চাশ টাকা। আপনি এখুনি টিকিট কেটে নিন। কাল সকালে টিকিট পাবেন এমন গ্যারান্টি দিতে পারবো না।

কিন্তু সকালে সাড়ে-সাতটার আগে আমি এখানে এসে হাজির হতে পারবো এমন গ্যারান্টি কি আমি-ই দিতে পারবো? সারাটা দিন ধরে ঘোরাঘুরি করেছি। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। শয়নকালে পদ্মনাভনকে স্মরণ করতে পারবো কিনা তারই নিশ্চয়তা নেই। সকাল সকাল সময় মতো উঠতে পারবো কিনা তারই ঠিক নেই। যদি সাড়ে সাতটার আগে এখানে এসে হাজির হতে না পারি তাহলে একশো পঞ্চাশটি টাকা পানিতে যাবে।

ভোর হতেই কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলো। তৈরি হয়ে তল্‌পি-তল্‌পা নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সাত-সড়কে শ্যামলী বাস অফিসে আসতেই খুব খাতির করে ডাকলো অফিসের লোকেরা। কাউন্টারের যুবকটি তো চিনেই ফেললো আমাকে। বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সিট খালি আছে। দিন, টিকিটের টাকাটা দিন।

সময় মতো সাতটাতেই বাস ছাড়লো। খানিক পরে শহর ছাড়িয়ে শ্যামলী এসে উপস্থিত হোলো বাংলার শ্যামল মাঠে। মেঠো প্রকৃতির মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ। পথের দু'পাশে বাংলার সেই চিরপরিচিত প্রকৃতি অথচ চির নূতন যেন, পুরানো হয় না কখনো কোথাও। আমার ক্ষুধার্ত চোখদুটো প্রকৃতির দেওয়া এই সৌন্দর্যকে গ্রাস করতে চায়। আমি আশ মিটিয়ে আমার বাংলা মায়ের স্নেহময়ী রূপটিকে দেখতে দেখতে চলেছি।

এই মনোহর সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কতোক্ষণ কেটেছে, কতো দূরে এসেছি এসব কিছুই খেয়াল ছিলো না। এমন সময় ক্যাঁচ করে ব্রেক-কষে 'শ্যামলী' থেমে গেলো হঠাৎ। মুখবাড়িয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি লাইন দিয়ে বিশ-পঁচিশ খানা বাস ট্রাক মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে সম্মুখে। কী ব্যাপার? যানেরা সব লাইন দিয়েছে কেন! কেরাচিনি না চিনি দিচ্ছে এখানে? নাঃ! নেমে দেখতে হয় ব্যাপারখানা কী। নামতে গিয়ে চা-অলার সঙ্গে মুখোমুখি। বললাম, এই জায়গাটার নাম কীগো। চাঅলা বললে, নগরবাড়ি কত্তা। চা দেবো?

চা হাতে নামতেই দেখি সম্মুখে বিশাল জলবাশি। তাব ওপব দিয়ে ভেসে আসছে মাথায় বিস্তৃত একখানা পাটাতন নিয়ে একখানা জাহাজ। পাটাতনখানা এতোই বিশাল যে ফুটবল খেলাব একটা মাঠ বানানো যায় তাব ওপব। ঘাটেব মাথায় পেল্লায় জেটি। ততোধিক পেল্লাব জাহাজখানা ধীবে ধীবে এসে সেই জেটিতে ভিড়লো।

আদেখলা মনটাকে কষে এক ধমক লাগিয়ে বললাম, বাপু হে! নদীব ঘাটে ঘাটে খেয়া-জাহাজ তো কতোই দেখে এলে এব আগে। তাহলে এমন ধাবা হ্যাংলাপনা কবছো কেন? সেইসব খেয়াজহাজে বাস-লবি পাব কবা দেখেও তোমাব কৌতূহল তৃপ্ত হয় নি?

কুতর্কী মনখানিও আমাব কম যায় না। বললে, গোরুগাড়িও গাড়ি, আবাব বেলগাড়িও গাড়ি। তাহলে বেলগাড়ি দেখবাব জন্য হ্যাংলাপনা কবো কেন? বলি, এব আগে যে নদী আব খেয়াজাহাজ গুলি দেখে এসেছো সেগুলি কি এমনি বিশাল। এব তুলনায় তাবা তো ছানা পোনা।

টিকি-ছেঁড়া দুষ্টু ছেলেদের-দেখা হাঁসেব পালাব মতো যানগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলো। দৌড়ে এসে আমাদেব বাস শ্যামলীতে উঠে বসলাম। ছেলে দলে শৃঙ্খলিত গতিতে বাস-লবি-মোটব গাড়ি এগিয়ে গিয়ে খেয়াজাহাজে উঠলো। ওয়াব শেষ সংকেত দিয়ে খেয়া জাহাজ ছেড়ে দিলো।

খেয়া-জাহাজ অতি ধীব গতিতে ভেসে চলেছে। এতোই নিঃশব্দ ও দোলা-হীন যে এগিয়ে চলেছে বোঝাও যায় না। তবে শ্যামলী এসে জাহাজেব কিনাবাটিতে স্থান কবে নিয়েছে। আমাব সিটও জানালাব পাশে। তাই জল দেখে বুঝতে পাবছি আমবা এগিয়ে চলেছি। এই খেয়া জাহাজ খেয়া পাব কবে ওপাবে নিয়ে যাবে আমাদেব। কথাটি মনে হতেই মনেব কোন গহীন কোণে জানি না, গলাব কাছে উঠে এলো, "তুমি এ-পাব ওপাব কব কে গো, ওগো খেয়াব নেয়ে।" গলায় এসে খানিক গুন গুন কবলো। তাবপব গান ছেড়ে বাইবে আসাব উপক্রম কবতেই সাবধান কবে দিলাম গান গাইতে-চাওয়া মনটাকে। একটু আদব কবে বললাম, চুপ মন। এটা বাংলাদেশ। আব এই দেশটা গড়ে উঠেছে বাংলাভাষাব ভিতেব ওপব। বাঙালিবা খবব বাখে "বাজিয়ে বীণ তোমাব নাদে, আনন্দে মাতা জগৎ জিনে।" তাই নিয়ে ভাবতীয় বাঙালিদেব চেয়ে বাংলাদেশি বাঙালিদেব গর্ব কম নয়। তাইতো এদেব ঘবে ঘবে ববীন্দ্র চর্চা। ববীন্দ্র সঙ্গীতে মাতোয়াবা এবা। এদেব জাতীয় সংগীতও বেছে নিয়েছে ববীন্দ্র সঙ্গীতেব বিপুল ভাণ্ডাব থেকে। ববীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে এদেব সাধনা ও নিষ্ঠা দেখে ববি-ঠাকুবেব আপন আখড়া শান্তিনিকেতনেব ববীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীবাও হিংসে করতে শুরু কবেছে আজকাল। সেই বাংলাদেশেব প্রায় মধ্যিখানে নদীর পানিতে ভাসতে ভাসতে যদি হেঁড়ে গলায় বেসুবে ববীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে ওঠো, রে মনোভাই, তাহলে এই নদীর পানিতেই এরা সলিল-সমাধি দেবে তোমাকে।

কিন্তু কী নদী এটা? এব অপব কুলটা আব কতো দূবে। আমাব পার্শ্ববর্তী সিটে বিবাজ মান যাত্রীটি বললেন, এটি যমুনা নদী।

যমুনা। যেখানে শ্যামের বাঁশি শুনে কলসির জল ফেলে দিয়ে কলসি কাঁখে জল আনতে যেতেন আমাদের রাধারানী। তা সেই যমুনা তো বৃন্দাবনে। এখানে এলো কী করে?

এখানে আসাটাই তো স্বাভাবিক। শ্যামের বাঁশি বৃন্দাবনবাসীদের কানে যতো না মধু ঢালে তার চেয়ে অনেক বেশি মধু আসে বাঙালিদের মনে। কানু-অনুরাগে বাঙালি যে মজে আছে সেই মহাপ্রভুর যুগ থেকে। তাহলে কানুর সঙ্গে যমুনা-ই বা আসবে না কেন বাংলায়।

তা না হয় হোলো। যমুনা এলো বাংলাদেশে। কিন্তু যমুনার অপর কুলের কিনারা হয় না কেন? একটা নদী পার হতে কতো সময় লাগে! পাশের যাত্রী আবার মুখ খুললেন। বললেন, আমাদের বাস খেয়া-জাহাজে চড়েছে যমুনার পশ্চিমে নগরবাড়ির ঘাটে। কিন্তু খেয়া-জাহাজ তো যমুনার আড়ে আড়ে পার হচ্ছে না। নদীর ঢাল বরাবর গিয়ে আট মাইল দূরের আরিচা ঘাটে পার হবে। আরিচা ঘাট যমুনার পূর্বপারে।

তা সেই আরিচা-ঘাটে এসে খেয়াজাহাজ জেটিতে লাগলো। ঘড়িতে দেখি বেলা একটা। নগর বাড়িতে ভেসেছিলাম সাড়ে দশটায়। আরিচা-ঘাটে এলাম বেলা একটায়। সময় লাগলো আড়াই ঘণ্টা।

এখানে "যমুনা শাসন করে নতুন দিগন্তে স্বপ্নের সেতু বন্ধন" শীর্ষক সংবাদটি পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি। সংবাদটি বেরিয়ে ছিলো আনন্দবাজার-এ ২৩ শে জুন, ১৯৫৮, তারিখে। যমুনা পারের ক্ষেত্রে সংবাদটির প্রাসঙ্গিকতা খুবই বেশি বলে সংবাদটি উদ্ধৃত করছি এখানে।

"মসৃণ সেতুর উপর দিয়ে মাত্র কয়েক মিনিটে টাঙ্গাইলের ভুয়াঘাট থেকে সিরাজগঞ্জ। নীচে যমুনা নদীর দীর্ঘ বিস্তার। যমুনা শাসনের এই দৃশ্য দেখতে নদীবক্ষে নৌকায় মানুষ, দূরে আলপথে মানুষ। সঙ্গী বাংলাদেশিদের উচ্ছ্বাস থেকে স্পষ্ট 'বঙ্গবন্ধু সেতু' শুধু একটি সেতু নয়, সত্যিই সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথায়, 'যমুনানদী দেশের পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে প্রাকৃতিক বিভাজনের সৃষ্টি করেছিলো। 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নির্মাণের মধ্য দিয়ে সেই বিভাজন-রেখা অপসৃত হল।

"অপসৃত যে হল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খ্যাপা যমুনা পার হতে এত দিন মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। পোয়াতে হয়েছে অসীম দুর্ভোগ। শেখ হাসিনা আজ দুপুরে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অপেক্ষার, সেই দুর্ভোগের অবসান হল। পূর্বে রাজধানী ঢাকা-সহ অন্য জেলাগুলির সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সিরাজগঞ্জ, রাজশাহি, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 'দূরত্ব কমল'।

"শুধু বাংলাদেশের দুই প্রান্তের দূরত্ব নয়, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের সঙ্গেও ঢাকার দূরত্ব কমে গেল। উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি থেকে ঢাকা আসার পথ হল মসৃণ। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য চলাচল নিয়ে যেভাবে আলাপ আলোচনা চলছে তাতে আগামী দিনে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে এই সেতুর গুরুত্ব বাড়বে। সেই সঙ্গে নেপাল থেকেও বাংলাদেশে পণ্য আসার পথ সুগম হবে। গুরুত্ব বাডবে চট্টগ্রাম বন্দরেরও। সেই কারণেই হযতো আজ সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতিব ইতিহাসে এই সেতু এক্কভাবে একটি সুস্পষ্ট মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে।'

"বাংলাদেশ সরকারের মতে, বিশ্বেব দীর্ঘ সেতুলিব মধ্যে এটির স্থান একাদশ। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নেব এই সেতু নির্মাণে ব্যয় হযেছে ৩ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা। এই টাকার সিংহ ভাগ জুগিয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশীয উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, জাপানের ও ই সি এফ। নির্মাণ কৌশল দক্ষিণ কোরিয়ার। সেতুর উপবে সড়ক ছাড়াও রয়েছে বেললাইন, উপর দিয়ে গিয়েছে বিদ্যুতের লাইন। সেতুব গাযে গ্যাস লাইন বসানোর কাজ চলছে।

"এই সেতু বাঙালিব ভাবাবেগকে যে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে ক্রোড়পত্র। টেলিভিশনে সবাসবি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের ভুয়াঘাট—১২০ কিলোমিটার পথে চোখে পড়েছে মানুষের উৎসাহের, আবেগের প্রাবল্য।

"শেখ মুজিবুর রহমান সিবাজগঞ্জে এক জনসভায় এই সেতু নির্মাণেব সিদ্ধান্তে ঘোষণা করেছিলেন। আজ সেই বক্তৃতাব অংশ বিশেষ টেপবেকর্ডারে বাজানো হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। উপস্থিত মানুষ তাতে আবেগাপ্লুত। সেই আবেগকে আবও একটু গভীর করার কাজটি সারলেন শেখ হাসিনা। তিনি ঘোষণা কবলেন, অচিরেই আমরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের পদ্মাসেতু নির্মাণেও উদ্যোগী হব। আমার জাপান সফরের সময় ওই দেশের সরকারের সঙ্গে আমবা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কথা বলেছি। আশা করি, পদ্মাসেতু নির্মাণেও আমবা সফল হব।

"উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিবাই। সাধারণভাবে যাঁদের বলা হয়ে থাকে ভি আই পি। সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁরা দূর থেকে উদ্বোদনী অনুষ্ঠান শুনেছিন। সাধারণ মানুষের অহংবোধে যাতে আঘাত না-লাগে, তাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে সেতু পেরিয়ে সিরাজগঞ্জে জনসভা করেছেন শেখ হাসিনা। শুনিযেছেন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার কথা।"

হায় হায় হায়! আমি কেন মাস তিনেক আগে বগুড়া থেকে ঢাকা গেলাম। বগুড়ায় আবও মাস চারেক কাটিযে যদি ১৭ই জুন বা তাব পরে

ঢাকা যেতাম তাহলে বঙ্গবন্ধুসেতুর উপর দিয়ে ঢাকা যেতে পারতাম। তাহলে ঢাকা যেতে আড়াই ঘন্টা সময় কম লাগতো। কুতর্কী মন বললে, তাহলে যে যমুনার জলে ভাসতে পেতে না, তার কী করছো।

বেলা তিনটের এসে পৌঁছুলাম ঢাকায়, গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে। বাস থেকে নেমে দেখি, ও বাবা! এসে অকুল সমুদ্দুর। বাসস্ট্যান্ডে থেকে বেরোবো কোন দিকে।

কাল রাতে বগুড়া থেকে ঢাকায় বীরেশকে ফোন করেছিলাম। সে বলেছিলো, গাবতলি থেকে, যেভাবেই হোক, লালবাগ আসবেন। সেখান থেকে রিকসায় আমার বাড়ি।

এখন লালবাগ যাই কোন্ বাসে। এক গুমটি-মালিক বললে, খালপাড়ের ,ওই রাস্তায় চলে যান। ওখান থেকে লালবাগ যাওয়ার বাস পাবেন। তার দেখানো দিকে হাঁটা দিলাম এবং অচিরেই খালপাড়ের রাস্তায় এসে হাজির হলাম। কিন্তু যেখানেও অসংখ্য বাস। কোনটি ধরে লালবাগ যাবো।

কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো ভোজপুরি পালোয়ান-পারা একজন পুলিস। মুখখানা তার দাড়িগোঁফে ঢাকা। বললাম, ভাই। লালবাগ যাবো কোন বাসে? পুলিস ভাই বললো, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? বললাম। শুনে বললো, পাশপোর্ট ভিসা করে এসেছেন। না, ব্লাকে এসেছেন? না'ও ঠ্যালা। বুঝলাম কিছু কামাবার তালে আছে আমার পুলিস ভাইডি। বললাম, সব কিছু আছে এখন লালবাগ যাবার বাসখানি দেখিয়ে দিন।

লালবাগে বাস থেকে নামতেই এক রিকসাঅলা এগিয়ে এলো। জানতে চাইলাম সে জগন্নাথ সাহা রোড চেনে কিনা। উত্তরে সে বললো রিকসায় উঠুন।

লালবাগে রিকসায় উঠেই রিকসাঅলার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, আমলী-গোলা আবার কীগো? সেখানে কি তেঁতুলের টকের গোলা আছে কেবল।

আমার কথা শুনে রিকসাঅলা হাসলো। তারপর বললে, না বাবু। আমলী গোলার সঙ্গে তেঁতুল আমলকীর কোন সম্পর্ক নেই। যেখানটায় আপনি আমার রিকসায় উঠলেন তার খানিক দূরে পূব দিকে আছে লালবাগ দুর্গ। সেই লালবাগ দুর্গের পশ্চিম দিকে রয়েছে খুব বড়ো একটা মহল্লা। তারই নাম আমলী গোলা।

— কিন্তু মহল্লাটার নাম আমলী গোলা হোলো কেন?

— সে অনেক কথা, বাবু।

— তা হোক। বলো তুমি।

আমার শোনার আগ্রহ দেখেই হোক, অথবা সে যে ওটা জানে তা জানানোর জন্যেই হোক, রিকসাঅলা বললে, এই মহল্লাটার আসল নাম হচ্ছে আমলীর গোলা। আমাদের মতো মুখ্যুসুখ্যু লোকের মুখে আমীরগোলা কথাটা আমলীগোলা হয়ে গেছে। কিন্তু নিজেকে মুখ্যুসুখ্যু বললেও রিকসাঅলার কথা শুনতে বেশ বুঝেছিলাম ওর পেটে কিছু এলেম আছে। কিন্তু সে কথা বলে ওর বলায় বাধা দিলাম না। ওকে বিব্রতও করলাম না।

রিকসাঅলা বললে, মোঘল শাসন কালে ঢাকা ছিলো সুবে বাংলার রাজধানী। সুবেদারের প্রাসাদ ছিলো কাছেই। তাই এখানে আমীর-ওমরাহদের ইমারত ছিলো। আর সেইজন্যেই এই অঞ্চলের নাম ছিলো আমীরগোলা।

কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার শাসনকর্তা (নায়েব নাজিম) হয়ে রাজধানী তুলে নিয়ে যান মুর্শিদাবাদে। আর আমীর-ওমরাহরা তো মধুলোভী। যেখানে মধু সেখানেই যায় তারা। তাই আমীর ওমরাহরাও ঢাকা ছেড়ে একে একে মুর্শিদাবাদে গিয়ে হাজির হোলো। আর সেই সুযোগে নানা স্থান থেকে বসাক, শীল সাহা, এইসব ব্যবসায়ীরা আমীরগোলায় এসে জাঁকিয়ে বসলো। এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো আমীরগোলায় লোক মুখে যার নাম হোলো আমলীগোলা।

আমরা ততোক্ষণে আমলীগোলা মহল্লায় ঢুকে পড়েছি। রিকসা চলেছে গলি, তস্য গলির ভিতর দিয়ে। উল্টো দিক থেকে আসা রিকসাকে পাশ কাটিয়ে আমাদের রিকসা কী ভাবে এগিয়ে যাবে তাই নিয়ে আমি ভেবে মরছি, এমন সময় রিকসাঅলা মোড় নিয়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা গলিতে এসে উপস্থিত হোলো। বললে এই হোলো আপনার জগন্নাথ সাহা রোড।

রোড ! এই গলিটা রোড। তাহলে গাবতলি থেকে যেপথে লালবাগ এসেছিলাম সেই পথটা কী? রিকসাঅলা বললে এই জগন্নাথ সাহা রোড আমলীগোলার পূর্ব পাশ থেকে মাঝ বরাবর চলে গেছে পশ্চিম পাশ পর্যন্ত। পুরোনো কালে এই রোডের কী নাম ছিলো জানি না। তবে শুনেছি খুব বড়ো ব্যবসায়ী ছিলেন পুষ্পরাজ সাহা। ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকা পৌর সভার একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। সেই সময় তিনি এই রোডের নাম বদলে তার বাবার নামে নামকরণ করেন জগন্নাথ সাহা রোড।

এই তো, বাবু ! আপনার ১০৩ নং জগন্নাথ সাহা রোড ভাড়া মিটিয়ে বিদায় দিলাম রিকসাঅলাকে। বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন বীরেশের স্ত্রী। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বললে আপনাকে আনতেই তো গাবতলী গেছে। আসুন, আপনি ভিতরে আসুন। সকালে স্নান করে নিয়েছি শুনে বললে তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই। খেতে বসুন।

খেতে বসেছি। ভাবছি, বীরেশ আমাকে আনতে গাবতলী গেলো কেন। কাল সে টেলিফোনে আমাকে কীভাবে তার বাড়ি আসতে হবে বিস্তৃত ভাবে বলে দিয়েছিলো। আমিও জানিয়ে ছিলাম বাস স্ট্যান্ডে তার আসার দরকার নেই। তবু আমি ঠিক ঠিক পথ চিনে আসতে পারবো কিনা সেই সংশয় দেখা দিয়েছে তার মনে। তাই আর কিছু না ভেবে সোজা চলে গেছে গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে। কিন্তু কী করে সেই ভিড়ে আমাকে খুঁজে বার করবে। খড়ের গাদায় পড়ে থাকা সূচ কি খুঁজে বার করা যায়। এই সব ভাবছি, এমন সময়

শুনি বারান্দা দিয়ে বীরেশ বলতে বলতে আসছে, না। দেখা হোলো না। আসতে পারেন নি বোধ হয়। কিন্তু খাবার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখেই বীরেশ বলে উঠলো—এই তো এসে পড়েছেন, কাকাবাবু।

খাওয়া শেষ হলে বিশ্রাম নিতে শুলাম একটু। অমনি সুযোগ বুঝে মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে উঠলো। বিভিন্ন কালের বাংলার রাজধানীগুলি লাইন দিয়ে দাঁড়ালো এসে আমার মনের চোখের সম্মুখে। সবার পিছনে দাঁড়ানো পুণ্ড্রনগরকে দেখেই মনে হোলো ইতিহাসের কোন কুয়াসাবৃত উষাকালে বাংলার রাজসিংহাসন স্থাপিত হয়েছিলো এই পুণ্ড্রনগরে। কতো শতাব্দী ধরে সেই রাজসিংহাসন পুণ্ড্রনগরে ছিলো সে হিসেব কে রেখেছে। পুণ্ড্রনগরের পতন হলে রাজসিংহাসন বিক্রমপুর, সোনার গাঁও, গৌড়, মুর্শিদাবাদ, [illegible] আরও কতো নগরে ঘুরে বেড়ালো। তা ঘুরে তো বেড়াবেই। আমাদের ধরিত্রী নিজেই অনবরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাকাল তো কাউকে, এক স্থানে স্থির হতে দেয় না। তাই জীবনও অস্থির। আর এই অস্থিরতা যেমন ব্যষ্টির বেলায়, সমষ্টি বা রাজ্যের বেলায়ও জীবনের স্থৈর্য নেই। কবি বলেন,

"জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে
এক হাটে লও বোঝা
শূন্য করে দাও অন্যহাটে।"

রাজ্যপাটের যে বোঝা মহাকাল নিয়েছিলো একদিন করতোয়ার ঘাটে পুণ্ড্রনগরে, সেই বোঝা শূন্য করেছে অন্য ঘাটে। এমনি করে ঘাটে ঘাটে বোঝা নেওয়া আর শূন্য করে দেওয়া করতে করতে একদিন বুড়ি গঙ্গার ঘাটে ঢাকায় নামিয়ে দিয়েছে রাজধানীর বোঝা। এমনি করেই মানুষের রাজ্যপাটের শোভাযাত্রা চলেছে মহাকালের স্রোত বেয়ে।

তা, এই যে মহাকালের পরিবর্তনের স্রোতবেগে বাংলাদেশ নামের দেশটি এসে হাজির হয়েছে রাজধানী ঢাকা নগরীকে কোলে নিয়ে, এই ঢাকার জন্ম হয়েছিলো কবে।

এই সেরেছে। ঢাকা নগরীর জন্ম হয়েছিলো কবে সেকথা কে বলবে। কেউ তো লিখে রাখে নি সে কথা। আবার, সেকালের কেউ জীবিতও নেই যে বলবে অমুক সালের অমুক তারিখে বেলা এতো ঘটিকায় ঢাকা নগরী জন্ম গ্রহণ করেছিলো।

তবে জনশ্রুতি বলছে, আজ যে স্থানে ঢাকার অবস্থান সেখানে "বাহান্ন বাজার-তিপান্ন গলি" বিশিষ্ট একটা শহর অনেক কাল আগে থেকেই ছিলো। সেই "বাহান্নবাজার-তিপান্নগলি" শহরটা লোকমুখে সংক্ষিপ্ত হয়ে বেন্‌গলা বা বেঙ্গলা হয়ে দাঁড়ায়। ষোড়শ শতকের মেথল্ড নামের এক ইউরোপীয় পর্যটক সেই বেন্‌গলা বা বেঙ্গলা শহর দেখে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে শহরটির উল্লেখ করেছিলেন। শহরটি বুড়ি-গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিলো।

অনেকে বলেন সেই "বাহান্ন বাজার-তিপান্নগলি" শহরের কোন একটি বাজাবের নাম ছিলো ঢাকা। সেই ঢাকা নামই পরবর্তীকালে বেনগলা বা বেঙ্গলা নামকে ছাপিয়ে প্রাধান্য লাভ কবে। নগবীটি ঢাকা নামে পরিচিত হয়।

অবশ্য নগরীটির ঢাকা নাম হওযার পিছনে বেশ কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে সেইসব কাহিনী সত্যের উপর কতোখানি প্রতিষ্ঠিত, আর কতোখানিই বা আষাঢে গালগল্প সেগুলি বলা শক্ত। এইরূপ একটি কাহিনী খুবই শোনা যায। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী বহুযুগ ধবে মাটিব নীচে ঢাকা চিলেন। বাজা বল্লাল সেন সেই ঢাকেশ্ববী দেবীর ঢাকা উন্মোচন কবে এই নগবীতে প্রতিষ্ঠিত কবেন। দেবী ঢাকা ছিলেন বলেই তাঁব নাম হয় ঢাকেশ্ববী এবং ঢাকেশ্ববী ঢাকা ছিলেন এই স্থানে বলে নগবীটিব নাম হয ঢাকা। এইরূপ আবও বেশ কয়েকটি কাহিনী শোনা যায। গল্পগুলি শুনতে ভালোই লাগে।

সম্রাট আকবরেব সময় কয়েকজন ভূমধ্যাধিকাবী বাজা বলে পবিচিত ছিলেন। তাঁবা মোগল শাসনেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই বাজাগণ বারো-ভূঁইয়া নামে পবিচিত হন। এই বারো ভূঁইয়াদেব দমন করার জন্যে আকবব তাঁব বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহকে বাংলাব সুবেদার করে পাঠান। তখন বাংলাব বাজধানী ছিলো বাজমহল। কিন্তু বিদ্রোহীদেব দমন কবা সুবিধে হবে মনে করে মানসিংহ দীর্ঘ কাল ঢাকায অবস্থান করেছিলেন।

জাহাঙ্গীবের বাজত্বকালে বাংলাব সুবেদার হয়ে আসেন ইছলাম খাঁ। তিনিই ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে বাজমহল থেকে বাংলাব বাজধানী তুলে আনলেন ঢাকায। কিন্তু ঢাকা আব ঢাকা থাকলো না। তাব নাম হোলো জাহাঙ্গীর নগব। সেই প্রথম ঢাকা নাম হাবিয়েও বাজধানীব মর্যাদা লাভ কবেছিলো।

ইছলাম খাঁব মৃত্যুর পব বাংলার সুবেদাব হয়ে এলেন কাশিম খাঁ। তাবপব সুবেদাব হল ইব্রাহিম খাঁ। সুবে বাংলাব বাজধানী, সুবেদার পবিবর্তিত হলেও, অপবিবর্তিতই থাকে ঢাকায়। এই সময শাহজাহান বেশ কিছুদিন ঢাকায় কাটিয়েছিলেন। সম্রাট হয়ে শাহজাহান দিল্লি চলে যান এবং বাংলাব সুবেদাব কবে পাঠান পুত্র শাহসুজাকে। এই শাহসুজাই দীর্ঘকাল পবে ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে বাজধানী ঢাকা থেকে আবাব নিযে যান বাজমহলে।

শাহজাহান শেষ বযসে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলে শাহজাহানের পুত্রদেব মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকাব নিয়ে ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দেয় এবং আওবঙ্গজেবেব সেনাপতি মীরজুমলার হাতে সুবে বাংলাব সুবেদার শাহ্‌জাদা শাহসুজা পরাজিত ও নিহত হন। বাংলার সুবেদাব হন মীরজুমলা। তিনি বাজমহল থেকে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে রাজধানী পুনবায নিয়ে এলেন ঢাকায়।

১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুবেদার হয়ে এলেন শায়েস্তা খাঁ। বলা হয তাঁর সময় ঢাকাব চরম উন্নতি হয়েছিলো। ভোগ্যপণ্যের দাম খুবই কমে গিয়েছিলো। এক টাকায নাকি আট মণ চাল পাওয়া যেতো। আনুপাতিক হাবে সব জিনিসেরই দাম খুব নীচে নেমে গিযেছিলো।

জিনিসপত্রেব দামের দৃষ্টান্ত দিয়ে যখন শায়েস্তা খাঁর সুশাসনের জযধ্বনি দেওয়া হয় তখন কিছু কুতর্কী লোকে প্রশ্ন তোলে সাধাবণ মানুষের আর্থিক অবস্থা তখন কেমন ছিলো। আটমণ চাল কেনার মতো টাকা তাদের হাতে ছিলো কি!

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, শায়েস্তা খাঁর সময বাংলায বাণিজ্য চক্রের নিম্নতম পর্যায়, চবম মন্দা অবস্থা দেখা দিয়েছিলো। তখন জিনিসপত্রের উৎপাদন যে বেড়ে অঢেল হয়েছিলো তা নয়। ববং সর্বত্র উৎপাদন বন্ধ হওযায সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কাজ ছিলো না। তাই তাদেব আয়ও গিযেছিলো বন্ধ হয়ে। ফলে সাধাবণ মানুষেব ক্রয় ক্ষমতা গিযেছিলো নষ্ট হযে। আব সাধাবণ মানুষের ক্রয ক্ষমতা না থাকলে জিনিসপত্র কিনবে কী কবে। অপব পক্ষে বিক্রি না হওযায বিক্রেতাবা জিনিসপত্রেব দাম কমাতে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু ক্রেতাদের ক্রযক্ষমতা যদি একেবাবেই না থাকে বিক্রেতারা জিনিসপত্রের দাম নিম্নতম স্তবে নামালেও কেনবাব লোক পায না। শায়েস্তা খাঁর আমলে চালেব দাম এক টাকায় আট মণ হলেও সেই নিম্নতম দামে চাল কেনার ক্ষমতা সাধাবণ লোকেব ছিলো না। দুবেলা দুমুটো ভাতও খেতে পেতো না সেই চরম সস্তাব দিনে। তাই শায়েস্তা খাঁব সময ঢাকাব চরম উন্নতি হযেছিলো বলা নিরর্থক।

সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসব সুবেদাবী কবার পব ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শাযেস্তা খাঁ অবসব গ্রহণ কবেছিলেন। তারপর বাংলাব সুবেদার হন বাহাদুর খাঁ। বাহাদুর খাঁযের পর সুবেদাব নিযুক্ত হন ইব্রাহিম খাঁ। তাবপব আজিম-উস-শান। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আজিম উস্‌-শান্‌কে বিহাবেব সুবেদাব নিযুক্ত করা হয। তখন বাংলার শাসনভার অর্পিত হয় নায়েব নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁর ওপর। মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা থেকে বাজধানী নিযে যান মুর্শিদাবাদে এবং ঢাকাব বাজধানী হওয়াব গৌরব লুপ্ত হয়। অবশ্য বঙ্গ-ভঙ্গেব স্বল্পপরিসব সমযে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে এই সাত বৎসব ঢাকা পূর্ব বাংলা ও আসাম নিযে গঠিত প্রদেশেব রাজধানী হওযার গৌরব লাভ করেছিলো।

অবশ্য সুদীর্ঘ কাল রাজধানী না থাকলেও শিক্ষা সংস্কৃতিতে, শিল্পে সাহিত্যে, ব্যবসা বাণিজ্যে ঢাকার খ্যাতি ছিলো জগৎ জোড়া। সেই কোন প্রাচীন কাল থেকেই ডাকার প্রসিদ্ধি ছিলো মস্‌লিন বস্ত্র বয়নে, কাঁসা ও শাঁখা শিল্পে। জগৎ জোড়া খ্যাতি সম্পন্ন কতো বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, ভাষাবিদ জন্ম গ্রহণ করেছেন ঢাকায বা ঢাকা-সন্নিহিত গ্রাম বা শহরে। এই মনীষীদের জন্মভূমি ও কর্মভূমি রূপে ঢাকা জগৎ-পূজ্য।

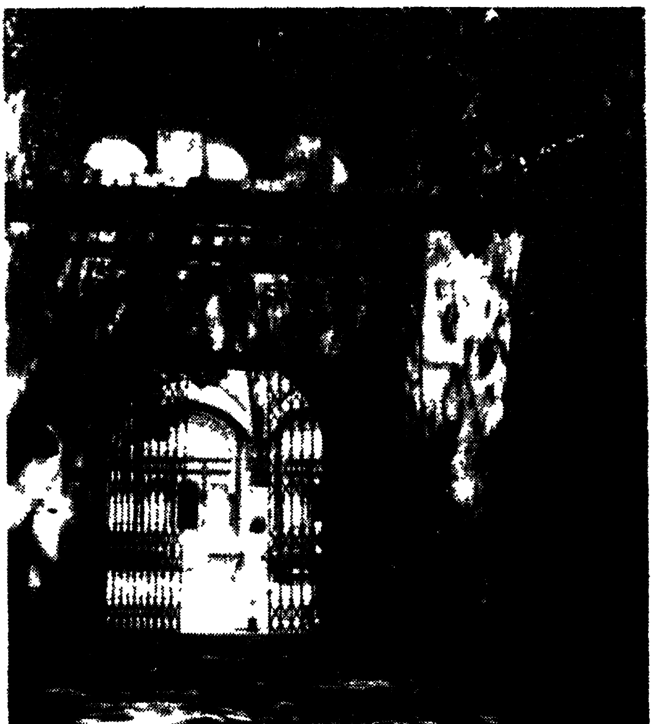
১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভাবত বিভাগের সঙ্গে বাংলাও বিভক্ত হোলো এবং পূর্ব বাংলা পূর্বপাকিস্থান রূপে পাকিস্থানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এই প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। ঢাকা আবাব রাজধানী হওযার গৌবব ফিরে পায।

পূর্বপাকিস্থান পাকিস্থানের কবলমুক্ত হয়ে "বাংলাদেশ" নামে এক

স্বাধীন ও সার্ববৌম রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কবে। এই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাষ্ট্রেব বাজধানী রূপে ঢাকা আবাব স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

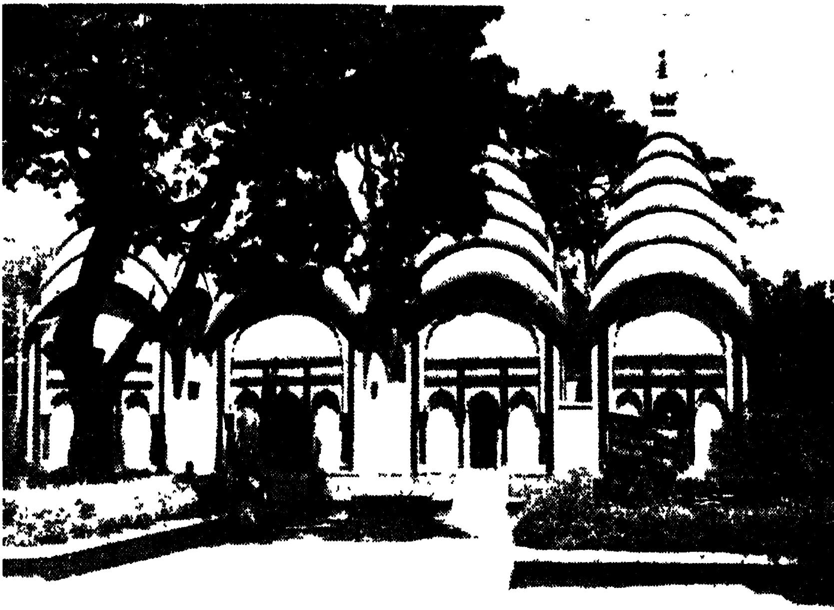
শুয়ে আছি একটু বিশ্রাম নেবো বলে। কিন্তু আমাব মাথাব মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে ঢাকাব জন্ম, ঢাকাব প্রতিষ্ঠা, ঢাকাব বাজধানী হওয়ার গৌবব লাভ, এই সব। এমন সময় বীবেশ এসে বললো, চলুন, কাকাবাবু! ঢাকেশ্বরী মন্দিবে গিয়ে মাকে দর্শন কবে আসি।

বীবেশের সঙ্গে এলাম ঢাকাব লালবাগ অঞ্চলের ঢাকেশ্বরী বোড়ে। এখানেই ঢাকেশ্ববী মন্দিব। ঢাকেশ্বরী মন্দিবের প্রবেশদ্বাবে এসে পৌছুলাম। প্রবেশ দ্বারটি মনোবম। তাব দুইপাশে গাছ। গাছেব ঝিলমিলে ছাযা পড়েছে প্রবেশ দ্বাবে। আন্দোলিত বৌদ্রছাযায অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে প্রবেশদ্বাবটিকে। যেন জীবন চঞ্চল।



ঢাকা—ঢাকেশ্ববী মন্দিবের প্রবেশদ্বার

মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ পার হয়ে সম্মুখে চারটি শিব মন্দির। চারটি মন্দিরই একই মাপের এবং একই রকম দেখতে। প্রত্যেক মন্দিরে একটি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।



ঢাকায ঢাকেশ্বরী মন্দিবেব বাহিবে চত্বরে শিব মন্দিব চতুষ্টয

শিব মন্দিবগুলি দেখে প্রাঙ্গণের ডানপাশে প্রাচীববেষ্টিত পৃথক বাড়িতে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্ববী মন্দিব। গেট দিয়ে প্রবেশ কবলাম সেই বাড়িব মধ্যে। বাড়িব বামপাশে মন্দিব। মন্দিবেব সম্মুখে বিস্তৃত নাটমন্দিব। সুসজ্জিত ও সুবক্ষিত দুর্গেব মতো। মন্দিবকে সুরক্ষিত করতে হযেছে সঙ্গত কাবণেই। মাঝে মাঝেই মাযেব মন্দিব আক্রান্ত হওযাব সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেইসব আক্রমণকে প্রতিহত কবাব জন্যেই মন্দিবকে দুর্গেব ন্যায সুবক্ষিত করতে হযেছে।

মায়েব মন্দিব-দ্বাবে এলাম। মন্দির মধ্যে আটনেব উপর প্রতিষ্ঠিতা শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরীব মূর্তি। দেবী দশভূজা দুর্গামূর্তি। উজ্জ্বল রজত-বর্ণা। মন্দির-অভ্যন্তবের উজ্জ্বল আলো সেই মূর্তিতে প্রতিফলিত। চোখদুটো সজল হয়ে উঠলো মাতৃমূর্তি দর্শনে। মনে পড়লো কমলাকান্তেব মুখে বলা বঙ্কিমচন্দ্রের "চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকাবরূপিনী—অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশ দিকে প্রসাবিত। তাহাতে নানা আয়ুধ নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত বীব জন কেশরী, শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। ... দিগভূজা, নানা



ঢাকা —ঢাকেশ্বরী মন্দিরের শীর্ষদেশ
(বামে)

প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্য রূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ প্রতিমা।"

মাতৃ মূর্তিকে প্রণাম করলাম। তারপর শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী মাতার মন্দির থেকে বার হয়ে এলাম। মূল প্রবেশদ্বারের ডান দিকে মন্দির-কমিটি এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির অফিস। বীরেশ ও শ্রী প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর আহ্বানে গেলাম সেই অফিসে। চায়ে আপ্যায়িত হয়ে শ্রী প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাইলাম শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মা ও তাঁর মন্দির সম্পর্কে। তাঁকে বললাম, আমি এসেছি কলকাতা থেকে। সামান্য লেখালিখি করে থাকি। আর সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি বাংলাদেশ দেখতে। আমি দেবী শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে জানতে চাই আপনার কাছে।

প্রদীপবাবু বললেন, আপনি কী জানতে চান বলুন। আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয়ই জানাবো আপনাকে।

আমি ঃ আপনি কীভাবে এই মন্দিবের সঙ্গে জড়িত।

প্রদীপবাবু ঃ আমি এই মন্দিরে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মায়ের সেবায়েত।

আমি ঃ এই মন্দিব ও মা কখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এইসব সম্পর্ক দয়া করে বলুন।

প্রদীপ বাবু ঃ আমি এই মন্দিব ও মা সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা পুবোপুবি বলতে পাববো না। তবে কিছু কিছু যা আমাব জানার মধ্যে আছে তা আমি বলতে পাববো আপনাকে। এই সব কথা আমাদেব পূর্বপুরুষেব কাছ থেকে পুরুষ-পবম্পবায চলে আসছে। আমি সেই সব কথাই শুনেছি।

শুনেছি যে বাজা বল্লাল সেন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্ববীর মূর্তি মৃত্তিকা খনন কবাব সময় এই অঞ্চলে পেয়েছিলেন। তাবপব তিনিই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবে মন্দিব নির্মাণ কবেন। তখন থেকেই এই মন্দিবেব পূজা-পদ্ধতি একইভাবে পবিচালিত হয়ে আসছে।

আমি ঃ মন্দিব প্রাঙ্গণে চাবটি শিব মন্দিব দেখলাম। ঐ শিব মন্দিবগুলি কখন এবং কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

প্রদীপবাবু ঃ সম্রাট আকবরেব সময বাংলার সুবেদাব হয়ে এসেছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ। বাজা মানসিংহ এই ঢাকা নগবে দীর্ঘকাল থেকে বাবো ভূইযাদেব বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। সেই সময বাজা মানসিংহ এই শিব মন্দিব চাবটি নির্মাণ কবেছিলেন। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, যেখানে শিব সেখানেই শক্তি। আবাব বিপবীতটিও সত্য। যেখানে শক্তি সেখানেই শিব। শিব অর্থে মঙ্গল। আর শক্তিব উদ্দেশ্যই তো মঙ্গল প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই মাতৃমন্দিব ও শিব মন্দিবগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কাবণে আক্রান্ত হয়েছে। সেই সব আক্রমণেব ফলে মন্দিবগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাবপব ক্ষতিগ্রস্থ মন্দিরগুলিকে আমবা পুনবায সংস্কাব কবে নিযেছি। এই ভাবেই চলে আসছে।

এখন শ্রী শ্রী ঢাকেশ্ববী মন্দিবে যে প্রতিমা দেখে এলেন এই প্রতিমা বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত সেই আদি প্রতিমা নয। ভারতের অযোধ্যায বাব্‌বি মসজিদ ভাঙা হলে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা শুরু হয। সেই সময এই মন্দির ভাঙা হয এবং বহু মূল্যবান দেবী প্রতিমাসহ অনেক মূল্যবান দ্রব্য লুঠ হয়ে যায। পরে অবস্থা শান্ত হলে ভক্তগণেব দানে ও সহযোগিতায এই মাতৃমূর্তি ও সিংহাসন আবাব তৈরি করে নেওযা হয়।

আমি ঃ দেবীর সেবা এবং মন্দিবের পবিচালনার জন্য নিশ্চয়ই অনেক টাকার প্রযোজন হয। সেই অর্থের সংস্থান কীভাবে কবা হয?

প্রদীপবাবু ঃ ভক্তগণেব দানেই এই অর্থেব সংস্থান হয। প্রতিদিন এই মন্দিবে আগত ভক্তগণ প্রণামী দেন। সেই প্রণামীব অর্থেই এই মন্দিবেব পরিচালনা ও পূজাব ব্যযের সংস্থান হয।

আমি ঃ শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরীব পুজো সাবা দিনে কতো বাব হয এবং কখন কখন হয?

প্রদীপবাবু ঃ শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মাযের পুজো দিনে তিনবাব হয। সকাল বেলায় যে পুজো হয তাব নাম বালভোগ। দুপুব বেলায মাযেব অন্নভোগ হয়। সন্ধেবেলায হয সন্ধ্যারতি। তাবপব সন্ধ্যাভোগ ও শয়ন।

আমি ঃ দেবীপূজায় পৌবহিত্য কে করেন?

প্রদীপবাবু ঃ পূজাব জন্য তিনজন পুরোহিত আছেন। তিনজন পুরোহিতই মাযের পূজার্চনা করেন। পুরোহিতদেব মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাব নাম অজিত ভট্টাচার্য। তিনিই এই মন্দিরেব প্রধান পুরোহিত। এই তিনজন পুরোহিত ছাড়াও আমি বয়েছি মন্দিরেব সেবাইত। আমি সাধাবণভাবে মন্দিব পরিচালনাব কাজেব দেখাশোনা কবি।

আমি ঃ শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মা নিশ্চয়ই শাক্তদেবী। এখানে দেবীব সম্মুখে পশুবলি দান হয কি?

প্রদীপবাবু ঃ হ্যা। এখানে মাযেব সম্মুখে বলিদান কবা হয। প্রতিদিন না হলেও প্রাযই বলিদান কবা হয। ভক্তদেব অনেকেব মানসিক থাকে। সেই মানসিক শোধ দেবাব সময হলে তাঁবা বলিব পশু আনেন। তখন বলিদান হয। আব প্রতিবছব পযলা বৈশাখ তাবিখে মন্দিবে মাযেব সম্মুখে বলিদানেব প্রথা আছে। তাছাড়া দুর্গানবমীব দিন মন্দিব কর্তৃপক্ষেব তবফ থেকে বলিদান কবা হয।

আমি ঃ এই বলিদান বলতে নিশ্চয়ই ছাগ বলিদান কবা হয।

প্রদীপবাবু ঃ হ্যাঁ। ছাগ, মানে, পাঁঠা বলিদান কবা হয।

আমি ঃ মাযেব মন্দিবে মোষ-বলিদান করা হয় না?

প্রদীপবাবু ঃ মহিষ বলিদানেব প্রথা এককালে ছিলো। আমাদেব পূর্ব পুরুষদের কাছে আমরা শুনে আসছি, আমার বাবাব মুখেও শুনেছি, দেশ বিভাগের আগে এখানে মহিষ বলিদান করা হোতো। ১৯৪৭ সালের পব মহিষ বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে যায।

আমি ঃ শ্রী শ্রী ডাকেশ্বরী মায়ের দেবোত্তব কোন সম্পত্তি আছে?

প্রদীপবাবু ঃ এই মন্দিরের প্রচুব দেবোত্তর সম্পত্তি ছিলো। সে সব সম্পত্তির প্রায় সমস্তই বেহাত হযে গেছে। বিভিন্নভাবে জোর-জবরদস্তি কবে সেই সব সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু সম্পত্তি এখনো আছে।

আর বেহাত হয়ে যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধারেব জন্যে মামলা মোকর্দমাও চলছে।

আমি ঃ মাযেব পূজা ও মন্দির পবিচালনাব কাজে জনসাধাবণকে যুক্ত করা হয কীভাবে?

প্রদীপবাপবু ঃ এখানে মহানগর সার্বজনীন পূজা-কমিটি নামে একটা কমিটি আছে। সম্প্রতি আব একটা কমিটি গঠন কবা হযেছে যাব নাম পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ। এই কমিটি দুটি মন্দিব পবিচালনাব কাজেব সঙ্গে যুক্ত। তাঁবা একদিকে আমাকে পরিচালনায সাহায্য কবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ গর্ভমেন্টেব সঙ্গে যোগাযোগ বাখেন যাতে ঢাকেশ্ববী মন্দিব ভালোভাবে পবিচালিত হয।

আমি ঃ মন্দিবেব সাধাবণ কাজকর্মে ও বক্ষণাবেক্ষণে সবকাবী সাহায্য ও সহানুভূতি কি পাওযা যায?

প্রদীপবাবু ঃ এব আগে যাঁবা সবকাবে ছিলেন তাঁদেব মধ্যে এরশাদ সরকাব একবাবে মন্দিব সংস্কারেব জন্যে কিছু অর্থ সাহায্য কবেছিলেন। তাবপর আমবা সরকাবেব কাছ থেকে কোন প্রকাব অর্থ সাহায্য পাই নি। অবশ্য বর্তমান (শেখ হাসিনা) সরকাবের কাছ থেকে অনুদান হিসেবে কিছু অর্থ পাওযা গেছে। আগামী দিনে আবও কিছু অর্থ দেবে এমন আশ্বাসও বর্তমান সবকাব দিযেছেন।

আমি ঃ ইসলাম সম্প্রদাযভুক্ত উদাব কোন ব্যক্তি বা সংগঠন এই মন্দিব পবিচালনায় সঙ্গে যুক্ত থেকে সহানুভূতি দেখানো অথবা বিরোধিতা না কবার ব্যাপাবে কোন কাজ কবেন কি?

প্রদীপবাবু ঃ ইসলামী কোন সংগঠন এখনো এই কাজে এগিযে আসে নি। কিছু কিছু ভদ্রলোক আছেন, যাঁবা ইসলামী সংগঠনেব সঙ্গেও যুক্ত, তাঁবা চান সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি বজায থাকুক। তাঁবা মাঝে মাঝে এখানে আসনে এবং এই সম্পর্কে নানা আলোচনা কবেন।

প্রদীপবাবুকে আমাব আন্তবিক ধন্যবাদ জানালাম। দেবী শ্রী শ্রী ঢাকেশ্ববীকে প্রণাম কবে বেবিয়ে এলাম মন্দিবাঞ্চল থেকে। বীবেশ বললে, চলুন কাকাবাবু, শ্রীবামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রম দর্শন কবে আসি।

বিকসায চড়ে বসলাম দুজনে। যেতে যেতে এক সময় দেখি আমাদের রিকসা চলেছে বামকৃষ্ণ মিশন বোড ধরে। আমার সমস্ত অন্তব, কেন জানি না, আনন্দে ভরে উঠলো।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দেখবো বলে চলেছি। দেশ বিদেশে যেখানেই গেছি, দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দুই সঙ্গী শ্রীমা সারদা ও স্বামীজী সহ বিরাজ করছেন। তখন বিদেশকে

আর বিদেশ বলে মনে হয় নি। ঠাকুর যেখানে সেখানেই আমার স্বদেশ। এই ভাবনাটা কেমন কবে আমার মনে উদয় হয় কে জানে।

শুনেছি, এই মহল্লাটা খুব পুরোনো। নাম টিকাটুলি। অনেকে বলে টিকিয়াপাড়া। এখানে নাকি এক সময় টিকে বা টিকিযা বানানো হোতো। এই যা! কথাটা বলে তো ফেসাদে পড়লাম। টিকে বা টিকিয়া কথাটা বোঝাই কী করে এখনকার মানুষকে! এখন কার মানুষ তো হুঁকোয় বা গড়গড়ায় ধূমপান করে না। এই ব্যস্ততার যুগে ধূমপান কবতে সিগাবেট বা বিড়ি ফোঁকে। হুঁকো-গড়গডায মৌজ করে তামাক খাওয়াব সময কোথায় এখন। আগের দিনে, যখন দিন চলতো ঢিমে তালে তখন হুঁকো-গড়গড়ায তামাক খাওয়াব প্রথাই প্রচলিত ছিলো। এখনকাব দিনে হুঁকো-গড়গড়ার চল গেছে উঠে। তাই এখনকার মানুযে টিকে কী বস্তু জানবে কী করে।

কাঠকয়লাব গুড়োর সঙ্গে ভাতের মাড় মাখিযে ছোট ছোট চাকতি বানানো হয। সেগুলো বোদে শুকালেই হয টিকে বা টিকিযা। টিকিযায আগুন ধরে তাড়াতাড়ি, কিন্তু পোড়ে গুমরে গুমরে। তাই টিকিযায় আগুন ধরিয়ে চাপানো হয় হুঁকো বা গড়গড়াব মাথায রাখা কলকের ওপর। তারপর ধূমপায়ী হুঁকোর খোলেব ফুটোয মুখ লাগিযে অথবা গড়গড়াব নল মুখে দিয়ে বেশ আয়েশ কবে টানতে থাকে। এইভাবে টিকিয়ার আগুনে তামাক-পোড়া ধোঁয়া পান করতে থাকে ধূমপাযী আরামে চোখবুঝে।

আগেকার ঢিমেতালে-চলা দিনে মানুষের অবসর ছিলো প্রচুর। তখন কাজেব চেযে অবসরটাই ছিলো বেশি। চাই কি, ঘুমিয়ে উঠেও বাবুবা বিশ্রাম করার সময পেতেন। সেই যুগে হুঁকো বা গড়গড়াব জটিল প্রক্রিযায় ধূমপান করা মানাতো। আব সেই জন্যেই টিকিযাব চাহিদা ছিলো। সেই চাহিদা মেটাতে অনেক পরিবাব টিকিয়া তৈবি করতো। টিকিয়া তৈবি করে জীবিকা অর্জন কবতো। টিকিযা তৈবি একটা শিল্প হযে উঠেছিলো। সেই টিকিয়া শিল্পীরা একসময বাস কবতো এই পাড়ায়। তাই এই অঞ্চলের নাম হযেছিলো টিকিয়া পাড়া। অনেকে আবাব টিকাটুলিও বলতো।

এখনকার দ্রুততালের যুগে ধূমপানের আসরটাই গেছে উঠে। সেই সঙ্গে বিদায নিয়েছে হুঁকো ও গড়গড়া। টিকিয়া শিল্প উঠে গেছে এবং শিল্পীরা গেছে হারিয়ে। কিন্তু টিকিযা পাড়া নামটি ঠিক টিকে আছে। এই পাড়াতেই স্থাপিত হযেছে শ্রী শ্রী বামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ। ঠাকুরও তো গড়গড়ায তামাক খেতেন খুব। টিকিয়া দবকার হোতো। পরলোকে স্বর্গবাসী হয়েও তামাক-খোর ঠাকুর নিশ্চয়ই টিকিয়াকে ভুলতে পারেন নি। কে জানে, অন্তরীক্ষ-বাসী ঠাকুব সেই কাবণেই মঠ ও মিশন স্থাপনে টিকিয়া পাডাকে বেছে নিতে ভক্ত-হৃদয়ে প্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন কিনা!

রিকসা থেকে নেমে বিশাল গেট দিয়ে মঠ ও মিশনে ঢুকলাম। তখন সন্ধে উতরে গেছে। ঠাকুবের মন্দিরে সান্ধ্যপ্রার্থনা ও সন্ধ্যারতির অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। মন্দিবে ঠাকুবকে

প্রণাম করলাম। তারপর এলাম অতিথি অভ্যাগত ভক্তদের জন্য বসার ঘরে। একজন তরুণ স্বামীজী আমাদেব নিয়ে এসে সেই ঘরে বসালেন।

ঠাকুরের মন্দিবে, আশ্রমপ্রাঙ্গণ ও উদ্যানে, অতিথি অভ্যাগতদের বসার ঘবে, সর্বত্র ভক্তদেব সমাবেশ। সারাদিনেব পেটের ধান্দায-ঘোবা জীবন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে মুক্তি পেতে এখানে এসেছেন নানাজনে। এই সব মানুষের কথাবার্তা চলাফেরা দেখে খানিকটা যেন অনুভব কবতে পারছি এই ভক্ত সমাবেশে হিন্দু ছাড়াও ইসলাম ধর্মাবলম্বীবা বযেছেন। খ্রীস্টানরা আছেন কিনা নিশ্চিত কবে বলতে পাববো না।

বসাব ঘরে মঠাধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ মহাবাজের আগমনেব অপেক্ষায বসে আছি আমি ও বীরেশ। রযেছেন নানাস্থান থেকে আসা আবও অনেকে। এই অবসরে আমার মন বলতে থাকলো, এখানে সব মতেব, সবপথের মানুষ আসবেই তো। ঠকুব বলতেন না, যতো মত ততো পথ' তাই তো তাঁর সাধন স্থল হযেছ সব মতের মানুষের মিলন স্থল। তা, মানুষ তো ভেঁড়া নয় যে সকলে মিলে একটি মাত্র পথ ধবে চলবে। বুদ্ধি, বিবেচনা, বিচাব শক্তি, এইসব মানুষকে দিয়েছেন ভগবান। তাহলে ভগবানের সেই দানের মর্যাদা বাখবে না মানুষ। স্থান ও কালেব পরিবর্তনেব সঙ্গে তাল মিলিযে নতুন নতুন পথ বানাবে না মানুষ তার বুদ্ধি-বিবেচনা বিচার শক্তি দিয়ে। তাহলে ধর্মমত তো আলাদ আলাদা হতেই পাবে। তা, সেই সব মতকে হেয কবলে চলবে কেন। এক ধর্মমতের মানুষ কেন ভাববে অন্য ধর্মমতটা নীচু! তোমাকে স্বীকার করতেই হবে সব ধর্মমতেব মধ্যেই সত্য আছে। তার কাবণ, ধর্মমত গুলিব পথ ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক। ঠাকুব বলতেন না, নদীগুলি বার হয় নানা সূত্র থেকে। প্রবাহিত হয নানা পথে নানা দেশেব উপব দিযে। কিন্তু মেলে তো সেই এক মহা মিলন স্থলে, মহাসমুদ্রে। তাহলে?

তাহলে প্লেটে সাজিযে দিযে যাওয়া প্রসাদেই মন দেওযা যাক' সেই মহা মিলন স্থলের, মহাসমুদ্রের, কুল যখন পাবো না তখন না-পাওযা অতৃপ্তি আমাকে পোড়ায় কেন। তার চেযে প্রসাদের ফল ও মিষ্টি মুখে পোবা যাক। তাতেও তো কম তৃপ্তি নয়।

স্বামী অক্ষবানন্দজী মহারাজ এসে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। আমরা প্রণাম কবলাম তাঁকে। সেই এক তৃপ্তিতে মন আবাব ভরে উঠলো। স্বামীজীদেব প্রণাম করে আমার মনে হয না কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রণাম করলাম। সেই ঠাকুবকে প্রণাম করলাম সেই তৃপ্তিই মনে আসে। স্বামীজী কেবল মাত্র প্রণাম পাঠিযে দিলেন ঠাকুরেব পদতলে। স্বামীজীরা তো সেই ঠাকুবেরই প্রতিনিধি।

আমার লেখা কয়েকখানা বই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকাব শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-এর লাইব্রেরিকে দেবো বলে। সেই বইগুলি স্বামীজীর হাতে দিলাম। স্বামীজী খুব আগ্রহভরে আমাব হাত থেকে বইগুলি নিলেন। বীরেশ ইতিমধ্যেই আমার সামান্য পরিচয় স্বামীজীকে দিযেছে। তাছাড়া, 'উদ্বোদন'-এ প্রকাশিত আমার কিছু লেখাও ইতিমধ্যে স্বামীজী পড়েছেন। সব মিলিয়ে আমি তাঁব কাছে আর অপবিচিত রইলাম না। স্বামীজী আশ্রমেই আমার

থাকার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু বীরেশেব অভিপ্রায ছিলো ভিন্ন। আমি সামান্য বা তুচ্ছ হলে হবে কি! অতিথিরূপে আমিতো নারায়ণ। সেই নাবায়ণ সেবাব এমন সুযোগ কি কেউ ছাড়ে কখনো।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটায গেলাম বীরেশেব অফিসে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ সময কাটলো। বীরেশেব কাজ দেখতে থাকলাম বসে বসে। কাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয। লোকের সঙ্গে বীরেশেব কথাবার্তা ও ব্যবহার এতোই সুন্দর যে কেউ অসন্তুষ্ট হয় না। টেবিলে ফাইল এর স্তুপও রচিত হয় না। বাইরেব অনেক লোকই আসছেন তার অফিসে। তাঁদেব সঙ্গে আলাপ পরিচযও হচ্ছে। প্রথম পরিচয়ে মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্য মনটাকে মিষ্টি কবে তোলে।

বীরেশ হাতের কাজ দ্রুত সেবে নিযে বললো, চলুন কাকাবাবু, স্যাব-এর অফিসে যাই। আমরা বাংলাদেশ বীমা কর্পোরেশনেব প্রধান অফিসেব উদ্দেশে বার হলাম।

হোসেন মীব মোশার্‌রক খুবই উচ্চপদে আসীন। বাংলাদেশ বীমা কর্পোবেশনেব মহাপ্রবন্ধক (General Manager) তিনি। কিন্তু এই উচ্চপদ তাঁর প্রকৃত পবিচযকে আড়াল করতে পারে নি। তিনি সাহিত্যিক। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদেব জন্যে লেখেন। উচ্চপদেব দায় মেটাতে দিনেব অনেকখানি সময় ব্যয হয় তাঁব। তবু তারই মধ্যে সময় বাব কবে নিযে ছোটদেব জন্যে ভাবেন তিনি। আসলে তাঁব অন্তবে একটা চঞ্চল শিশু খেলা কবে। কখনো সে কৈশোবে উপনীত হযে জীবনের চরম আনন্দটুকু উপভোগ কবে। আবাব ফিবে আসে সরল শৈশবে। অবোধ মনটি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে সীমাবেখা টানে না। পাকা, পরিণত বুদ্ধি বৃদ্ধেবা তাব নাগাল পায না। সেই মন নিয়ে ইতিমধ্যে শিশু ও কিশোবদের উপযোগী সাঁইত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা কবেছেন হোসেন মীব মোশাব্‌বফ সাহেব।

মোশার্‌বফ সাহেবেব অফিসে এসে দেখি, রীতিমতো একটা সাহিত্য সভা বসে গেছে। এসেছেন প্রথিত যশা এক কবি। দুর্ভাগ্য আমাব তাঁব নামটি স্মবণ করতে পাবছি না; এসেছেন আবু হোসেন মীব। আবু হোসেন মীব সাহেব ডেইলি জলছাপ এবং ডেইলি ঠিকানা, একই সঙ্গে এই দুইখানি দৈনিক পত্রিকাব সম্পাদকেব পদ অলংকৃত কবেছেন। তাছাড়াও, তিনি বাংলাদেশ সংবাদপত্র সংঘের অর্গানাইজিং সেক্রেটাবি। বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ এডিটর্স-এবও তিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটাবি। এসেছেন আবও বেশ কযেকজন।

উভয বঙ্গের বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদেব সমস্যা নিয়ে কথা চলছিলো। উল্লেখিত কবি এবং আবু হোসেন মীব সাহেবেব মতে উভয় বঙ্গেই অনেক চিন্তাশীল এবং প্রতিভাশালী কবি ও লেখক রয়েছেন যাঁবা অর্থ ও সুযোগের অভাবে তাঁদের সৃষ্টি পাঠক-পাঠিকাদেব হাতে পৌছে দিতে পারছেন না। এর ফলে লেখকেবা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাসাহিত্য। যে নতুন ফসল উৎপাদন করতে পারতেন এই সব অবহেলিত ও উপেক্ষিত সাহিত্যিকেরা, কিন্তু সুযোগের অভাবে সৃষ্টির পথ পাচ্ছেন না, বাংলা সাহিত্য তাঁদের সেই উৎপাদিত ফসলে সম্পদশালী হয়ে উঠতো। এই ব্যাপারে

দেশের সমাজ ও সরকারের যেমন অনেক কিছু করার আছে, তেমনি অনেক কিছু করার আছে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের। নতুন উঠতি সাহিত্যিকেরা তাঁদের ছাড়িয়ে যেতে পারেন নব নব সৃষ্টিতে, এই আশঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তাঁদের আলোকে আসতে নানাভাবে বাধা দেন। অবশ্যই সকল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক সম্পর্কে এমন কথা বলা যায় না।

প্রকাশক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবেন এইটাই স্বাভাবিক। নতুন লেখকের বই প্রকাশের ব্যাপারে যে ঝুঁকি আছে সেই ঝুঁকি প্রকাশকেরা সাধারণতঃ নিতে চান না।

এই অবস্থায় অনেক সাহিত্যিক ধার-কর্জ করে নিজের লেখা বই প্রকাশ করেন। কিন্তু ছাপানো, বই বাঁধানো ইত্যাদির গলি-খুঁজির সন্ধান নিতে গিয়ে অনেক সময় নানাভাবে অর্থদণ্ড দিতে হয় তাঁদের। তবু, এতোসব কাণ্ড করেও অনেক সাহিত্যিক নিজেই নিজের বই প্রকাশ করেন।

কিন্তু তার পরের সমস্যাটাই সব চেয়ে বড়ো। খানিকটা অনতিক্রমণীয়। এই সমস্যাটি উপস্থিত আলোচকদের মতে, পাঠক-পাঠিকাদের হাতে প্রকাশিত-বই পৌঁছে দেওয়া। আর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্রকাশিত বই পৌঁছে দেওয়াব একমাত্র পথ বইকে বই-বাজারে স্থান করে দেওয়া। সেই কাজটা করতে পারেন পুস্তক প্রকাশন ও পুস্তক বিক্রেতাগণ। কিন্তু তাঁরা প্রতিষ্ঠাহীন সাহিত্যিকদের নাগালের বাইবে।

আমি অবাক হয়ে বসে বসে আলোচনা শুনছি আর ভাবছি এই কবি এবং সাংবাদিকেরা কি আমাব মতো প্রতিষ্ঠাহীন লেখকেব সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছেন। ওঁদের আলোচনার বিষয় শুনে সান্ত্বনা পাচ্ছি সমস্যাটা আমাব একার নয়। আমাব মতো অনেক লেখকই এই সমস্যাব জর্জবিত।

আলোচনা চলছে, এমন সময মোশাব্রক সাহেবেব বাড়ি থেকে ফোন এলো। রিসিভার তুলে মোশার্রক সাহেব বললেন, জানো! এখানে বীরেশবাবু ও কলকাতাব গৌবীশবাবু বযেছেন। আর রয়েছেন বেশ কযেকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাহিত্য ও তার সমস্যা নিযে জোব আলোচনা চলছে। লেখকদের সম্মুখস্থ সমস্যা গুলোব সমাধান করে ছাড়বেন ওঁবা। আলোচনা শুনে আমার তাই তো মনে হচ্ছে। এ্যাঁ। কথা বলবে? নাও, বলো। বিসিভারটা আমার হাতে দিতে দিতে মোশাব্রফ সাহেব বললেন, আমার স্ত্রী, শিরিন সুলতানা, আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি মোশার্রফ সাহেবকে আজ প্রথম দেখলাম। তাঁর স্ত্রী এখনো আমার অদেখা। তবু তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আগ্রহী দেখে মনে হোলো এঁরা আমাকে কতো সম্মানই না জানাচ্ছেন। ফোনে নমস্কার ও কুশল বিনিময় শেষ করে বললাম, শিরিন, আমি এখনো দেখিনি তোমাকে। তবু, একটা নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তোমার সঙ্গে। আমি তোমার বড়ো দাদা এবং তুমি আমার ছোট বোন।

শিরিন সাগ্রহে সম্পর্কটি গ্রহণ করলো। কিন্তু তার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। আলাপে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় হয় নি। তাই ভাই-বোনের সম্পর্ক স্থাপনে সামান্য ভুল হয়েছিলো। পরে অবশ্য সেই ভুল সংশোধনেব সুযোগ পেয়েছি এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে সংশোধনও করেছি।

তাঁর ১৪১ নং উত্তর-যাত্রার বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবার সময় মোশার্‌রফ সাহেব বললেন, আমার মা, মানে আমার স্ত্রীর মা, হৃদ-রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন একটা নার্সিংহোমে। আমার স্ত্রী শিরিন তার মায়ের কাছে সেই নার্সিংহোমেই গেলো এখুনি। শুনে একটু সংকোচ বোধ করলাম। বললাম, তাহলে আপনাব বাড়িব এই অবস্থায় আমাদেব লাঞ্চের ব্যবস্থা করলেন কেন? মোশাব্‌বফ সাহেব বললেন, না না। এই ব্যাপারে কোন অসুবিধেই নেই। শিরিন সমস্ত ব্যবস্থা কবে তার মায়ের জন্যে খাবার নিয়ে কিছু আগে গেছে নার্সিংহোমে।

মোশার্‌রফ সাহেবেব বাড়ি যেতেই শিবিনেব বোন সাহীন ইসলাম মাধুর্যেব একটি হাসির সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। আব মোশারবফ সাহেবেব দ্বিতীয় পুত্র কিশোব বয়েসেব ব্রতী, এগিযে এসে শ্রদ্ধা জানালো আমাকে প্রণাম কবে। ইসলামীদেব মধ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেব উপাযরূপে প্রণাম কবাব নাকি প্রথা নেই। তবু ওদেব প্রথা ভেঙে ব্রতী কেন আমাকে প্রণাম কবলো জানি না। হযতো সকল ধর্মেব উপবে যে ধর্ম সেই মানব ধর্মই প্রতিষ্ঠিত ব্রতীব অন্তবে। তাই যিনি বড়ো, যিনি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁব পদতলে আপন শিব অবনত কবাই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেব শ্রেষ্ঠ উপায বলে মনে কবেছে ব্রতী। কিন্তু ইহ জীবনে সঞ্চিত আমাব তো কোন সুকৃতি নেই। তবু সমস্ত অন্তঃকবণ দিয়ে ওকে আশীবাদ জানিয়ে মনে মনে বললাম, ব্রতী যেন যথার্থ মানুষ হয। প্রসঙ্গতঃ, মোশাবরফ সাহেবেব প্রথম পুত্র জ্যোতি কানাডাব নাগবিক। সে কানাডাতেই থাকে। সাহীন ইসলাম আমাদেব আপ্যাযন করলো দ্বিপ্রাহরিক আহাবের ব্যবস্থা কবে।

মোশার্‌রফ সাহেবের বাড়ি থেকে ফেবাব পথে এলাম লালবাগে। লালবাগ দুর্গ নামেই পবিচিত। যদিও লালবাগকে ঠিক দুর্গ বলা যায় না। আম্‌লী গোলায জগন্নাথ সাহা রোড ছাড়াও আব একটা বাস্তা আছে। সেই রাস্তাব নাম মোহন শীল ষ্ট্রিট। এই মোহন শীল ষ্ট্রিটেব উত্তর দিকে লালবাগ রোড। লালবাগ বোডের দক্ষিণে লালবাগ দুর্গের অবস্থান।

জনশ্রুতি অনুসাবে এক সময এই অঞ্চলে বহুবিস্তৃত এক উদ্যান ছিলো। সেই উদ্যানে ছিলো লাল ফুলের সমারোহ। লালফুলে সারাটি বছরই নাকি সেই উদ্যান লাল হযে থাকতো। আর সেই কারণেই উদ্যানটি লালবাগ নামে পরিচিত হয়।

বাংলার সুবেদার সায়েস্তা খাঁ ১৬৭৮ এবং ১৬৭৯ এই দুই বৎসর ঢাকায় ছিলেন না। সেই সময় বাংলার নায়েব নাজিম ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জদা মুহম্মদ আজম। তিনি ঐ সময় লালবাগ দুর্গের নির্মাণ শুরু কবেন। সম্রাট আওবঙ্গজেবের

ইচ্ছা ছিলো, তাঁর এক পুত্রকে স্থায়ীভাবে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন। সেইজন্যেই তিনি মুহম্মদ আজমকে লালবাগ দুর্গ নির্মাণ কবাব আদেশ দেন।

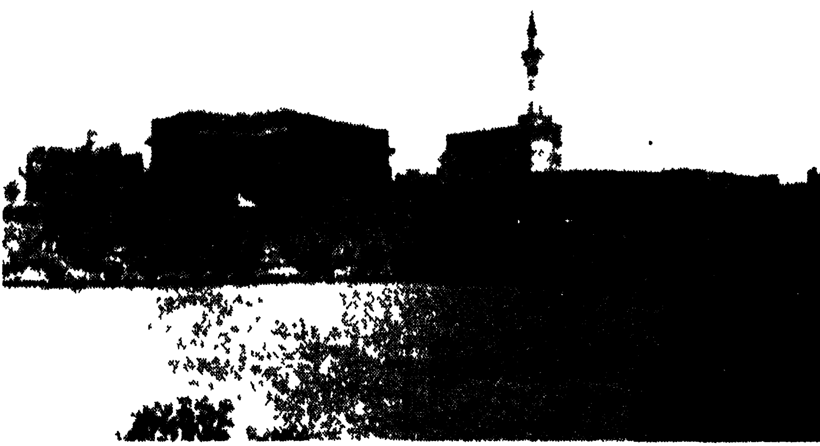
কিন্তু লালবাগ দুর্গের নির্মাণ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই মুহম্মদ আজমের ডাক পড়ে মারাঠাদের দমন করার জন্যে যুদ্ধ করতে। আজমকে ঢাকা ছেড়ে যেতে হয়। সেই সময় সুবেদার শায়েস্তা খাঁ আবার ফিবে এলেন ঢাকায। ঢাকায তিনি ফিবে এলেন বটে, কিন্তু লালবাগ দুর্গ নির্মাণেব প্রতি তাঁর কোন প্রকাব আগ্রহ দেখা গেলো না।



ঢাকা—লালবাগ

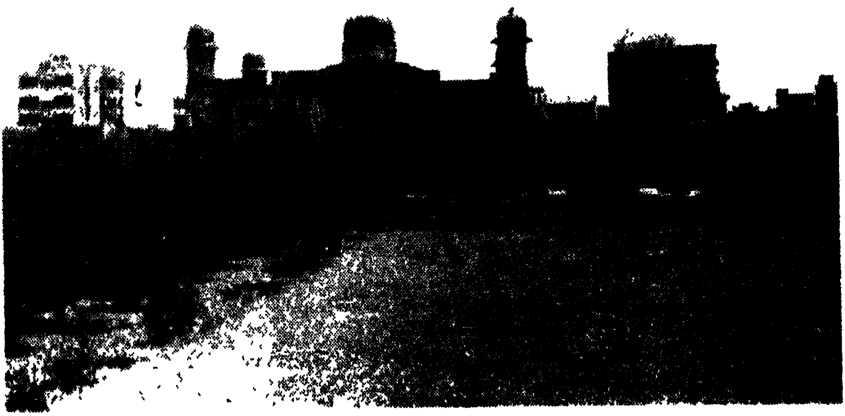
লালবাগ দুর্গ নির্মাণে সায়েস্তা খাঁব আগ্রহ না থাকাব কারণ হিসেবে বলা হয়, তাঁর অতি আদবের কন্যা, পরমা সুন্দরী ইবান দুখ্ত, বা পবী বিবিব বিয়ে হয়েছিলো মুহম্মদ আজমের সঙ্গে। মুহম্মদ আজম এই লালবাগ দুর্গের নির্মাণ শুরু করার ঠিক পরেই পরী বিবির মৃত্যু হয়। তার ফলে, এই লালবাগ দুর্গকে শায়েস্তা খাঁর অপয়া বলে ধারণা হয়। তাই তিনি লালবাগ দুর্গের নির্মাণে আগ্রহী না হয়ে নির্মাণ করলেন পরী বিবির কববের উপর অনুপম এক স্মৃতি সৌধ। এই স্মৃতি সৌধটিই পরী বিবিব সমাধি নামে পরিচিত।

কিন্তু পরীবিবির সমাধি সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ঢাকার ইতিহাস রচয়িতা সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুর। তাঁর মতানুসারে, মীরজুমলা আসাম জয় করার পর আসামের রাজকন্যা নয় বৎসর বয়স্কা রামানি গোবহাককে সঙ্গে নিয়ে যান দিল্লিতে। আওরঙ্গজেব সেই কিশোরী রাজকন্যাকে লালনপালন করেন এবং প্রাপ্ত-বয়স্কা হলে তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে নাম দেন রহমত বানু। পরে মুহম্মদ আজমের সঙ্গে তার বিয়ে দেন। মুহম্মদ আজম তাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঢাকায় এসে রহমতবানু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং মৃত্যু মুখে পতিত হন। রহমত বানু ছিলেন পরীর ন্যায় সুন্দরী। তাই তাঁর সমাধির উপর নির্মিত স্মৃতি সৌধ পরীবিবির কবর নামে পরিচিত হয়।



ঢাকা—লালবাগে পরীবিবির মাজার

লালবাগে রয়েছে প্রধান তিনটি সৌধ। তাদের মধ্যে পরীবিবির স্মৃতি সৌধটিই সবচেয়ে মনোরম। এই সৌধটি নির্মাণের জন্য জয়পুর, চুনার, গয়া প্রভৃতি স্থান থেকে বহু মূল্যবান পাথর আনিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ এবং দিল্লিতে অবস্থিত হুমায়ুনের সমাধি-সৌধের অনুকরণে এই স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন।



ঢাকা -লালবাগে দ্বিতলে হাম্মাম প্রাসাদ

পরীবিবির সমাধিসৌধের সম্মুখে রয়েছে দ্বিতল হাম্মাম প্রাসাদ। এই প্রাসাদের এক তলায় ছিলো হাম্মাম, অর্থাৎ গোসলখানা। এই গোসলখানার জন্যেই সমগ্র প্রাসাদটির নাম হয়ে গেছে হাম্মাম। প্রাসাদের দোতলায় নায়েব নাজিম সাহ্‌জাদা মুহম্মদ আজম প্রজাসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনতেন। এই হাম্মাম প্রাসাদের অবস্থান লালবাগের মধ্যস্থানে। তাছাড়া, অন্য সৌধ গুলির চেয়ে হাম্মাম প্রাসাদ আয়তনেও অনেক বড়ো। তাই হাম্মাম প্রাসাদই লালবাগের অভ্যন্তরে প্রধান প্রাসাদ।

পরীবিবির সমাধিসৌধের বিপরীত দিকে খানিক দূরে রয়েছে তিন গম্বুজ মসজিদ। এই মসজিদও মুহম্মদ আজমের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিলো। মসজিদের সম্মুখে রয়েছে দীর্ঘ একটি টানা বারান্দা।

সম্রাট আওরঙ্গজেব এই দুর্গটি দান করেছিলেন শায়েস্তা খাঁকে। শায়েস্তা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ মালিক হন এই দুর্গের। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার বৃটিশ সরকার এই দুর্গটি ইজারা নিয়ে এখানে সৈন্য-শিবির স্থাপন করেছিলো।



ঢকা---লালবাগ-এ মসজিদ

বর্তমানে লালবাগ বাংলাদেশের জাতীয় সম্পত্তি। বাংলাদেশ সরকারেব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় লালবাগ দুর্গকে একটি যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানে মুঘল আমলের অস্ত্রশস্ত্র, শিল্পদ্রব্য, চিত্র শিল্প, তখনকার ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। লালবাগ প্রাঙ্গণে রচিত উদ্যানগুলি সত্যিই নয়নাভিরাম।

পূর্ব-নিধারিত সময় অনুসাসরে সন্ধে আটটায়, আমি ও বীরেশ এলাম ঢাকা সহরের ফরাশগঞ্জে। ফরাসগঞ্জ নামটির উৎস সম্পর্কে নানাজনকে জিজ্ঞেস করেও ঠিক উত্তর পাই নি। অনেকে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলেছেন এক সময় কিছু ফরাসী-দেশীয় ব্যবসায়ী এখানে ব্যবসার কারণে ছিলেন। আবার অনেকে বলেছেন পারস্যবাসী ব্যবসায়ীদের কথা।

ফরাসগঞ্জের একটা অংশের নাম শ্যামবাজার। তাহলে, কেবল কলকাতাতেই নয়, ঢাকাতেও বাজার করতে এসেছিলো শ্যাম। এখানে আমবা এলাম ঢাকার সুপ্রাচীন ও সুখ্যাত প্রকাশনা "মুক্তধারা" এবং "পুঁথিঘর"-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মশাই এর কাছে। মেশার্‌রফ সাহেব আমাদের আগেই ঠিক সময় মতো এসে পৌছেছেন। মোশার্‌রফ সাহেবের বেশ কয়েক খানা বই "মুক্তধারা" ও "পুঁথিঘর" থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

সুতরাং তাঁর সঙ্গে চিত্তরঞ্জন সাহা মশাই-এর শুধু পরিচয় নয়, যথেষ্ট হৃদ্যতাও আছে। অবশ্য হৃদ্যতার কারণে ঐ সময় মোশার্‌রফ সাহবের আগমন নয়। আমার সঙ্গে সাহা মশাই এর পরিচয় করিয়ে দেওয়াই ছিলো তাঁর ঐ সময় ওখানে আসার আসল উদ্দেশ্য।

পুস্তক প্রকাশের বর্তমান সমস্যা নিয়ে কথা উঠলো। চিত্তরঞ্জন সাহা মশাই বললেন, ভোগবাদের যুগে ভারতে যেমন, বাংলাদেশেও তেমনি, লোকে লেখাপড়া করে জ্ঞানের সাধনা চায় না। তাই বই-এর বদলে অন্য ভোগ্যপণ্য ও বিলাস পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। লোকে বই-এব জন্যে অর্থব্যয় করতে নাবাজ। অবশ্য এই অবস্থা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা দিয়েছে। তাই বর্তমানে লেখক, প্রকাশক এবং তাদেব সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে।

সাহা মশাই আবও বললেন, আমি অবশ্য অস্তগামী সূর্য। তাই প্রকাশনার বর্তমান হাল দেখে ভাবি সাবা জীবন যা নিয়ে কাটলাম সেই পুস্তক প্রকাশও বোধ হয আমাব মতোই অস্ত যাবে। জানি না, পুস্তক-প্রকাশেব পূর্ব গৌববেব দিন গুলো আর কখনো ফিরবে কিনা।

কথাগুলো সাহা মশাই-এর গভীব আন্তব বেদনাবই প্রকাশ। সারা জীবন তিনি পুস্তক প্রকাশ কবেছেন। প্রাচীন ও বর্তমান মনীষীদেব জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে বর্তমান জ্ঞান-তপস্বীদের পবিচয কবিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞানেব জগতে বর্তমানের সঙ্গে প্রাচীনের সেতু বচনা করেছেন। সেই সূত্র, সেই পথ হাবিযে যাওযার আশঙ্কা স্বভাবতঃই গভীব বেদনায় তাঁর হৃদযকে আচ্ছন্ন কবেছে।

''মুক্তধাবা' ও ''পুঁথিঘব'' নামের প্রকাশনা সংস্থাদুটি বর্তমানে যে ভবনে রয়েছে, ৭৪-নং ফবাস গঞ্জের সেই ভবনটি খুবই বড়ো এবং পুবোনো। সেই ভবনের দোতলায় একটি ঘবে নিয়ে এসে এক ভদ্রলোক বললেন, এই ভবনটি মোহিনী মোহন দাসের বাড়ি ছিলো। আর এই ঘবে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন বলে শুনেছি আমরা।

স্বামীজীব ছবি দিযে ঘরখানি সাজানো রয়েছে দেখলাম। ভদ্রলোকেব কথা সত্য হতে পারে। স্বামী গম্ভীরানন্দ বিবচিত ''যুগনাযক বিবেকানন্দ'' (তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩১৫)-এ দেখছি, ''সেখান (নারায়ণ গঞ্জ) হইতে সকালে ট্রেনে চড়িযা অপবাহ্নে ঢাকায় (স্বামীজী) উপস্থিত হইলেন। তখন নগরবাসীর পক্ষ হইতে তথাকাব খ্যাতনামা উকিল শ্রী যুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র ঘোষ মহাশযদ্বয স্বামীজীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিযা ফরাসগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন দাসের বাটীতে লইয়া চলিলেন ।....মোহিনী মোহন বাবুর বাটীতেই স্বামীজীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ....''

পরদিন বীরেশের অফিস থেকে গেলাম মোশাব্‌রক সাহেবের অফিসে। গাড়ি তৈরি হয়েই ছিলো। আমরা তিনজনে যাত্রা করলাম সাভারে জাতীয় স্মৃতি-সৌধ দেখবো বলে। গাড়িটি জাপানি। বাংলাদেশে এখনো আধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে নি। অটোমোবাইল

কারখানা না থাকায় বাংলাদেশ জাপান, আমেরিকা, ভারত, প্রভৃতিদেশ থেকে মোটরগাড়ি আমদানী করে। এইসব দেশের মধ্যে জাপান-ই অটোমোবাইল শিল্পে সবচেয়ে উন্নত ও সর্বাধুনিক মানের মোটর গাড়ি নির্মাণ করে। এই সব গাড়িতে ঝাঁকানি নেই। অপরদিকে আধুনিক ঢাকার রাস্তাও ভালো। আর সর্বশেষ উল্লেখ্য, নিপুণ চালক যুবা-বয়সী মোহম্মদ বেলাল গাড়ি চালাচ্ছে। তাই খুবই কম সময়ে আমরা ঢাকা থেকে তেরো মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাভার- এসে পৌছলাম।

ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সংগমস্থলে সাভার-এর অবস্থান। পূর্ববঙ্গ রেল পথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" নামক গ্রন্থানুসারে পূর্বে এই স্থানে সম্ভার নামে একটি রাজ্য ছিলো। শোনা যায়, রাজা হবিশচন্দ্র এই স্থানে রাজ্য স্থাপন কবেছিলেন। সাভারের পূর্বদিকে বলী-মোহর নামক স্থানে তাঁর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এখানে বলে রাখি, এই রাজা হরিশচন্দ্র পুরাণোক্ত রাজা হবিশচন্দ্র নন।

গাড়িতে বসেই বহুদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, জাতীয় শহীদ স্মৃতি সৌধ উঠে গেছে সুদূব আকাশপানে। আমরা জাতীয় স্মৃতি-সৌধের প্রাঙ্গণে ঢোকার বিশাল গেটের সামনে এসে নামলাম গাড়ি থেকে।

গেট থেকেই দীর্ঘ সোপান শ্রেণী নেমে গেছে, শহীদ স্মৃতি-সৌধেব বিস্তৃত চত্বরে। চত্বরটি অনেক ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলি ক্রমশঃ নেমে গেছে নীচে। দুইপাশে কিছু দূরে দূরে কৃত্রিম জলাশয। তাদের অবকাশে নানা সুদৃশ্য বৃক্ষ। বেশ কয়েকটি আর্কেবিয়া গাছ রয়েছে দুপাশে। তাবাও যেন জাতীয় শহীদ স্মৃতি সৌধের দেখাদেখি আকাশ পানে মাথা তুলেছে।

শহীদ স্মৃতি-সৌধের ঠিক সম্মুখে আয়তাকারের একটা জলাশয়। জলাশয়টিব তল দেশ এবং পাশের দেয়াল গুলির বং নীল বলে জলাশয়ের জলকেও নীল দেখায। সেই নীল জলে শহীদ স্মৃতি সৌধের প্রতিফলন অপূর্ব এক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। বাতাসে অন্দোলিত জলে প্রতিফলিত শহীদ স্মৃতি সৌধটিকে জীবন-চঞ্চল বলে ভুল হয়ে যায়। আবার স্থির জলে প্রতিফলিত শহীদ সৌধকে শিল্পীর আঁকা পট বলে ভ্রম হয়।

শহীদ স্মৃতি সৌধের তলদেশে-এলাম আমরা। দূর থেকে দেখে ভেবেছিলাম শহীদ স্মৃতি সৌধটি বিশাল একটি মোচাকৃতি স্তম্ভ যেটি ভূমি থেকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে উঠে গেছে আকাশ পানে। কাছে এসে দেখি শহীদ স্মৃতি-সৌধ ঠিক সৌধ বলতে যা বোঝায় তা নয়। এটিকে শহীদ স্মৃতি-স্তম্ভ বললেই বোধ হয় ঠিক হয়।

শহীদ স্মৃতি সৌধের গঠনটি বড়ো চমৎকার। সমকোণে সংলগ্ন দুটি সমকোণী ত্রিভূজাকার কংক্রিটের দেয়াল উপরের দিকে ভূমির উপর লম্বভাবে উঠে গেছে। তার ফুট তিন-চাব দূরে অনুরূপ, কিন্তু প্রথমটির চেয়ে উচ্চতর আবার একটি সমকোণী দেয়াল নির্মিত হয়েছে। এমনি করে ক্রমশঃ উচ্চতর পাঁচটি সমকোণী দেয়াল নির্মিত হয়েছে যাদের মাঝখান দিয়ে



ঢাকা--জাতীয় স্মৃতিসৌধ

যাওযা আসা করা যায়। তাবপরেই রয়েছে সর্বোচ্চ দেয়ালটি । সর্বোচ্চ দেয়ালেব পর বিপবীত দিকে ক্রমশঃ নিম্নতর দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এই দেযালগুলিও পরস্পরের অনুরূপ কিন্তু সংলগ্ন নয়। এই সমস্ত দেযালগুলিকে মিলিত ভাবে দূব থেকে একটি মাত্র মোচাকৃতি স্তম্ভ বলে বোধ হয।

কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে রচিত শহীদ স্মৃতি সৌধের মধ্যের অবকাশ গুলি দিয়ে যাতায়াত করলাম। শহীদ স্মৃতি স্তম্ভকে প্রদক্ষিণ কবলাম যেন। এই সময় বিচিত্র একটা অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসলো। হঠাৎই মনে হোলো, এই গুলি কি কঠিন কংক্রিট নির্মিত স্নেহ-মমতাহীন নীরস দেয়াল মাত্র! পাষাণের মতো হৃদয়হীন। না কি তাব উর্ধ্বের, তার অতীতের, মহান কিছুকে প্রকাশ করতে চাইছে। শুনেছি, একলক্ষ মানুষের প্রাণ এবং দুই লক্ষ নারীর ইজ্জতকে বলি দিয়ে পূর্ববঙ্গ মুক্তি অর্জন করেছে পাকিস্থানেব হৃদয়হীন হিংস্র বন্ধন থেকে। সেই সব প্রাণ হারানো মানুষ তো প্রাণবান মানুষ হয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলো। সেই সব ইজ্জত হারানো মা-বোন-কন্যারা ইজ্জতবতী হয়ে মাথা উঁচু করে

সমাজে বেঁচে থাকতে চেয়েচিলো। তবু তারা সর্বাপেক্ষা প্রিয প্রাণ এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ইজ্জতকে বিসর্জন দিয়ে গেলো দেশের মুক্তির জন্যে; মানুষের মুক্তির জন্যে। কোথা থেকে সেই সব নরনারী সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা পেয়েছিলো! তারা কি কবির আশ্বাস বাণী অনুভব করতে পেরেছিলো! তারা কি প্রাণের মাঝে শুনেছিলো—

" উদয়ের পথে শুনি কাব বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তাব ক্ষয নাই।

কিন্তু আজকের আমরা সেই সর্বস্বত্যগীদের জন্যে কী করতে পারি । না, আপাত দৃষ্টিতে তাদের জন্যে কিছুই করতে পারি না। তাই অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাটুকু নিঃশেষ করে প্রণাম জানালাম তাদেব উদ্দেশ্যে কংক্রিটের পাষাণ-কঠিন দেয়ালে মাথা ঠেকিযে। দুইহাত প্রসাবিত করে দোয়া প্রার্থনা করলাম সর্বশক্তি মান অল্লাব কাছে। মনে মনে বললাম, অন্তরীক্ষবাসী-বিদেহীগণ! তোমাদের ত্যাগের দৃষ্টান্ত যেন আজকের ও অনাগত দিনেব মানুষদের প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে মানুষের জন্যে মহত্তর কিছু সাধন করতে। বলতে গিযে চোখ দুটোকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারি না। কেবলই ভবে ওঠে চোখেব জলে।

শহীদ স্মৃতি-সৌধ প্রাঙ্গণে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে আমরা এসে হাজিব হলাম উত্তর-প্রান্তের একটা উদ্যানে। সেখানে সবিস্ময়ে দেখি, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেব মহামান্য ব্যক্তিগণ বৃক্ষরোপণ করে গেছেন আপন হাতে। সব গাছ ও তাদের রোপণ কর্তাব উল্লেখ কবা তো সম্ভব নয়। তাই কয়েকটিব উল্লেখ করছি এখানে। আমাদেব পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহামান্য জ্যোতি বসু রোপণ কবে গেছেন একটি অশোক গাছের চাবা। আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জন মেজব বোপণ কবে গেছেন একটা সিলভাব ওকেব চারা। সিঙ্গাপুরের অধ্যাপক এস জয় কুমার লাগিয়ে গেছেন একটি নাগেশ্বরের চারা। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এস দেবগৌড়া বসিয়ে গেছেন একটা নাগেশ্বর চাঁপা গাছ। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে এসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী রোপণ করেছিলেন একটি বোতল-ব্রাশের চাবা। চারাগাছ রোপণ করে গেছেন প্রায় সব দেশ থেকে আগত রাষ্ট্র নেতাগণ।

গাছগুলি যত্নের মর্যাদা দিয়ে কেমন সুন্দর বেড়ে উঠেছে। দেখলেই বোধ হয় জীবন্ত যেন। মনে হয় এখুনি আমাদের বলে উঠবে, কেমন আছেন! গাছগুলিকে দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা কৌতুক আমার মনের মাঝে উঁকি দিলো। মনে হোলো এইসব বৃক্ষদের রোপণকারী প্রয়াত ও জীবিত রাষ্ট্র নেতাদের যদি একসঙ্গে এই উদ্যানে পেতাম তো বলতাম, হে মহামান্য রাষ্ট্রনেতৃবৃন্দ! আপনাদেরই নিজহস্তে রোপণ করা বৃক্ষগুলি একটি উদ্যানের সামান্য পরিসরে কেমন প্রেম-প্রীতি সৌহার্দ্যের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। আর আপনারা এতো বড়ো স-সাগরা ধরিত্রীর সুবৃহৎ পরিসরে থেকেও পরস্পরের প্রতি প্রীতি

ও ভাব ভালোবাসা বর্ষণে এতো কৃপণ কেন। আসুন এখানে, শরীর থাকলে সশরীরে, না থাকলে সূক্ষ্মদেহে, শিখে যান বৃক্ষদেব কাছে, বিদ্বেষ নয়, প্রেমই প্রকৃত ধর্ম।

এমন সময় মোশার্‌বক সাহেব বললেন, এবাব তাহলে আমাদের ফিরতে হয়। আমার শুধু অন্তরের কথা নয়, উদরের কথাটিও কী করে টের পেলেন মোশারফ্ সাহেব। তাঁর কথার সুবে সুর মিলিয়ে আমারও উদবে একই কথা চলছে। বোধ হয়. বীরেশেরও। তাই দ্বিরুক্তি না কবে আমবা উভয়েই মোশার্‌বফ্ সাহেবের গৃহ-প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করলাম।

মোশারক সাহেবের খাবার টেবিলে মস্ত একটা ভুল সংসোধন করে ফেললাম। নার্সিংহোমে গিয়ে তাঁব শাশুবী ও স্ত্রী শিবিনকে দেখেই বুঝেছিলাম অনিচ্ছাকৃত হলেও ভুল হয়ে গেছে সম্পর্ক স্থাপনে। তাই বললাম, শিরিন। পরশু টেলিফোনে কথা বলার সময় তো সাক্ষাৎ হয নি তোমার সঙ্গে। আবার, তোমাব কণ্ঠস্বব শুনেও বুঝিনি তুমি আমাব বোন হবাব যোগ্য বয়েস অর্জন করেছো কি না। কিন্তু নার্সিংহোমে তোমার মা ও তোমাকে একসঙ্গে দেখে পবিষ্কাব হয়ে গেলো তোমাব মা-ই আমাব বোন হবাব যোগ্য। অবশ্য বয়েসে ছোট হলেও গৌববে আমাব দিদি তিনি। সুতবাং দিদিব মেয়ে কী করে আমাব

শিরিন মাঝপথেই আমাব কথা কেটে দিয়ে বলে উঠলো, আপনি আমাব মামা! বলবেই তো! শিবিন তো শুধু শিবিন নয। শিবিন সুলতানা।

———☆———

নবম অধ্যায়

জয়াগ (নোয়াখালী)

সকাল ন'টায় ঢাকার তোপখানা রোডে 'পালকি' বাস-কাউন্টারে এলাম বীরেশের সঙ্গে। তখনো স্ট্যান্ডে বাস দেওয়া হয়নি। শিগ্রি বাস এসে পড়বে এমন আশ্বাস অবশ্য পেলাম। কী করি। বাসের আসায় বসে থাকা ছাড়া আর করাব-ই বা কী আছে।

প্রায় সাড়ে দশটায় বাস দেওয়া হোলো। যাত্রীরা তৈরি হয়েই ছিলেন সব। স্ট্যান্ডে বাস আসতেই যাত্রীরা বাসে উঠে পড়লেন এবং আপন আপন নির্দিষ্ট সিট্ অধিকার করলেন। আর কালক্ষেপ না করে বাসও ছেড়ে দিলো।

কাল সন্ধের সময় গিয়েছিলাম মহামান্য বিচার পতি শ্রীযুক্ত দেবেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঢাকার বাড়িতে। তিনিই নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সভাপতি। তাঁর কাছে জেনে নিতে গিয়েছিলাম নোয়াখালীর কোথায় গান্ধী আশ্রমটি আছে। আর কী ভাবেই বা যেতে হবে সেখানে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, দেখা হোলো না তাঁর সঙ্গে। বিশেষ কাজে অন্যত্র গেছেন। গান্ধীজী সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার কপালটাই এইরকম। কোন-না কোন বাধা এসে দাঁড়ায় মাঝখানে। এখানেও ঠিক তাই হোলো। যাঁর কাছে ঠিক ঠিকানা পেতে পারতাম এবং হাতে একখানি পরিচয় পত্র নিয়ে সেই ঠিকানায় যেতে পারতাম তাঁর-ই দেখা পেলাম না।

শেষে যা-হয় হবে গোছের একটা বেপরোয়া ভাব এসে পড়লো। মনটাকে সাহস দিয়ে বললাম, নোয়াখালী যায় এমন একটা বাস ধরে নোয়াখালী চলো। তারপর, কোথায় গান্ধী আশ্রম আছে গো, কোথায় গান্ধী আশ্রম আছে, দেখিয়ে দাও না গো, এমনি করে শুধিয়ে শুধিয়ে হাজির হবো সেখানে। কথায় বলে, শুধিয়ে শুধিয়ে লোকে [illegible] দেশে যেতে পারে। আর আমি গান্ধী রাজার আশ্রমে যেতে পারবো না!

বাস ছুটছে ঢাকা নগরীর রাস্তা ধরে। নামে পালকি হলে কী হবে, আসলে তো বাস। তাই শহর এলাকা পার হতেই যা দেরি। শহরের পথের লোকজন, যানবাহন এড়িয়ে চললো একটু ধীর গতিতে। এখানে শহর এলাকার, এমন কি, রাজধানী ঢাকারও সব এলাকার পথঘাট ভালো নয়। অবশ্য অফিস পাড়া ও ভি আই পি অঞ্চলের কথা আলাদা।

শহর পার হয়েই আমাদের পালকি-বাস হাইওয়ে ধরলো। হাইওয়ে মানে ঢাকা চট্টগ্রাম-কক্স বাজার হাইওয়ে। বাংলাদেশে সর্বত্রই দেখলাম হাইওয়ে গুলির অবস্থা বেশ ভালো। হাইওয়ের দুই পাশে হলুদ দাগ দিয়ে রাস্তার পার্শ্ব-সীমা বেঁধে দেওয়া। যানবাহন যেন সেই গন্ডি পার না হয়। হাইওয়ের মাঝখান বরাবরও হলুদ দাগ। আপ ডাউনের গন্ডি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে হাইওয়ে গুলি দেখে এসেছি তার সঙ্গে বাংলাদেশের এই হাইওয়ে গুলির তুলনা করা ঠিক হবে না। তবে এই রাস্তা গুলি দেখলে আমেরিকার রাস্তাগুলির ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

একে প্রায়-আমেরিকান রাস্তা, তার ওপর জাপানী বাস। আর দেখতে হয়। ঢাকার শহর এলাকাটা কোনরকমে পার হয়ে এসে পালকি-বাস ছুটতে থাকলো উর্ধ্বশ্বাসে। বাস ছাড়তে এবং ঢাকার পথ পার হতে যে দেরিটুকু হয়েছে সেই দেরিটুকু যেন পুষিয়ে নিতে চায়।

বেশ কিছুক্ষণ ছুটে আমাদের বাস এসে হাজির হোলো বিশাল একটা নদীর ধারে। আমার বাড়ি তো রাঢ় অঞ্চলে। কাঁদর এবং কাঁদর তুল্য খড়ি, ব্রহ্মাণী, এই সব নদী দেখতেই অভ্যস্থ। অজয়, আমাদের কাছে নদী নয়, নদ। তাহলে এই নদী তো দৈত্য। নদীর যা বিস্তাব, এপার থেকে ওপারে নজব চলে না। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। নদীর ওপর সেতু রয়েছে। সেই সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের বাস চলেছে ওপারে। নদীর নাম জানতে চাইলাম। সহযাত্রী সংক্ষেপে বললেন, মেঘনা। নদীর নামটা শুনেই মনে পড়লো, সেই কোন ছোট বেলায় ভূগোলে পড়তাম বাংলার নদনদীর কথায় মেঘনার নাম। কী মিষ্টিই না শোনাতো মেঘনা নামটা। বার বার পড়তাম। তাই অনেক নাম গেছি ভুলে। কিন্তু মেঘনা'র নাম ভুলিনি। আজ এতোদিন পরে মেঘনা নদীকে দেখলাম।

মেঘনা পার হয়ে চলেছি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই আমার দিগ্‌ভ্রম হয়ে যাচ্ছে। কোথাও সকালে উঠে দেখি, সূর্য উঠেছে পশ্চিম দিকে। আবার কোথাও দক্ষিণে। সূয্যি ওঠার এই সব ব্যাপার- স্যাপার দেখে শেষ পর্যন্ত বললাম, সূয্যে-ঠাকুর। যে দিকে তোমার খুশি হয়, ওঠো তুমি। আমি তোমাব ওঠাব দিকটার নাম দেবো পূর্ব দিক। তা সে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম যে দিকেই হোক না কেন।

ছুটতে ছুটতে আমাদেব বাস আবার একটা নদীর ধারে এসে হাজির হোলো। এই নদীর ওপরও সেতু রয়েছে। নাম শুনলাম গোমতী। গোমতী! গোমতী তো দ্বারকায় সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সেই মোহনায় স্নান কবলে মোক্ষ লাভ হয শুনে আমি তিন দিন ধরে স্নান কবেছিলাম দ্বাবকায় গিয়ে। সেই গোমতী নদী বাংলাদেশে এলো কী কবে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো গোমতী নামটার ওপর বিশেষ কোন নদী পেটেন্ট নেয নি। এই উপমহাদেশে অন্ততঃ তিনটে গোমতী নদী আছে। ছুটকো-ছাট্‌কা গোমতী নদী কতো গুলো আছে কে জানে!

চৌমুহনীতে এসে বাস থামতে কন্ডাকটব বললে, আপনি এখানে নেমে পড়ুন। তারপর এখানকাব লোকেব কাছে জেনে নিন আপনার গান্ধী আশ্রম কোথায আছে, আর সেখানে যেতে হবে কীভাবে। কন্ডাকটরের কথা মতো নেমে পড়লাম চৌমুহনীতে। নোযাখালী জেলাতেই চৌমুহনী। সুতরাং কেউ-না কেউ হদিশ দিতে পারবে গান্ধী আশ্রমের?

জিজ্ঞেস করতে থাকি চৌমুহনী বাজারের দোকানে দোকানে, দোকানের মালিকদের। কেউ আর বলে না গান্ধী আশ্রমটি কোথায়। কেউ তার ঠিকানা জানে না। অবশেষে এক দোকানে বসা খদ্দের একজন আমার আপাদমস্তক যাচাই করে নিলেন। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কোথা থেকে আসা হচ্ছে জনাবের!

বলালম, কলকাতা থেকে আসছি। শুনেই ভদ্রলোক একটু সম্ভ্রম মেশানো দৃষ্টিতে দেখলেন আমাকে। বললেন, এখানেই অপেক্ষা করুন। তারপর দোকানদারকে বললেন

ওঁকে বামগঞ্জ বা চাটখিলেব বাসে তুলে দেবেন। আমাব দিকে চেযে বললেন, আপনি জযাগ-এ নামবেন। সেখানেই গান্ধী আশ্রম।

বেলা সাড়ে তিনটেব সময জযাগ বাজাবে এসে নামলাম। সেখান থেকে বিকসায গান্ধী আশ্রম। গান্ধী আশ্রম ঢোকাব গেট থেকে বেশ খানিকটা গিযে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট্রেব অফিস। অফিসেব সামনে এসে বিকসা থেকে নামলাম। বিকসা থেকে নেমে বুঝলাম বিকসায আসাব দবকাব ছিলো না।

উঠে এলাম অফিসেব বাবান্দায। বাবান্দাব মেঝেব ওপব তখন কযেক জন মহিলা কিছু একটা দেখছেন। আবও কাছে এসে দেখি এক ভদ্রলোক বাবান্দাব মেজেব ওপব বেছানো একটা কাপডেব ওপব আঁকছেন কিছু একটা। মহিলাবা যতোটা দেখছেন, তাব চেযে কথা বলছেন বেশি। হাসি-মস্কবাও চলছে সেইসঙ্গে। এক মহিলা সবাব পিছনে দাঁডিযে নীববে দেখছেন সেই আঁকা এবং জটলা-কবা মহিলাদেব কথাগুলি স্মিত হাসিব সঙ্গে শুনছেন। মহিলাব পবনে সাদা খদ্দবেব থান। গাযে খদ্দবেব ব্লাউস। কোনও আভবণ নেই শবীবেব কোথাও। চবম সাবল্যেব প্রতিমা।



জয়াগ-নোযাখালী
গান্ধী আশ্রমট্রাস্টেব সম্পাদিকা
শ্রীমতী ঝর্ণাধাবা চৌধুবী

বারান্দায় উঠে আসতেই সেই মহিলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চাইলেন আমার দিকে। হাত জোড় করে নমস্কার জানালাম। বললাম, এই আশ্রমের প্রধানের সঙ্গে একটু দেখা হবে কি?

—বলুন! বলেই আমার হাতের ব্যাগটার দিকে চাইলেন। তারপর আবাব বললেন, আপনি আসুন আমার অপিসে।

অফিসে এসে বললাম, আমি কলকাতা থেকে এসেছি বাংলাদেশ দেখতে। বাংলাদেশেব নানা স্থান ঘুরে আজ এখানে এলাম। মহিলা নীরবে শুনছেন দেখে আরও বললাম, ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালের কথা। সেই সময় দেশ তখনো অবিভক্ত, মহাত্মা গান্ধী তৎকালীন পূর্ববঙ্গেব এই নোয়াখালী জেলায় এসেছিলেন এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালীর দাঙ্গারতদেব কাছে শান্তিব আবেদন এবং দাঙ্গা পীড়িতদেব কাছে নিবাময়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তখন সেই ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে কিশোর বয়স্ক আমি মহাত্মাজীব সহচরদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম এখানে। কিন্তু বিধি ছিলেন বাম। তাই হঠাৎ-ই আক্রান্ত হযেছিলাম ম্যালেবিয়ায। আমার আসা হয নি তখন। মহাত্মাজীব কাজে আমার আত্ম-নিবেদনেব সৌভাগ্য তখন হয নি। সেই দুঃখ আমাব সঙ্গী হয়ে আছে জীবন ভর।

তাবপর দীর্ঘ বাহান্নোটি বছব কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাব বিশাল একটা ভাগ হযে গেলো পূর্ব পাকিস্থান। যা আমাব স্বদেশেব অঙ্গ ছিলো অপবিণামদর্শী নিষ্ঠুব বাজনীতিকদেব খড়্গাঘাতে খণ্ডিত হযে সেই অঙ্গ হয়ে গেলো পবদেশ। তবু আমি আকর্যণ বোধ কবি নোযাখালীব জন্যে। তাই বাংলাদেশ দেখতে এসে স্থিব কবলাম, আব কোথাও যদি না-ও যেতে পাবি, নোযাখালী দেখতে যাবোই।

আমাব আবেগময় কথাগুলি শুনে, মহিলা বোধহয় মুগ্ধ হলেন একটু। বললেন, আমার নাম ঝর্ণাধাবা চৌধুরী। আমি সাধাবণ সম্পাদিকা হিসেবে জয়াগের এই গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টেব পবিচালনাব দাযিত্ব ভাব মাথায় তুলে নিযেছি। কিন্তু এখন আব কথা নয়। আপনি আমাদেব অতিথি ভবনে গিযে হাত মুখ ধুয়ে আসুন। দুপুবে নিশ্চযই খাওয়া হয নি। এসে দুটি ভাত খেযে নিন।

শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধাবাব নির্দেশে একজন মহিলা কর্মী আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিলেন এবং মূল বাড়িব বামপাশের দালানে দোতলায নিযে গেলেন। তাকে অনুসরণ করে আমিও এলাম সেই দোতলার বারান্দায়। তাবপব একটি ঘব খুলে দিযে বললেন, এই আপনার ঘর। আপনি এই ঘরে থাকবেন।

খাট-বিচানা টেবিল-চেযাব-আলনায সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ। লাগোয়া স্নান কক্ষেইউরোপীয় ব্যবস্থা। ঢাকায় স্নান করে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এই স্নানকক্ষের সুব্যবস্থা দেখে আর একবাব স্নান করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

মূলবাড়ির পিছনেই রান্নঘর এবং তার লাগোয়া খাবার ঘর। রান্নাঘর ও খাবার ঘর দেখে মনে হোলো নিশ্চয়ই কাঠের জ্বালে রান্না হয়। তাই চিরকেলে বাঙালি রান্নাঘরের মতো দেয়াল ও ঘরের সিলিং -এ রং ধরেছে ধোঁওয়ার। এমনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের রান্না ঘরে

বারান্দায় ছোট বেলায় আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম। কোরোসিনের 'লম্ফ' -র আলোর চেয়ে অন্ধাকারটাই জমতো বেশি। খাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্য টেবিল চেয়ারে এখানে।

এখানে পরিবেশনের ক্ষেত্রে দেখি 'বুফে' ব্যবস্থা। খাবাব টেবিলের মাঝে লাইন দিয়ে ভাত-ডাল-তরকারির গামলাগুলি সাজানো। প্রত্যেক গামলার আছে হাতা বা বড়ো চামচ। তুমি নিজেই তোমার প্রয়োজন মতো খাবার থালায় তুলে নাও ভাত-ডাল-তরকারি-চাটনি। আমাকে অবশ্য 'বুফে' ব্যবস্থায় খেতে হোলো না। হযতো আমি এখন একা একা খাচ্ছি বলে। থালায় ভাত বেড়ে এবং তার চারপাশে তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এলেন যে মহিলাগণ রান্না করেন তাঁদের একজন। শ্রীযুক্তা ঝর্ণধারা এসে আমার সম্মুখে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। সেই যে কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কথাটার একটা ভালো অর্থও তো করা যায়। মা-বোনের জাত যেখানেই থাকুন সামনে বসেই খাওয়াবেন তাঁরা।

চৈত্র শেষের বেলা ফুরোতে চায় না। বেরোলাম আশ্রম খানির চারিপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে। আশ্রমের চারিধারে অনেক জমি। তার মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো অনেক পুকুর। যেন ছোটো খাটো মৌজা একখানি। জমিতে জমিতে উচ্চ ফলনশীল বোড়ো ধানেব চারা রোপণ করা হয়েছে। চারাগুলি ঘন-সবুজ রং নিয়ে বেড়ে উঠছে সতেজে। সামনেব দিকে কিছু জমিতে চাষ করা হয়েছে বেগুন, টম্যাটো, করলা, ঝিঙে, পেঁপে। করলা খুব ফলেছে। ছেয়ে আছে জমিগুলি। টম্যাটোও কম যায় না। পুকুরে পুকুরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করা হয়েছে মাছের।

আশ্রমের ঘরবাড়ির লাগোয়া আম-জাম-কাঠাল-সুপুরি নারকেল বাগান। বাগানেব গাছেরা আশ্রমের ঘরবাড়িকে যেন ছায়ায ঘিরে রেখেছে। প্রধান বাড়িটির সামনে কিছু ফুলের গাছ এলোমেলো ভাবে বেড়ে উঠেছে।

ঘুবে ঘুবে আশ্রমকে দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুড়িয়ে এলো। সন্ধে ঘনিয়ে এলো দেখে আমাব দু'দিনের ঘবখানিতে এসে বসলাম। ক্লান্ত দেহটি বিছানায় এলিয়ে পড়তে চাইছে। এমন সময় সমবেত কণ্ঠের "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" গানখানি ভেসে এলো। এককালে প্রার্থনা সভায বসে আমিও নিষ্ঠার সঙ্গে এই গানখানি গাইতাম। গান বলতাম না, বলতাম রামধুন। পাযে পাযে এগোতে থাকলাম রামধুনের সুব অনুসবণ কবে।

গান্ধী আশ্রযেব মূল বাড়ির সম্মুখের বারান্দার বাঁ পাশে শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারার অফি ঘব। এখানে এসেই সেই ঘবে গিয়ে বসেছিলাম। ডানপাশে, সেই অফিস ঘরেব বিপরীতে, রয়েছে অনুরূপ আব একখানি ঘর। এই ঘরটিব দিকে তখন চোখ পড়েনি। সেই ঘবেই প্রার্থনা হচ্ছে। তাই শুনে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। প্রার্থনা-রত ঝর্ণাধারা চোখেব ইশারায় ভিতরে এসে আসনে বসতে বললেন।

গান্ধীজীর প্রচলন করা প্রার্থনা সভার সঙ্গে আজও কেমন যেন একটা হার্দিক যোগ অনুভব করি। সেই কিশোর-বয়সে স্বাধীনতা-সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিলাম। ধীবে ধীরে সেই সংগ্রামকে গ্রহণ করেছিলাম জীবনের ব্রতরূপে। গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে গ্রামোন্নয়নই গ্রামময় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত পথ বলে আমার বিশ্বাস হয়েছিলো তখন। ধারণা হয়েছিলো, গ্রামের মানুষেরা যদি চরিত্রবান হয়ে ওঠে, যদি গান্ধীজীর একাদশব্রত—

অহিংসা, সত্য, অস্তেয, ব্রহ্মচর্য অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, আস্বাদ, সর্বত্র ভয়বর্জন, সর্বধর্মে-সমানত্ব, স্বদেশী স্পর্শভাবনা, অস্পশ্যতা বর্জন—গ্রামেব মানুষগুলি যদি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে, তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্যপ্রকারর সংগ্রামের প্রয়োজন হয় না। ববীন্দ্রনাথের ভাবতবর্ষ পর্যায়ে 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে অন্যভাবে বলা একই কথা পড়েছি পরবর্তীকালে। গান্ধীজীব একাদশ ব্রত জীবনে সফল কবাই তো প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রাম। মানুষ যদি স্বাবলম্বী হয়, যদি কোন অবস্থাতেই পরের ওপর নির্ভব না করতে হয, তাহলে মানুষেব সেই অবস্থাকেই তো স্বাধীনতা বলে।

কৈশোরে কল্পনার-বঙে-রাঙানো সেই দিনগুলিতে সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাটা কোথায় ধবতে পারতাম না। তখন বুঝতাম না, গান্ধীজীব একাদশ ব্রত পালন কবে জীবন গড়া এবং সেই পথে স্বাধীনতা অর্জন করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনেব কতো উর্ধ্বে। তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষেব পক্ষে সেই উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা কতোখানি অসম্ভব।

রামধুন শেষে দুখানি ভক্তি মূলক গান গাইলেন দুজন মহিলা। তারপর গীতাব দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে খানিকটা অংশ পাঠ করলেন শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারা। প্রার্থনাব অঙ্গগুলি শুনতে শুনতে প্রাক স্বাধীনতাব সেই দিনগুলিব কথা আমার মনে পড়ছে। গীতাব যে অংশ পাঠ কবছেন ঝর্ণাধাবা সেই দ্বিতীয অধ্যাযের পুবো অংশটাই এক সময আমাব মুখস্থ হযে গিযেছিলো।

গীতা পাঠ শেষে প্রার্থনা শেষ হোলো। চোখ মেলে দেখি, সম্মুখে গান্দীজীর জীবন মাপের তৈলচিত্র দেযালে ঠেস দিয়ে বাখা। নোযাখালী জেলায় পদযাত্রার সময কোন একদিন গান্দীজী বাঁশের একটা পুলেব ওপব দিয়ে নালা পাব হচ্ছিলেন। সেই দৃশ্যটি ক্যামেবাব সাহায্যে ধরে রাখা হযেছিলো। কোন এক চিত্রশিল্পী সেই আলোক চিত্রটি অবলম্বন কবে এই তৈল চিত্রখানি এঁকেছেন। চিত্র শিল্পীর নামটি লিখে রাখিনি। সেই ফাঁকে "তোমাব সৃষ্টিব চেযে তুমি যে মহৎ" শিল্পীর নাম বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে।

পাশেই পাতা একখানি খাট। খাটেব ওপর পাতা গদি-তোশক-বালিশ। শুভ্র চাদরে ঢাকা। তার ওপর সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো একখানি আলোকচিত্র। আলোকচিত্র প্রয়াত চারু চৌধুরীব। এই চারু চৌধুবীর পরিচয় জানতে চাইলাম, যদিও তাঁর পরিচয় আগেই আমার জানা উচিত ছিলো। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঝর্ণাধারার ডাক এলো বলে তখন চারু চৌধুরীর পরিচয় জানা হোলো না। পরে জেনেছি, ঝর্ণাধারাব মুখে নয়, শ্রদ্ধাস্পদ চারু চৌধুবীর অনন্ত শয্যা থেকে।

পরদিন ভোরে উঠে প্রাতঃভ্রমণের নামে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম আশ্রম এলাকা ছাড়িয়ে, জয়াগ বাজার পেরিয়ে, একেবারে মাঠেব ধারে। ফেরার পথে গেট দিয়ে আশ্রমে ঢুকতেই দেখি বাঁ দিকে রয়েছে চারু চৌধুরীর সমাধি। সমাধি ফলকে লেখা ঃ "তিনি এসেছিলেন ১৯৪৬ ইং-এব ৭ই নভেম্বর গান্দীজীর সাথে শান্তির অন্বেষায়। নোয়াখালী ছেড়ে যাবার সময় বাপুজী বললেন 'চারু! তুমি থাক। আমি তো আবার আসব।'

রযে গেলেন তিনি। সে যে আসে আসে আসে।"

একটু নজর করে দেখি, ডান দিকের স্মৃতি মন্দিবের ফলকে লেখা নাম-শরৎ সুন্দরী নাগ, আর বাঁ দিকেব স্মৃতি মন্দিরের ফলকে লেখা নাম—নবকৃষ্ণ সবকাব। তাঁদেব জন্ম মৃত্যুর তারিখ গুলির লেখা এমনি বিকৃত করা হয়েছে যে পড়া যায় না। মনে হোলো, এই তো ভালো। থাকো তোমবা জন্ম মৃত্যুহীন অজেয়-অমর হয়ে।



জযাগ-নোয়াখালী
গান্ধী আশ্রমের প্রবেশপথের বামে
নবকৃষ্ণ সরকারের স্মৃতি মন্দির

গেট দিয়ে আশ্রমে ঢুকতেই চারু চৌধুরী এবং দেবেন্দ্র নারায়ণ সবকাব ও মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সমাধি। তাঁদের সমাধি ফলকে লেখাগুলি সহ সমাধি দুটির কথা আগেই বলা হয়েছে।

গেট থেকেই লাল ইট বেছানো পথ। সেই পথ ধরে এগোলে বাঁদিকে তাঁত ও অন্যান্য কুটির শিল্পের দীর্ঘ কারখানা ঘর। সেখানে বসানো হয়েছে খান কয়েক কাপড় বোনা তাঁত, চরখা, রং-করার সরঞ্জাম, এইসব। ডান পাশে ফসলের জমি। জমিতে কবলা, টম্যাটো, বেগুন, পেঁপে। কিছু জমিতে ধানের চারা।

আশ্রমের ভিতর দিকে আরও এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে আম জাম কাঠাল নারকেল সুপারির বিস্তৃত বাগান। আর ডান দিকে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট পরিচালিত "মদন মোহন-

দেবেন্দ্র নাবায়ণ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।" বিদ্যালয় ভবনটি দোতলা। বিদ্যালয়টি প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অবশ্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব একটা উল্লেখ যোগ্য নয়। বর্তমানে সব শ্রেণী মিলে সর্ব সাকুল্যে মাত্র পঞ্চাশ জন। তাদেব পড়ানোর জন্যে আছেন দুইজন শিক্ষক এবং চারজন শিক্ষিকা। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণেব শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচয়— একজন বি এ বিটি, একজন বি এস্ সি বি টি, তিনজন সাধাবণ বি এ এবং বি এস সি, একজন আই এ। শিক্ষক শিক্ষিকাদেব বেতন দেওয়া হয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে।

ছাত্রছাত্রীদেবও আর্থিক সাহায্য কবা হয। তাদেব বাড়ির অবস্থা, লেখা পড়ায় আগ্রহ, বার্ষিক পরীক্ষার ফল এবং বিদ্যালযে উপস্থিতি বিচার করে পঁচিশ জন ছাত্রীকে মাসিক একশো পঁচিশ টাকা কবে উপবৃত্তি (Stipend) দেওয়া হয়। বিদ্যালযের সকল প্রকার ব্যয়ভার বহন করে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট।

না, সবকাবী সাহায্য নেওযা হয় না। সরকারী সাহায্য নিলে বিদ্যালয়েব জমি-বাড়ি-আসবাব সরকারকে রেজেস্ট্রি করে দিতে হবে। জমি ও বাড়ি আশ্রম এলাকায় রয়েছে। সেই জমি ও বাড়ি সবকাবকে রেজেস্ট্রি করে দিলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সরকারের আইন অনুসারে গঠন করতে হবে। ফলে কমিটিতে স্থান করে নেবে অনেক লোক যারা আশ্রম এলাকার জমির দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলেই আছে। এমনিতেই অনেক সময তারা জমি এমন কি বাড়ি ঘবও জবর দখল করতে এগিযে আসে। ম্যানেজিং কমিটিতে স্থান পেলে তো কথাই নেই। আশ্রমের ওপর হামলা বাড়তেই থাকবে। খাল কেটে কুমীব আনাব ব্যাপাব হবে। এই সব বিবেচনা কবে সবকারী সাহায্য নেওয়া হয না।

বিদ্যালযেব গায়েই অতিথি ভবন। অতিথি ভবনটি দোতলা। নীচে তিনখানি এবং উপবে তিনখানি, মোট ছযখানি ঘব অতিথি অভ্যাগতদেব জন্য বাখা হযেছে।

সম্মুখে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টেব মূল বাড়ি। বাড়িটি দোতলা, পুবানো আমলেব সাবেকি ধাঁচেব বাড়ি। সম্মুখে বেরিযে আসা অর্ধ চন্দ্রকাব বারান্দা। বাবান্দার দুপাশে সুসংগত দুখানি ঘর। বাঁপাশেরটি শ্রীযুক্ত ঝর্ণাধারার অফিস ঘর এবং ডান দিকেরটি প্রার্থনা কক্ষ। মাঝে বিশাল হলঘর। হলঘরে টেবিল-চেয়াব-আলমারি দিয়ে সাজানো সাধারণ অফিস। এই বিশাল অফিস ঘরের পাশে ছোট ছোট বেশ কযেক খানি পার্শ্ব কক্ষ, স্নানকক্ষ ইত্যাদি। বাড়িব একতলা অনুরূপ দোতলাটিও। সেখানে আশ্রমেব মহিলা কর্মীরা থাকেন।

এই মূল বাড়ির বাঁপাশে বান্না ও খাবার ঘর। তাব পিছনে আছে গোশালা। সেখানে পুষ্টদেহী সবৎসা কযেকটি গাড়ীর বাস। এই সবের পিছনে আছে মাঠভর্তি জমি ও পুকুর।

এইসব মিলিয়ে আশ্রমখানি যেন একখানি গ্রাম বা মৌজা যার মাঝখানে আছে গ্রামবাসীদের বাড়ি ঘর। আর বাড়িঘরকে ঘিরে চাষ আবাদের জমি পুকুর বাগান। সব মিলিযে গান্ধী আশ্রমের আয়তন কতোখানি জানি না। জানার চেষ্টাও করি নি।



জয়াগ—নোয়াখালী
গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট ভবন

শুনলাম জয়াগ গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের মূল সাবেকি ধাঁচের দোতলা বিশাল বাড়িটি আর চারি দিকের বহু বিস্তৃত অঞ্চলের জমি পুকুর বাগান মিলিয়ে যে ভূসম্পত্তি তার মালিক ছিলেন নোয়খালী জেলার প্রথম ব্যারিস্টার আশুতোষ ঘোষ মহাশয়। ১৯৪৬ এর শেষ থেকে দাঙ্গাপীড়িত নোয়াখালী জেলার বহুগ্রাম পদব্রজে ভ্রমণ করতে করতে ১৯৪৭ এর ২৯শে জানুয়ারী গান্ধীজী এসেছিলেন জয়াগ-এ। এখানে আয়োজিত এক জনসভায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিকামী মানুষের কাছে হিংসার পথ পরিহার করে শান্তির পথ গ্রহণের আবেদন করেছিলেন অহিংসার প্রতীক মাহাত্মা গান্ধী। ঐ দিনের (২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৭) সেই সভায় ব্যারিস্টার আশুতোষ ঘোষ মহাশয় তাঁর বাড়ি ঘর সহ সমস্ত ভূসম্পত্তি গান্ধীজীকে দান করেছিলেন জয়াগে আশ্রম প্রতিষ্ঠার অভিলাষ জানিয়ে। সেই শুরু হয়েছিলো জয়াগে গান্ধীজীর আদর্শে গ্রাম সংগঠনের উদ্দেশ্যে আশ্রম। গান্ধীজীর আদর্শকে রূপ দিতে এবং এই বিশাল ভূসম্পত্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরে গঠিত হয় গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট। এই গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টে বর্তমান সভাপতি মহামানা বিচারপতি শ্রীযুক্ত দেবেশ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারা চৌধুরী।

গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের মূল বাড়ির সামনের বারান্দার দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বিশাল আকাবের কাঠেব একখানা বোর্ড। স্কুল বা কলেজেব ক্লাশে ক্লাশে যেমন ব্লাক বোর্ড থাকে তেমনি। সেই বোর্ডে লেখা বয়েছে, গান্ধীজী ২রা জানুয়ারী ১৯৪৭ থেকে ২৪শে ফেব্রুয়াবী, ১৯৪৭, পর্যন্ত এই চুয়ান্ন দিন ধরে নোযাখালী জেলার গ্রামে গ্রামে পদব্রজে পরিক্রমা কবেছিলেন। তারিখ সহ নোযাখালীতে গান্ধীজীব অবস্থান-ধন্য গ্রাম সমূহেব তালিকা দেওযা আছে বাবান্দায় টাঙানো সেই বোর্ডে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃতি-যোগ্য বলেই নীচে দেওযা হোলো।

নোয়াখালী গান্দীজীর অবস্থানধন্য গ্রামসমূহ

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রামেব নাম	ইউনিযন	থানা	জেলা	তারিখ
১।	চণ্ডীপুব	চণ্ডীপুব-৬নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২ ১ ৪৭ থেকে ৬ ১ ৪৭ পর্য্যন্ত
২।	মাছিমপুব	চণ্ডীপুব-৬নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	৭ ১ ৪৭
৩।	ফতেপুব	চণ্ডীপুব-৬নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	৮ ১ ৪৭
৪।	দাসপাড়া	লামচব-৭নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	৯ ১ ৪৭
৫	জগৎপুব	জগৎপুব-৮নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	১০,১ ৪৭
৬।	লামচব	লামচব ৭নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	১১ ১ ৪৭
৭।	কবপাড়া	কবপাড়া-৯নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	১২ ১ ৪৭
৮।	সাহাপুব	সাহাপুব-১০নং	চাটখিল	নোযাখালী	১৩ ১ ৪৭
৯।	ভাটিযালপাড়া	কবপাড়া-৯নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	১৪ ১ ৪৭
১০।	নাবাযণপুব	সাহাপুব-১০নং	চাটখিল	নোযাখালী	১৫ ১ ৪৭
১১।	বামদেবপুব	সাহাপুব ১০নং	চাটখিল	নোযাখালী	১৬ ১ ৪৭
১২।	পবকোট	দশঘবিযা	চাটখিল	নোযাখালী	১৭ ১ ৪৭
১৩।	বদলকোট	বদলকোট	চাটখিল	নোযাখালী	১৮.১.৪৭
১৪।	আতাছোড়া	ভোলাকোট-১৩নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	১৯ ১.৪৭
১৫।	শিবন্দী	ভোলাকোট-১৩ নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২০ ১.৪৭
১৬।	কেতুবী	ভোলাকোট-১৩নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২১ ১ ৪৭
১৭।	পানিযালা	ভাটবা-১৪ নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২২ ১ ৮৭
১৮।	ডলটা	ভাটবা-১৪নং	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২৩ ১ ৪৭
১৯।	মবহিম	বদলকোট	চাটখিল	নোযাখালী	২৪.১ ৪৭
২০।	হীবাপুব	বদলকোট	চাটখিল	নোয়াখালী	২৫ ১.৪৭
২১।	বানসা	মহম্মদপুর-৫নং	চাটখিল	নোয়াখালী	২৬.১.৪৭
২২।	পালসা	মহম্মদপুব-৫নং	চাটখিল	নোয়াখালী	২৭ ১.৪৭
২৩।	পাঁচগাঁও	পাঁচগাঁও-৬ নং	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	২৮ ১ ৪৭
২৪।	জয়াগ	জয়াগ-১নং	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	২৯ ১ ৪৭
২৫।	আমকী	জয়াগ-১নং	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	৩০.১.৪৭
২৬।	নবগ্রাম	দেউটি-৯নং	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	৩১.১.৪৭

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রামের নাম	ইউনিয়ন	থানা	জেলা	তারিখ
২৭।	আমিশাপাড়া	আমিশাপাড়া-১০নং	চাটখিল	নোয়াখালী	১ ২ ৪৭
২৮।	সাতঘড়িয়া	আমিশাপাড়া-১০নং	চাটখিল	নোয়াখালী	২.২ ৪৭
২৯।	সাধুবাখিল	নোওযাখোলা	চাটখিল	নোয়াখালী	৩ ২ ৪৭
৩০।	শ্রীনগব	শ্রীনগব	চাটখিল	নোয়াখালী	৫ ২ ৪৭
৩১।	ধর্মপুব	খিল্‌পাডা	চাটখিল	নোয়াখালী	৬ ২ ৪৭
৩২।	প্রসাদপুর	সাহাপুব-১০নং	চাটখিল	নোয়াখালী	৭ ২ ৪৭
৩৩।	নন্দীগ্রাম	বসিবপুর-৮নং	চাটখিল	নোয়াখালী	৮ ২ ৪৭
৩৪।	বিজযনগব	পৌরসভা	লক্ষ্মীপুব	লক্ষ্মীপুব	৯ ২ ৪৭
৩৫।	হাম্‌চাঁদী	কাফিলাতলী	লক্ষ্মীপুব	লক্ষ্মীপুব	১১ ২ ৪৭
৩৬।	কাফিলাতলী	কাফিলাতলী	লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর	১২ ২.৪৭
৩৭।	পূর্ব-কেরোয়া	কেরোয়া	লক্ষ্মীপুব	লক্ষ্মীপুব	১৩ ২৪৭
৩৮।	পশ্চিম-কেবোয়া	কেবোযা	লক্ষ্মীপুব	লক্ষ্মীপুব	১৪ ২৪৭
৩৯।	বায়পুব	রাযপুব	বাযপুব	লক্ষ্মীপুর	১৫ ২ ৪৭
৪০।	দেবীপুব	রাযপুব	বায়পুব	লক্ষ্মীপুব	১৭ ২ ৪৭
৪১।	আমুলিয়া	বায়পুব	বাযপুব	লক্ষ্মীপুব	১৮ ২ ৪৭
৪২।	বিরাহিম্‌পুব	বাশিকপুব	লক্ষ্মীপুব	লক্ষ্মীপুব	১৯ ২ ৪৭
৪৩।	বিশ-কাঁঠালী	বাশিকপুব	ফবিদগঞ্জ	চাঁদপুব	২০ ২ ৪৭
৪৪।	কমলাপুব	বামগঞ্জ	বামগঞ্জ	লক্ষ্মীপুব	২১ ২ ৪৭
৪৫।	চর-কৃষ্ণপুব	উত্তব-আল্‌গী	হাইম্‌-চব	চাঁদপুব	২২ ২ ৪৭
৪৬।	চব-সোলাদী	হাইম-চব	হাইম-চব	চাঁদপুব	২৩ ২ ৪৭
৪৭।	হাইম্‌-চব	হাইম্‌-চব	হাইম্‌-চব	চাঁদপুব	২৪ ২ ৪৭

গান্ধীজী দীর্ঘদিন ধরে বর্তমানের নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুব ও চাঁদপুব পবিক্রমা কবেছিলেন। সাতচল্লিশটি গ্রাম পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন। অতি সাধারণ মানুষেব সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই সময়ের সত্যমিথ্যা জড়ানো অনেক কাহিনী লোকমুখে চলাফেরা করতো। এমনি একটি কাহিনী উল্লেখ না করে থাকা যায় না। কাহিনীটি একজন তরুণ পুলিশ অফিসার সম্পর্কে। ইসলামধর্মী এই পুলিশ অফিসার অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানী দিতেন। তাঁর কথা গান্ধীজীর কানে উঠেছিলো। একদিন তাঁকে কাছে পেয়ে গান্ধীজী ডাকলেন তাঁকে। কাছে বসিয়ে সেই তরুণ পুলিশ অফিসাবেব সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন। সেই আলোচনা এবং গান্ধীজীব সংস্পর্শে আসার ফল তরুণ পুলিশ অফিসারের জীবনে সুদূব প্রসারী হয়েছিলো। একেবারেই পৃথক এক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন সেই ধর্মান্ধপুলিশ অফিসার। স্পর্শ মনির সংস্পর্শে এসে লোহা পবিণত হয় সোনায়। কাহিনীটি যদি সত্য হয় তাহলে বিশ্বাস করতেই হবে স্পর্শমনি কোন কাল্পনিক বস্তু নয়। মানুষের হৃদয় সেই স্পর্শমনি।

গান্ধী আশ্রমের বারান্দায় সুপ্রসিদ্ধ কবি সুফিয়া কামালের "গান্ধীজী স্মরণে" কবিতাটি ফ্রেমে বাঁধিয়ে. টাঙিয়ে বাখা হয়েছে। কবিতাটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না।

গান্ধীজী স্মরণে

মহাকাল লেখা লেখে পাষাণ ফলকে
ঝলকে ঝলকে
জ্যোতির্ময প্রকাণ্ড আখরে
তাহাবে ত মুছিতে না পাবে
হয না ত কভু বিস্মবণ
অক্ষয হইযা থাকে সে জ্যোতি লিখন।

যে মহামানব তাঁব দৃঢ পদক্ষেপে
গগন মেদিনী ব্যেপে ব্যেপে
উচ্চারি সোচ্চার কণ্ঠে মানব মুক্তির মন্ত্র বাণী
দূর করি হিংসাদ্বেষ হীন হানাহানি
ত্যাগ তিতিক্ষার পথ ধরি
অহিংস শান্তিব বাণী বিথরি বিথরি
কণ্ঠকিত পথে পথে ফেলিয়া চরণ
সত্যেব প্রতিষ্ঠাতা ভ্রমি আমবণ
যে শীর্ণ সন্ন্যাসী তাঁর শীর্ষে তুলি শিব
ছিল প্রাণ কল্যাণেব তাঁর পৃথিবীর
তাঁহার স্মরণে ওঠে লক্ষ কণ্ঠে বাজি
মৃত্যুঞ্জয! মহাপ্রাণ! গান্ধীজী গান্ধীজী!

বাবান্দার আব একপাশে টাঙানো রয়েছে গান্দীজীর " youth against violence" থেকে নেওয়া অংশ। অতি সাধাবণ কথা। অথচ অসাধারণ শোনায় মহাত্মার কণ্ঠ নিঃসৃত বলে।

" Say 'No' to violence
Violence solves no problem
use hands-not for destruction
But for construction
Meet violence by non-violence

বারান্দার দেয়ালে টাঙানো লেখাগুলি লিখে নেওয়া শেষ হতেই শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারা এলেন। বললেন, দাদা! এই ঘরে আসুন। সামান্য একটু খেয়ে নিন। সামান্য বললেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধারাব পবিবেশিত খাদ্যগুলি অসামান্য। নারকেল কোড়া ও চিনি মাখানো মুড়ি, সুজি দিয়ে মুগ-মুসুরের খিচুরি আর পেঁয়াজি। ঝর্ণাধাবা বললেন, এই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রিয় জলখাবার। আমি বললাম, এমন জলখাবার আমার অদৃষ্টে জোটে কালেভদ্রে।

অতিথি ভবনে আমাকে থাকতে দেওয়া ঘরে উঠে আসছি সিঁড়িবেয়ে, শুনতে পেলাম বাংলাদেশের আবেগ মন্থনকারী জনপ্রিয়তম গানখানি মিষ্টি সুরে ভেসে আসছে উৎপল ও বিশ্বজিৎ-দের ঘর থেকে। দবজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়লাম ঘবে। বললাম, আমি টেপ্-রেকর্ডার নিয়ে আসি। তোমবা আব একবাব গাও। ওরা গাইলো—

"আমার ভাই-এব বক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি—
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলে হাবা কত মায়ের অশ্রুতে
গড়া এ ফেব্রুযাবি—
আমি কি ভুলিতে পাবি।
আমাব সোনাব দেশেব বক্তে বাঙানো ফেব্রুয়াবি—-
আমি কি ভুলিতে পাবি।

গানখানি বচয়িতা কবি আবদুল গফ্ফাব চৌধুবী এবং সুবকাব আলতাফ মাহমুদ। মুক্তিযুদ্ধে বংলাদেশেব মানুষকে উদ্বুদ্ধ কবেছে ছোট্ট এই গানখানি। আজও দেশপ্রেমী বাঙালি মাত্রেবই চোখে জল আসে গানখানি শুনতে শুনতে।

বিকেলে শুনি, নগবপাড়া যেতে হবে। নগবপাড়া। সে আবাব কোথায়। কোন মুল্লুকে সেই নগব আবাব পাড়া। উত্তব পেলাম এই তো পাশেই। খান দুই গ্রাম পাব হতে পাবলেই নগবপাড়া। বাঁধা বাস্তাও আছে জযাগ বাজাব থেকে। তবে বাধা হলেও মেঠো, পাথবে বাঁধা নয়। আব একটু ঘোরা পথ। তাই মাঠে মাঠে যাওযাই আমাদের পছন্দ।

তা, সেই পছন্দেব মেঠো পথ ছেড়ে ঘোবা পথে যাই কেন! উৎপল বিশ্বজিৎ ছাড়াও আশ্রমের জনাপাঁচেক তরুণ কর্মীব সঙ্গে আমিও সেই মেঠো পথ ধবলাম।

নামেই মেঠো পথ। পথ-টথ নেই কিছু। ধান কেটে নেওযা ধু ধু মাঠভরা জমি কেবল। খালি জমিতে তখনও ধানগাছেব গোড়া বযেছে। অমাদের রাঢ-অঞ্চলের গ্রামে বলে ন্যাড়া। ছড়া কেটে বলে—যে এলো চযে সে থাকলো বসে।

ন্যাড়া কাটাকে ভাত দাও মারুক ঠেসে ঠেসে।

ছোটো বেলায় খেলাচ্ছলে জমির ওপব দিযে যেমন ন্যাড়া মাড়িযে চলতাম, ছেলেমানুষী সেই চলা শুরু কবলাম। ছোটো ছেলেটা আমাব ভিতরে কোনখানে যেন লুকিযে ছিলো। জমিতে ন্যাড়া দেখেই বেড়িয়ে পডলো।

ফাঁকা মাঠে রিক্ত জমি। কচ্চিৎ কোন জমিতে লাগানো টম্যাটো, কুমড়ো, বেগুন বা কাঁচালঙ্কা। সেবা যত্নের ছোঁয়া পায় নি ওবা। ফুটপাথবাসী বা বস্তিবাসী ছেলেমেযেদের মতন, প্যাঁকাঠির মতন দেহ নিয়ে টিকে আছে কেবল।

আমার তরুণ সঙ্গীরা ফুলকো কথার তুবড়ি ছুটিযে চলেছে। ওদের কাটা-ছেঁড়া কথাব টুকরো আগুনেব ফুলকির মতো আমার কাছ পর্যন্ত চলে আসছে। কিন্তু মন আমার চলে

গেছে বর্ধমানে আমাব ছেলেবেলা-কাটানো গ্রামে। সেখানকাব জমিব দোআঁশ মাটি এখানে কেমন কবে এলো! দূবে দূবে আকাশেব কোলে গাছ পালায ঘেরা গ্রামগুলিও তো সেই আমাদেব গ্রামেব মতো। আমি নোয়াখালী গ্রামেব মাঠে জমির ওপব দিযে হেঁটে চলেছি, মনেই হচ্ছে না। জমিতে জল-সেচেব গোটা দুই নালা ও জমির বেড়া ডিঙিয়ে এলাম নগরপাড়া গ্রামে।

আজ নবম-দোল। সেই উপলক্ষে নগবপাড়ার শ্রীমানিক দেবনাথেব বাড়িতে উৎসব। তিনি জয়াগেব গান্ধী আশ্রমে গিযে নিমন্ত্রণ জানিযে এসেছেন আজ দুপুবে তাঁর বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ কবতে। দোল উপলক্ষে উৎসব হবে সেই উৎসবে যোগ দিতে।

এসে দেখি উৎসবটা ছোটোখাটো নয। আত্মীয-স্বজন বন্ধুবান্ধব এসেছেন। এসেছেন কুটুম্বেবা দূর দূব গ্রাম থেকে। নারীপুরুষ মিলে অনেক লোকেব সমাবেশ হযেছে। বাড়ির উঠোনে কবোগেট-ছাওযা দোলমঞ্চ। সেখানে হবিনাম সংকীর্তন চলছে। ওদিকে উঠোনেব অন্য পাশে চলছে অন্নকূট। আমবা এলাম অন্নকূটেব শেষ পর্যাযে।

দেবনাথ মশাই ও তাঁব আত্মীযস্বজন যে কী আগ্রহ ভরে এবং কতোখানি হৃদ্যতা দিযে আমাদেব অভ্যর্থনা জানালেন তা তো ভাষা দিযে প্রকাশ করা যাবে না। মুখের কথাব সাধ্য নেই হৃদযেব ভাবকে রূপ দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকজনেব খাওযা শেষ হযে এলো। শেষ ব্যাচে বসা লোকেরা খাওযা-দাওযা সেবে উঠতেই গোবব-লেপা ঝক্‌ঝকে-তকতকে উঠোনেব মাঝখানটি গোল কবে পিঁড়ি পাতা হোলো অতিথিদেব সংখ্যানুসারে। সেই পিঁড়িগুলিব ওপব আমাদেব বসাব আহ্বান জানাতেই তরুণেব দল প্রবল আপত্তি জানালেন। বলতে থাকলেন, আমরা এইমাত্র খেযে এসেছি। এখন আব খেতে পাববো না কিছুই।

গৃহকর্তা শ্রী মানিক দেবনাথ মশাই করুণ চোখে চাইলেন আমাব পানে। সেই দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝি। তাই আমাব তরুণ সঙ্গীদেব উদ্দেশ কবে বললাম, ভাই সব। যাঁর গৃহে এসেছি আজ তাঁব গৃহে উৎসব চলছে। আজ যদি তাঁর গৃহে কিছু গ্রহণ না করি, মুখে যদি কিছু না তুলি, তাহলে গৃহস্থ এবং অতিথি উভযেবই অমংগল হবে। ওদিকে চেয়ে গৃহকর্তাকে বললাম, ভাই দেবনাথবাবু! আমাদের সকলেরই উদবে সত্যিসত্যিঃ স্থানাভাব। অতি অল্প করে, কণিকামাত্র প্রসাদ দেবেন।

আমার 'লেকচার' শুনে আমাব সঙ্গী অতিথিবা প্রভাবিত হলেন। পাতা পিঁড়ি গুলির ওপর বসলেনও সকলে। ওদিকে গৃহকর্তাসহ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। তবে গৃহকর্ত্রী ও অন্য পবিবেশনকারিনীরা 'কণিকামাত্র'-এর কী অর্থ কবেছিলেন জানি না। তাঁদের পরিবেশিত ভাত ডাল তরকাবী পাযেস ও বঁদেতে বেছানো কলাপাতায় আর স্থান রইলো না।

সন্ধে পার হয়ে গেলো কথায় কথায়। সম্মুখে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। অন্ধকাব নেমে আসছে। আমাদের ফিরতে হলে কতোখানি পথ পাব হতে হবে সে ধারণা নেই। তাই

দেবনাথ মশাই ও তাঁর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন মিলে হ্যারিকেন হাতে এলেন এগিয়ে দিতে বাঁধা রাস্তা পর্যন্ত। এগিয়ে দিতে আসার পথে দেবনাথ মশাই বললেন, এই নগবপাড়া গ্রামের অর্ধেক লোক ছিলো হিন্দু। তাদের প্রায় সব বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেছে ভারতে। তাদেব উদ্দেশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ কবে বললেন, তোরা বাপপিতামহের ভিটেমাটি ছেড়ে পালালি কেন! সেখানে কি তোরা বেঁচে থাকবি চিবকাল। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তারা ভারতে চলে যাওযায় এই গ্রামে পড়ে থাকা পাঁচ-ছয়ঘর আমরা বড়ো অসহায বোধ করি।

রাত থেকেই আকাশে মেঘ করেছিলো। গুমোট গরমও ছিলো সাবা বাত। সকাল হতেই বৃষ্টি নামলো টিপ্ টিপ করে। বেলা যতো বাড়ে বৃষ্টির ধারাও বাড়তে থাকে ততোই। ভেবেছিলাম খাওয়া দাওয়া সেবে বেলা বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়বো সীতাকুণ্ডের উদ্দেশে। বৃষ্টি দেখে ভাবনাটাকে মাথাতেই রেখে দিলাম। এখানেই আজ আমার অন্ন লেখা আছে। আমি সীতাকুণ্ডে যেতে চাইলেই কি যেতে পারবো। অতএব কোনবকমে আধ-ভেজা হয়ে ঝর্ণাধাবার অফিসে এসে হাজিব হলাম।

কথায় কথায় শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধাবা বললেন, স্থানীয় কিছু লোক আছেন যাঁরা খুব গোঁড়া এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। তাঁদেব লক্ষ্য কিন্তু ধর্ম নয়। লক্ষ্য গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টেব জমি জবর-দখল করা। এই রকম লোকেদের হাতে ট্রাস্টের অনেকখানি জমি বেহাত হযে গেছে। এঁরা থাকেন সুযোগের অপেক্ষায়। বাব্‌রি-মসজিদ ভাঙা হলে তাঁরা এই রকম একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সুযোগে তাঁবা হাঙ্গামা বাধাতে এবং ভাঙচুর কবতে চেয়েছিলেন।

তবে সব সমাজের মধ্যেই ভালো মন্দ দুই রকম লোকই আছে। বাব্‌বি-হাঙ্গামার সময় এখানকাব জেলা শাসক হাঙ্গামা-কারীদের প্রতিহত করেছিলেন। আশ্রম এলাকার মধ্যে জবর-দখল করে থাকতে চাওয়া লোকেদের হটিয়ে দিযেছিলেন। আমাদের আশ্রমের কর্মীদের, বিশেষ করে মাহিলা কর্মীদের যাতে কোন প্রকার অসম্মান না হয় তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে নোয়াখালী জেলার দ্বিতীয় জেলা প্রশাসকেব কথা উঠলো। এই দ্বিতীয় জেলাপ্রশাসক ঝর্ণাধাবাকে 'দিদি' ডাকেন এবং সেই সম্মান দেন। সময পেলেই চলে আসেন এখানে। খেয়ে যান ঝর্ণাধারার হাতে রান্না করা খাবার। শোকাহত এই জেলা শাসক তাঁর মায়েব মৃত্যুর পর দীর্ঘ সময় কাটিয়ে ছিলেন এখানে এসে। ঝর্ণাধারাকে বলেছিলেন, দিদি! আপনার কাছে এসে বসলে মনে হয়, আমি আমার মায়ের কাছে এসে বসে আছি।

ঝর্ণাধারা এরশাদেব শাসনকালের খুব একটা মজার কথা বললেন, হামলাকারীদেব বিরুদ্ধে গান্ধীআশ্রমকে এরশাদ যথেষ্ট সুরক্ষা দিতেন। একবার এরশাদ এই গান্ধী আশ্রম দেখতে চেয়েছিলেন। যে দিন তাঁর আসার কথা তার দিন তিনেক আগেই পুলিশ বাহিনী

এসে হাজির। ঝর্ণাধারা বললেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা যেমন করে হোক করা গেলো অতিথিভবন ও বিদ্যালয়ের খান কয়েক ঘর নিয়ে। কিন্তু খাওয়ার ব্যবস্থা! অতো পুলিশের তিনদিন ধরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা কি চট্টিখানি কথা। তাদের চায়ের সঙেগ কিছু 'টা' দিতে আমাদের দেড়মণ চানাচুর হাওয়া হয়ে গেলো। অবশ্য এরশাদ সাহেবের সেবার আসা হয় নি শেষ পর্যন্ত।

বললাম, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট সম্পর্কে আমার যে আরও অনেক জানার আছে। ঝর্ণাধারা বললেন, বৃষ্টিধারা চায় না, আপনি এতো শিগগির চলে যান এখান থেকে। তা, আজ যাওয়াই যখন হবে না তখন সন্ধেবেলায় সেই সব কথা হবে। সেই কথা মতো সন্ধের সময় টেপ্-রেকর্ডার হাতে এসে হাজির হলাম ঝর্ণাধারার অফিসে। ঝর্ণাদাবা বললেন, বলুন, আপনার কী জানার আছে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট সম্পর্কে।

আমি : গান্ধীজীর কাছে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বাবলম্বনের প্রতীক ছিলো চরখা। তাই তিনি নিজেও প্রতিদিন রুটিন করে চরকায় সুতো কাটতেন। আবার, চাইতেনও গ্রামের প্রতিটি মানুষ চরখায় সুতো কাটুক। তিনি বিশ্বাস করতেন, এই সুতো কাটার মধ্য দিয়েই গ্রামবাসীর মনে স্বাবলম্বনের আগ্রহ জাগ্রত হবে। সেই সঙ্গে জাগ্রত হবে তার অন্তরের মনুষ্যত্ব। চরখা সম্পর্কিত গান্ধীজীর আদর্শকে আশ্রমে রূপায়িত করতে চরখায় সুতো কাটা প্রবর্তন করা হয় নি কেন?

ঝর্ণাধারা : গান্ধীজীর এই আদর্শকে রূপায়িত করতে আশ্রমে চরখায় সুতো কাটার কাজ শুরু করা নিশ্চয়ই উচিত ছিলো, তবে এই আশ্রমের প্রাক্তন পরিচালকগণ মনে করেছিলেন চরখার সুতো কাটা প্রথার সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আবার জন সাধারণকে সুতো কাটা শেখানো সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া, সুতো কাটা শিখে লোকে সেই সুতো দিয়ে যদি কাপড় বোনার সুযোগ না পায় তাহলে সুতো কাটার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্থির করেছিলেন প্রথমে তাঁতে কাপড় বোনার কাজ আশ্রমে শুরু করা দরকার। আমাদের কাছেও এই পরামর্শই দেওয়া হয়েছিলো। সেই পরামর্শ অনুসারে আমরা ইন্ডিয়ান টেক্সটাইলের কাছে আবেদন করি। তাঁরা তাঁত দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং ক্যানভাস স্থাপনে সাহায্য করেছেন। তদনুয়ায়ী, তাঁরা যদি ডিজাইনার এবং কন্সালট্যান্ট দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে আমাদের উপকার হবে। সেইজন্য আমরা আবেদন করি এবং সেই আবেদন অনুসারে ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল দুই জন কন্সালট্যান্টকে পাঠিয়েছেন। তাঁদের একজন ডিজাইনের কনসালট্যান্ট এবং আর একজন তাঁতে কাপড় বোনার কন্সালট্যান্ট।

তাঁরা আমাদের এখানে পনেরো দিন ধরে আছেন এবং কর্মীদের কাজ শিখে নিতে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আগামীকাল কোর্স শেষ করে তাঁবা চলে যাবেন।

আমিঃ ঐ যে গতকাল গোরুর কথা বলেছিলেন, সেই গোরুর ব্যাপাবটা যদি বিষদভাবে একটু বলেন ভালো হয়।

ঝর্ণাধারা ঃ আমাদের এখানে মডেল হিসেবে কয়েকটি গাভী পালনের জন্যে এবং আশপাশেব গ্রামে পঞ্চাশটি গাভী পালনের জন্যে একটা প্রজেক্ট আমরা বাংলাদেশ সরকারকে দিয়েছিলাম। সেই প্রজেক্ট অনুসাবে বাংলাদেশ সরকাব আমাদের কয়েকটি গাভী দিয়েছে।

আমি ঃ আর কোন সংস্থা থেকে কোন শিল্প স্থাপনে সহায়তা করা হয় কি?

ঝর্ণাধারা ঃ হ্যাঁ! হয়। বৃটিশ হাইকমিশন থেকে আমাদের কর্মীদের কুটির শিল্পের ওপর শিক্ষণ দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে কুটিব শিল্পস্থাপনে সহাযতা কবেছে।

আমি ঃ এই কাজগুলি সফল হয়েছে কি?

ঝর্ণাধারা ঃ কাজগুলি চলছে। সফল হবার সময় এখনো আসে নি।

আমি ঃ আশ্রমের ব্যয়ের ব্যাপাবটা জানাব জন্য জিজ্ঞেস কবি, এখানে, স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে কতো জন কর্মী আছেন?

ঝর্ণাধাবা ঃ এখানে মোট পঁয়ষট্টি জন কর্মী আছে।

আমি ঃ তাঁবা সকলেই কি বেতন-ভোগী

ঝর্ণাধাবা ঃ হ্যাঁ! তাঁবা সকলেই বেতন-ভোগী।

আমি ঃ তাঁরা কীবকম বেতন পান?

ঝর্ণাধাবা ঃ যোগ্যতার ও কাজেব তুলনায কম বেতন দেওয়া হয না। সর্বোচ্চ বেতন দশহাজার টাকা।

আমি ঃ (বিস্ময়ে) মাসে দশ হাজাব টাকা।

ঝর্ণাধারা ঃ হ্যাঁ। মাসে দশহাজার টাকা। আব সর্ব নিম্ন বেতন ন শো টাকা।

আমি ঃ সব সময় মধ্যবিত্ত পরিবারেব মতো আমাদেব একটু টানাটানি করেই চলতে হয়। তবে, এখানে একটা উল্লেখযোগ্য কথা হোলো, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে -- যেমন মন্দিরে, মসজিদে --কিছু চাঁদা, প্রণামী, সেলামী প্রভৃতির আকারে অর্থ আসে। গান্ধী আশ্রমে ঐ ধরনেব কোন উপায়ে অর্থ আসে না। নিজেবা গায়ে খেটে, বুদ্ধি দিয়ে, কিছু কিছু বিশেষ সংস্থা থেকে প্রকল্পের বিনিময়ে এক বৎসব, তিন বৎসব, পাঁচ বৎসব, কনট্র্যাক্ট-ভিত্তিক অর্থ পাওয়া যায়। সেই অর্থ দিয়ে প্রকল্প অনুয়াযী কাজগুলো সম্পন্ন করতে হয়।

এখানে আবার একটা বিশেষ কথা আছে। যাবা কাজ করে না তারা, যাবা বিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে কাজ করে, তাদের ওপর খারাপ ধারণা পোষণ

করে। কিন্তু আসলে যে প্রকল্প গুলি দেওয়া হয় সেগুলি যদি চুক্তি অনুযায়ী যথাযথ ভাবে সম্পন্ন কবা হয় তাহলে সেই অর্থের এদিক-ওদিক করা সম্ভব নয়। এইভাবে সেই সব প্রকল্প থেকে অর্থাগম হয। এই অর্থ দিয়ে আমাদেব খুব হিসেব করে চলতে হয়।

তাছাড়া, আয়ের আবও কিছু পথ আছে। যেমন, আশ্রমের জমিতে ধান বা শাক সবজি ফলিয়ে তা দিযে আশ্রমেব প্রযোজন মেটে। আবার উদ্বৃত্ত কিছু বিক্রিও করা হয়। পুকুবে মাছ চাষ থেকেও বেশ কিছু অর্থাগম হয়।

আমি ঃ এইভাবে দীর্ঘদিন তো আশ্রমের কাজ চালাচ্ছেন। তাতে নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন কবেছেন। সেই অভিজ্ঞতা দিযে কি মনে হয়, গান্ধীজীর আদর্শ সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সফল করতে পাববেন? আপনার কি সেই বিশ্বাস আছে?

ঝর্ণাধারা ঃ আমাব দৃঢ় বিশ্বাস আছে। গান্ধীজীব দৃষ্টিতে যে পল্লী উন্নয়নের আদর্শ নোয়াখালী এবং তার আশেপাশের যে পল্লীগুলিতে আমবা কাজ করছি, সেই আদর্শকে আমরা বাস্তবায়িত কবতে পারবো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছি আমরা। যেমন, গান্ধী আশ্রমেব যে স্যানিটেশন প্রকল্প, এই প্রকল্পটা খুবই সফল করতে পেবেছি।

এই এলাকার মানুষেব এখন খোলাপাযখানাব (উন্মুক্ত মাঠে মলত্যাগ কবা) সংখ্যা খুবই কমে গেছে। আমবা বাব বার কেবল বাংলা বুলি দিযে 'হাইজিন'-এর কথা না বলে, প্রেস্টিজ-ইস্যুতে চলে গেছি। মান সম্মানের প্রশ্ন। আমাব বাড়িতে একটা পায়খানা থাকবে না, আমার বাডিতে স্বাস্থ্য-সম্মত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে না, এটা মেনে নেওযা যায় না। এটা আমাব ফ্যামিলি-স্ট্যাটাস। এটা আমাব দৈনন্দিন ন্যূনতম প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা বোঝানো, এই প্রযোজনটা পুবনেব ব্যবস্থা কবা, প্রত্যেকটা মানুষের মনে এই চাহিদাটা জাগানো, এটাই আমাদের কাজ।

মানসিক বিকাশেব কাজ কবছি। যেখান থেকে হোক, যেভাবে হোক, পায়খানা তৈরিব এবং পানীয় জলেব ব্যবস্থা কবার কাজ করুক। কেবল মানুষেব মনে জাগ্রত হোক, আমবা স্বাস্থ্য সম্মত পাযখানা ব্যবহার কববো। আমবা স্বাস্থ্য সম্মত বিশুদ্ধ পানীয় জলেব ব্যবস্থা কববো। আগেব মতো প্রাচীন পদ্ধতিতে পাযখানা-বিহীন বাড়ি থাকবে না। আমাদের ছেলেমেয়েদেব লেখাপড়া শেখাবো এই বোধটাও খুবই জাগ্রত হয়েছে লোকের মনে।

স্বাস্থ্যেব দিক থেকে আব একটা কথা বলি। আপনি গতকাল প্রশ্ন করেছিলেন ভারতেব শিশুদেব পোলিও, হুপিং কাসি, টিটেনাস, ইত্যাদির প্রতিষেধক টিকা বা ইনজেকশান দেওয়া হয। বাংলাদেশেব শিশুদেব তেমনি প্রতিষেধক টিকা বা ইন্‌জেক্‌শান দেওযা হয কি?

উত্তবে জানাই , হ্যাঁ। দেওযা হয়। গভীব প্রশংসাব সঙ্গে বলি, বাংলাদেশেব প্রত্যন্ত গ্রামের মাযেবা এমন কি অশিক্ষিত মায়েরাও শিখেছেন যে শিশুকে ছ'টা ইনজেক্‌শান দিতে

হয়। গর্ভকালীন টিটেনাস ইত্যাদির প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শানগুলোও মায়েরা এখন নিয়ে থাকে । এই সব ইন্‌জেকশান নেয না এমন মায়ের সংখ্যা খুবই কম। যারা স্বাস্থ্য বিধি প্রয়োগ করছে না তাদেব সংখ্যা এতোই কম যে খুঁজে বার করতে হবে।

এরপর ছোট পবিবার সম্পর্কে বলতে হয। ছোট পবিবার গঠনের জন্য পরিবাব পরিকল্পনা বিভাগের সঙ্গে পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করা আগেব চেযে অনেক বেড়ে গেছে।

এই এলাকায় 'তালাক' প্রথা অনেক কমে গেছে। নারী নির্যতনের ঘটনা আগেব তুলনায় অনেক কম। আগে মেয়েবা খুবই বক্ষণশীল ছিলো। বাড়ি থেকে বার হোতো না। এখন বাইরে যায়। কাজকর্ম কবে। আব এই সব ব্যাপারে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টেব যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

আমাদের যে ঋণ প্রকল্প আছে সেই প্রকল্পে কুটিব শিল্প গঠনেচ্ছু ব্যক্তিদের এবং হাঁস মুরগী পালন করাব জন্যে পোল্ট্রি চালু কবা ইত্যাদিব জন্য ঋণ দেওয়া হয। আপনি শুনে খুশি হবেন, ঋণ গ্রহীতাদেব সকলেই, শতকবা একশোভাগ, তাদের ঋণপবিশোধ কবছে । অবশ্য আমাদের কিছু ঋণ আটকে আছে। তাব কাবণ, আগে ঋণদান ঋণপবিশোধেব পদ্ধতিগুলো ঠিক ছিলো না। তবু, এই সব অনাদাযী ঋণেব হিসেবকে একত্রিত কবলেও বলা যায় আমাদেব ঋণেব প্রায় অষ্টআশী শতাংশ আদায হয।

আমি ঃ মানুষেব সেবায আপনাবা নিশ্চযই নিবেদিত প্রাণ।

ঝর্ণাধারা ঃ নিজেকে নিবেদন কবতে পেবেছি কিনা জানি না । তবে সর্বক্ষণ সেই চেষ্টা কবে চলেছি।

এইসব কথার মাঝেই ঝর্ণাধাবা বলে উঠলেন, কিন্তু আপনার খাবাব সময হযে গেলো যে দাদা। খাবাব ঘরে এসে দেখি, সবাই এসে পড়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধাবা চৌধুবীকে তাঁব কাজেব স্বীকৃতি স্বরূপ এবাব যুমনালাল বাজাজ পুবস্কাব দেওযা হযেছে।

—— ☆ ——

দশম অধ্যায়

সীতাকুণ্ড

নোয়াখালীর জয়াগে এসে গান্ধী আশ্রমে উঠেছিলাম। এই গান্ধী আশ্রমে নয় নয় করেও কাটিয়ে দিলাম পুবো চার-চাবটে দিন। মাত্র তিবিশ দিনেব ভিসা। তাব চারটে দিন যদি জয়াগেই কাটাই অন্য সব জায়গা দেখবো কখন' অবশ্য গান্ধী আশ্রমে একসঙ্গে এতো দিন থাকার গভীরে কাবণও একটা ছিলো। আমার কিশোর বয়েসেই বেশ কয়েকজন গান্ধীবাদী দেশ-সেবকেব সংস্পর্শে এসেছিলাম। তাঁদেব পদতলে বসে সামান্য কিছু শেখারও সুযোগ পেযেছিলাম। তাঁদেব মাধ্যমেই গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তাই গান্ধীজী ১৯৪৬-সালে যখন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে শান্তিব বাণী বহন কবে নিয়ে এসেছিলেন তখন তাঁব সঙ্গীদেব সঙ্গে আমিও এখানে আসতে চেয়েছিলাম। ভাবখানা এই, কাঠবেরালিব মতো সামান্য একটা প্রাণী যদি শ্রীবামচন্দ্রে সাগব বাঁধাব কাজে লাগে, তাহলে আমিই-বা গান্ধীজীব হিন্দুমুসলমানেব মিলনেব সেতুবচনাব কাজে লাগতে পাববো না কেন!

সব ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। নোয়াখালী আসাব সব ব্যবস্থাই পাকা। এমন সময ম্যালেবিয়া এসে আমাব যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই শান্তিকামনাব যাত্রায আমি মহাত্মাজীব সঙ্গী হতে পাবি নি। না-পাবাব দুঃখ আজও আমার বুকে বাজে। আব সেই জন্যই আজ বাহান্নো বছব বাদে নোয়াখালীব গান্ধী আশ্রমে আসতে পেবে মন অনেকখানি ভবে উঠেছে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে মন সবছিলো না।

তবু যেতে তো হয। ব্যাগটি হাতে নিয়ে একবাব পিছন ফিবে চাইলাম। দেখি, আশ্রমবাসী প্রতিটি মানুষ এসে বাবান্দায় দাঁড়িয়েছেন' ছোট বড়, ছেলেমেয়ে সকলে নীববে আমাকে বিদায জানাতে এসেছে। মনে পড়ে গেলো দোয়াশা-আলগাঁয়েব কথা। গুসকবাব পাশে দোয়াশা আলগাঁয়ে গ্রামসেবা কেন্দ্র যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদেব সঙ্গে আমিও ছিলাম। থাকতে থাকতে গ্রাম দু'খানিব আপন মানুষ হয়ে পড়েছিলাম। তাই যেদিন সেই গ্রামসেবা কেন্দ্র ছেড়ে আমি শা-পুকুবেব পাড়ে এলাম গ্রাম দু'খানিব মানুষ এসে জড়ো হয়েছিলেন নীববে আমাকে বিদায জানাতে। সেই দৃশ্যটি আজও আমাব মনেব মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে।

গান্ধী আশ্রম থেকে বাব হয়ে এলাম জযাগ বাজাবে। বামগঞ্জ আর চাটখিল থেকে দুটো বাস্তা এসে মিলেছে পবস্পবের সঙ্গে। তাবপব জয়াগ বাজাবেব ওপব দিয়ে গিয়ে মিশেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম সডকের সঙ্গে। আমাকে বামগঞ্জ অথবা চাটখিল থেকে আসা বাসে চড়তে হবে। কিন্তু বাস যে আসে যাত্রী বোঝাই হযে। অথচ আমার বসাব একটু ঠাঁই না হলে চলে না! বাসেব মধ্যে ঠায দাড়িয়ে প্রায় তিন ঘণ্টাব পথ পাব হয়ে সীতাকুণ্ড যেতে পারি! অবশ্যই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় নি আমাকে। একটু ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিলো ঠিকই

বাসে ওঠার সময়। বাসের মাঝামাঝি এসে, দাঁড়িয়েছি। এমন সময় আমাব সামনেব সিটেব যাত্রীটি আমাকে তার বসার অধিকার ছেড়ে দিযে পরের স্টপেজে নেমে গেলো। আমি সিটে বসে বাবা চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকালাম। সেই সঙ্গে সীতাকুণ্ড তীর্থেব উৎপত্তিব কাহিনীতে মন দেবার সুযোগ পেলাম।

দক্ষযজ্ঞে সমস্ত দেবতাই নিমন্ত্রিত হলেন। নিমন্ত্রণ পেলেন না কেবল দেবাদিদেব মহাদেব—শিব। তবু বিনা নিমন্ত্রণেই শিব-পত্নী সতী পিতৃগৃহে গেলেন। দক্ষেব আদরের কন্যা সতী। তাঁকে দেখলে কি রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন দক্ষ। কিন্তু ঘটলো ঠিক বিপরীত। মুখে যা আসে তাই বলতে থাকলেন দক্ষ। শিবকে অকথ্য কথায় .গালমন্দ করতে থাকলেন। পিতার মুখে এইরূপ পতিনিন্দা শুনে সতী কি জীবন ধারণ করতে পারেন! তিনি যোগবলে আত্মাহুতি দিলেন দক্ষের যজ্ঞকুণ্ডে। তখন সতীব প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে ধারণ করে শিব হলেন নটরাজ। ক্রোধে উন্মত্ত নটরাজ শুরু করলেন প্রলযংকব নৃত্য। শিবের সেই প্রলয় নৃত্যে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায় দেখে দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। দেবতাদের অনুরোধে সৃষ্টি রক্ষার ভার নিলেন বিষ্ণু। তিনি সুদর্শন চক্র দিযে খণ্ড খণ্ড কবে দিলেন সতীর নিষ্প্রাণ দেহ। সতীর দেহ মোট একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হযে সাবা ভাবতেব একান্নটি স্থানে পতিত হয়েছিলো। এই স্থানগুলি হোলো পীঠস্থান। প্রত্যেক পীঠেস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মহাশক্তি—ভিন্ন ভিন্ন নামে। আব সেই সঙ্গে আছেন ভৈবব। তিনিও আছেন ভিন্ন ভিন্ন নামে।

নটবাজ শিবের স্কন্ধ চ্যুত হয়ে সতীব ডানহাতের অর্ধাংশ পতিত হযেছিলো ত্রিপুবাব দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে এবং সেখানে সৃষ্টি হয়েছিলো একটি কুণ্ড। তাই ঐ স্থানের নাম হোলো সতীকুণ্ড। কিন্তু সতীব চেয়ে সীতা বোধহয় বেশি পরিচিতা সাধারণ মানুষেব কাছে। তাই জনসাধারণের মুখে মুখে সতীকুণ্ড পরিণত হোলো সীতাকুণ্ডে।

দেশ বিভাগের সময় সীতাকুণ্ডকে ত্রিপুবা থেকে ছেটে নিয়ে যুক্ত করা হয় পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান বাংলাদেশের সঙ্গে।

আমার সীতাকুণ্ডে যাওয়ার অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ একটি কাবণ ছিলো। সেই কারণটি এই সুযোগে বলে নিই। আমার বাংলাদেশ দেখতে আসার মাস দেড়েক আগে এই দেশে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজ এবং অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। বাংলাদেশের নানাস্থান দেখে তাঁরা সীতাকুণ্ডে এসেছিলেন। আর সীতাকুণ্ডে এসে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠে চন্দ্রনাথকে দর্শন করবেন না, তাতো হয় না। অতএব দুজনে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন। অনেক পরিশ্রম করে উভয়ে বিরূপাক্ষ-মন্দির পর্যন্ত উঠেও ছিলেন। তারপর আরও অনেক উপরে উঠে চন্দ্রনাথের মন্দিরে যেতে স্বামীজীর না অধ্যাপকের কার পদদ্বয় বিরূপ হয়েছিলো বলতে পারবো না। শুধু বলতে পারি তাঁরা আর না উঠে উভয়েই নেমে এসেছিলেন। না নেমে করবেনই বা কী! পদদ্বয় বিরূপ হোলে কাদের ওপর ভরসা করবেন।

সীতাকুণ্ড

বাংলাদেশ দেখতে আসার আগে পূর্ণাত্মানন্দজীব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন স্বামীজী বলেছিলেন, আপনি কিন্তু চন্দ্রনাথ পর্বত শীর্ষে উঠে চন্দ্রনাথ দর্শন করে আসবেন। সীতাকুণ্ডেব চন্দ্রনাথ ধাম দ্বিতীয় কাশী ক্ষেত্র, মহাতীর্থ। পূর্ণাত্মানন্দজীর মুখে কথাটা শুনে আমাব মনেব মধ্যে একটু কৌতুক উঁকি দিযেছিলো। অধ্যাপক রহমান সাহেবকে আমি দেখিনি। তাঁর বযেস কতো বা শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আমাব জানা নেই। তবে পূর্ণাত্মানন্দজী চল্লিশেব ধাবে কাছেই বিবাজ কবছেন বলেই আমাব ধাবণা। এদিকে একাত্তোরে পা দিযে আমি যদি হামাগুড়ি দিযেও বাবা চন্দ্রনাথেব পদতলে পৌছুতে পারি তাহলে আমার "কালিদাসকে হাবিযে দিযে গর্বে বেড়াই নেচে।" ঠেকায কে।

বাস এসে থামলো সীতাকুণ্ড বাজাবে। ব্যাগটি হাতে নিয়ে নেমে পড়লাম আমি। নামতেই এক পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা। বললাম, পুলিস সাহেব! শংকর মঠ যাবো কোন দিকে? পুলিস সাহেব লোক ভালো। কোন দিকে, কী ভাবে যাবো শুধু বলে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। আমাকে রিকসা স্ট্যাণ্ডে নিয়ে এসে একটা রিকসাও ঠিক করে দিলেন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কের একটা শাখা পথ সীতাকুণ্ড বাজাব থেকে চলে গেছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দিকে। সেই পথটা ধবে চলতে থাকলো বিকসা। আমি এটা-ওটা জিজ্ঞেস কবতেই বিকসাঅলা ধরে ফেলেছে আমি একটা উটকো লোক। সুতরাং সে আমার শুধু বিকসাঅলা হযেই থাকলো না, আমার গাইড্ও হযে উঠলো। আমাকে কোথায় কী আছে দেখাবার সুযোগ হাত ছাড়া করবে কেন সে।

সামান্য যেতেই পড়লো বেললাইন। পাব হযে একটু যেতেই বাঁ দিকে হাত বাড়িযে বিকসাঅলা বললে, বাবু! এই হোলো আপনাব গিয়ে কালীমন্দির। মাকে দর্শন করলে আপনার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। রিকসা ওপব বসেই আমি জোড় হাত কপালে ঠেকালাম মাযেব উদ্দেশ্যে।

আরও খানিক গিযে আবাব বাঁদিকে হাত বাড়িয়ে বিকসাঅলা বললে, এখানে শনি ঠাকুবের বাড়ি। শনিঠাকুরকে দর্শন করলে আপনার সব অশান্তি দূব হবে, আপনার গ্রহশান্তি হবে বাবু। প্রণাম জানালাম শনিঠাকুবকে খুব ভক্তি সহকাবে। শনিঠাকুর বলে কথা! আরও খানিক এগিযে যেতেই সত্যনারায়ণ ভবন। ভবনে আছে শ্রীবামচন্দ্রের মূর্তি। প্রণাম করলাম শ্রীবামচন্দ্রকে। পথে পড়লো আরও অনেক দেবদেবীর মন্দির। রিকসাঅলার মুখে তাঁদের নাম শুনতে শুনতে চলেছি, এমন সময় বাঁপাশে ভেসে উঠলো খুব বড়ো একটা গেটেব ওপর লেখা "শ্রীবামকৃষ্ণ সেবাশ্রম"। গেটটি নতুন। পিছন থেকে গেটকে ছাঁপিয়ে উঠেছে গেরুয়া রঙের মন্দির চূড়া। রিকসার ওপর বসেই প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললাম, এতো সংক্ষেপে তোমার দর্শন সারবো না ঠাকুর। কাল কি পরশু এখানে এসে ভালো করে দেখে শুনে যাবো।

তারপর সামান্য একটু এগিয়ে রিকসাঅলা বললে এই যে পাঁচীল-ঘেরা বটগাছ দেখছেন, এব নাম পঞ্চবটী। জানতে চাইলাম, এই পঞ্চবটীতে কে সাধনা করেছিলেন। রিকসাঅলা

বলে তাতো জানি না, বাবু! তবে শুনেছি অনেক দিন আগে এখানে খুব বড়ো এক সন্ন্যাসী এসে এই গাছতলায় বসে বিশ্রাম করেছিলেন।

নোয়াখালীব গান্ধী আশ্রম থেকে আসাব সময় শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধাবা বলেছিলেন, সীতাকুণ্ডের শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অতিথিদের থাকাব ব্যবস্থা আছে কিনা আমার জানা নেই। সুতবাং আপনি সীতাকুণ্ড গিয়ে শংকব মঠেই উঠবেন। সেই শংকব মঠের সিংহদ্বাবে এসে বিকসাঅলা আমাকে নামিয়ে দিলো।

শংকব মঠেব সিংহদ্বাব আক্ষরিক অর্থেই সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের মাথার দুপাশে বিশাল দুটি সিংহমূর্তি পবস্পবের মুখোমুখি দাঁড়িযে বযেছে। ওবা যেন শংকর মঠেব দ্বারবক্ষী।

প্রবেশ করলাম শংকর মঠে। ডানপাশে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ভবন এবং ব্রহ্মানন্দ দাতব্য চিকিৎসালয। এই ভবনেব একতলার এবং দোতলাব কয়েকটি ঘর নিয়ে অনাথ ছাত্রাবাস। আব অতিথিদেব জন্যও কযেকটি ঘব বাখা হযেছে আলাদা কবে।

অনাথ ছাত্রাবাসটিব সম্পর্কে কিছু বলা দবকার। আগেই উল্লেখ কবা হয়েছে এখানকাব এই পাহাড়ভূমি একসময ত্রিপুবা বাজ্যেব অন্তর্গত ছিলো। স্বাধীনতাব সময এই অঞ্চলটি ত্রিপুবা বাজ্য থেকে ছেটে নিয়ে যুক্ত করা হয পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্থানেব সঙ্গে। এখন এই অঞ্চল স্বাধীন বাংলাদেশেব চট্টগ্রাম জেলাব একটা অংশ। এখানকাব পাহাড় অঞ্চলে ত্রিপুরী নামে এক পাহাড়ী জাতি বাস করে। এই ত্রিপুরীদেব নাম থেকেই রাজ্যের নাম হয়েছিলো ত্রিপুরা। এই ত্রিপুরীরা এখানে এমন দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে বাস করে যেখানে সমতলবাসীরা দিনের আলোতে যেতে সাহস করে না। ত্রিপুরীরা খুবই দরিদ্র। এককালে তারা প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল প্রকৃতির সন্তান ছিলো। পাহাড়ের বন থেকে আহৃত ফলমূল ছিলো তাদের জীবন ধারণের উপকরণ, ক্রমে সভ্যতা এগোচ্ছে একটু একটু করে এগিয়ে। এদিকে বনভূমি আসছে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়ে। আবার ত্রিপুরীদের সংখ্যা যাচ্ছে দ্রুত গতিতে বেড়ে। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গেও তাদের একটু একটু করে পরিচয় ঘটেছে। ফলে প্রকৃতি আর তাদের লালন-পালন করতে পারছে না। আর সেজন্যেই ত্রিপুরীরা রুজি-রোজগারের ধান্দায় সমভূমিতে নেমে আসছে আজকাল। ওরা মেয়ে-পুরুষে সমতলে এসে প্রধানত জনমজুর-এর কাজ করে।

ত্রিপুবীদেব অনেকেই হিংস্র জীব জন্তুদেব আক্রমণে অথবা অঘটনে অকালে মৃত্যু ববণ কবতে বাধ্য হয। তাদেব ছেলেমেযেবা হয়ে পড়ে অনাথ। আবাব অনেক বাবা -মা এতোই গবিব যে নিজেদেব ছেলেমেয়েকেও খেতে দিতে পারে না। সেই ছেলে মেযেবা অনাথেব অধম। এই সব অনাথদেব জন্যে শংকব মঠের পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিগণ অনাথ আশ্রম খুলেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কেবল মাত্র ছেলেদেব জন্যই অনাথ আশ্রমে আশ্রযেব ব্যবস্থা কবা সম্ভব হয়েছে। অনাথ আশ্রমে এইসব ছেলেদেব আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তাদের খাওয়া-পরাব সংস্থান কবা হয়। আবার লেখাপড়ারও ব্যবস্থা বয়েছে। ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া

হয়। সন্ন্যাসিগণ নিয়মিত পড়ান তাদের। তাই এই সব অনাথ ছেলেরা ইস্কুলে ভালো ফল করে।

অনাথ আশ্রমের একটি ছেলেব কাছে শংকব মঠেব অফিস কোথায় জানতে চাইলাম। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের গায়েব দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ খানে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ি ধবে উঠে যান। উঠে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। অনেক খানি উঠতে হয়। হাঁফ ধবে যায় উঠতে। পথেব কষ্ট লাঘব কবতে মনকে বোঝালাম ভালোই তো হোলো। দিন দুই ওঠানামা করতে কবতে বাবা চন্দ্রনাথের মন্দিরে ওঠা প্রাকটিস হয়ে যাবে। তখন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠা সহজ হ্যে উঠবে।

উপবে উঠে দেখি সে এক আলাদা রাজ্য। প্রথমেই মন্দির। মন্দির মানে দীর্ঘ বড়ো দালান। তার মধ্যে কয়েকটি কক্ষ। এক একটি কক্ষে এক একটি দেবতা—শিবের বিভিন্ন রূপ। মন্দিবের উপব পাশাপাশি চারটি চূড়া। আব মন্দির গুলি ঘিরে চারপাশে চওড়া বাবান্দা। মন্দিবে অধিষ্ঠিত দেবতাদেব প্রণাম কবে আবও উপবে উঠে এলাম। সেখানে বিশাল এক দালান। দোতলা। নীচে সাবিসারি ঘব। তাব একটিতে অফিস। তার ঠিক পরে দীর্ঘ একটি কক্ষে গুরু মন্দিব। দোতলাতেও দেব মন্দিব রয়েছে। আব আছে সন্ন্যাসীদেব আবাস। এই দালান পার হয়ে বৃদ্ধাবাস। অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা বয়েছেন। তাঁরা সহায়-সম্বল হীন। শংকব মঠেব শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীবাই তাদেব শেষ বেলাকাব সহায়। অবশ্য মঠের কাজকর্মে তাঁবাও সাধ্যমত হাত লাগান। আরও উপরে বয়েছে রান্নাঘব ও খাবাব ঘব।

শংকব মঠেব বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতীশ্বরানন্দ মহারাজ। এই সুযোগ্য সন্ন্যাসীর সচারু পবিচালনায় শংকব মঠেব বিস্তার ঘটেছে নানা কাজকর্মে। দেখে মনে হয়, সন্ন্যাসীদেব আশ্রম তো নয়। যেন বিশাল এক কর্মশালা। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেব বিভিন্ন আশ্রম ও মঠে দেখেছি, এখানেও দেখছি পূজনীয় সন্ন্যাসীরা সংসাবেব সাধাবণ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তাহলে তাঁরা মা বাবা আত্মীয়স্বজনের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ করে এসেছিলেন কেন? মুক্তির আশায়? আবার সংসার ত্যাগ কবেই যদি এলেন তবে পুনবাব সংসারের কাজে আত্ম নিয়োগ করলেন কেন। তাহলে এই সংসার বিমুখ শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীরা কি টকেব জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস কবছেন!

কিন্তু তা তো হতে পারে না। তাহলে "জীব সেবা-ই শিব সেবা" এই মন্ত্রকে ধ্রুব জ্ঞান করেছেন তাঁরা। অথবা

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে।

আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পবে বাঁধা সবাব কাছে।" (ধূলা মন্দির, গীতাঞ্জলি) কে হৃদযঙ্গম করেছন তাঁবা।

এই সব তত্ত্ব কথায় মেতে উঠেছে আমাব মন। এমন সময় জঠবে জ্বলে উঠলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। আমি অফিস ঘরে প্রবেশ কবলাম। আমি কলকাতা থেকে এসেছি এবং আমার

উদ্দেশ্যে শুনে মঠে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন ভার প্রাপ্ত স্বামীজী। তবে বললেন, আমাদের অতিথি ভবন তো ব্রহ্মানন্দ সংস্কৃত কলেজের দ্বিতলে। আপনাকে নেমে যেতে হবে যেখানে। তারপর আবার উঠে আসতে হবে খাবার জন্যে। তার চেয়ে একেবাবে খাওয়া দাওয়া করে ব্রহ্মানন্দ ভবনে নেমে যান। শুনে মনে হোলো সন্ন্যাসীরা অন্তর্যামী নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যার সময় গুরু মন্দিরে ভক্তিগীতি আরম্ভ হোলো। সেখানে স্বামীজীদেব অনেকে এবং ব্রহ্মচারীরা একটার পর একটা ভজন গাইলেন। তাঁরা প্রত্যেকে সুকণ্ঠ এবং সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁদের কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ভালো লাগছিলো। রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত ভজন চললো।

সাড়ে নটায খাবার ঘন্টা পড়লো। সঙ্গীত শেষ কবে স্বামীজীবা বললেন, চলুন! খেযে নেওয়া যাক। খাবার ঘবের দু'পাশে উঁচু লম্বা বেদি। সেখানে স্বামীজীবা অতিথিবা ব্রহ্মচাবীরা এবং অনাথ ছাত্রবাসেব ছাত্রেবা একই পংক্তিতে খেতে বসলাম। ছাত্রদেব কযেকজন পরিবেশন করলো। খাবাব অতি সাধাবণ। নিবামিষ।

ভোর সাড়ে চাবটেয় ঘুম ভাঙলো প্রার্থনা সংগীতেব সুব শুনে। ছাত্রাবাসেব ছাত্রেবা মন্দিবেব বারান্দায সারিবদ্ধ ভাবে বসে শ্রীখোল এবং হাবমোনিযম সহযোগে সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা সংগীত গাইছে। সংস্কৃত কোন স্তোত্র সুব কবে গাইছে। স্তোত্রেব কথাগুলি বুঝতে পাবছি না। তবে শুনতে ভালো লাগছে বলে ওদেব পাশেই বসে পডলাম। অনেকক্ষণ ধবে ছাত্রদেব স্তোত্রগান শুনলাম।

প্রার্থনা শেষ হতেই ছাত্ররা লাইন কবে চলে গেলো। আমিও উঠে এসে দাঁড়ালাম বারান্দাব একপাশে। দেখি, পূর্ব দিগন্ত অকণ রঙে রঞ্জিত। দেখতে দেখতেই বালার্কদেব উদিত হলেন। আমার যুক্ত কব আপনা থেকেই উঠে এলো কপালে। কী একটা পাখী সামনেব গাছটার ঘন পল্লবেব আড়াল থেকে ডাকছে। এতো মিষ্টি সুরে পাখীব ডাক আমি আগে কখনো শুনিনি। তাই নবোদিত সূর্য থেকে ফিবে এসে আমার চোখ পাখীটিকে খুঁজে বেড়াতে থাকলো। বহু চেষ্টা কবেও দেখতে পেলাম না পাখীটিকে।

হতাশ হযে নেমে এলাম ব্রহ্মানন্দ ভবনে। অমনি চাযেব তৃষ্ণাটা উঠলো প্রবল হযে। মনে হেলো, আবাব উঠে গিযে কাজ নেই। গেট পাব হযে বাস্তায খানিক হাঁটি। নিশ্চযই চায়েব দোকানেব দেখা পাবো। যা ভেবেছি ঠিক তাই। বাজার পানে যাবাব রাস্তাটা ধবে একটু যেতেই দেখি দবমা ঘেরা ছোট্ট একখানি ঘব। তার সম্মুখে খান দুই নড়বড়ে বেঞ্চি পাতা। তিন-চাব জন লোক, বোধ হয় আমাবই মতো চা-তৃষ্ণাতুর, সেই বেঞ্চি দুটির উপর বসে।

ছোট্ট জন-বিরল স্থানের মানুষেরা সবাই সবাইকে চেনে। অতএব আমার মতো উটকো লোককে দেখে লোকের কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। "কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবুর" দিয়ে শুরু হোলো আলাপ। ক্রমে পরিচয় জমে উঠতে থাকলো। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে অপেক্ষাকৃত জনৈক নবীন তো বলেই বসলো বাবু তো দেখি ভালো বাংলা বলতে পারেন! এতো ভালো বাংলা শিখলেন কোথা!

বাংলাদেশে এসে অনেক জায়গায় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি। পঞ্চাশের নীচে বয়েস যাদের তাদের অনেকের জানা নেই, ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলাকেও দুভাগ করা হয়েছিলো। যার একটা ভাগ ভারতের অংশ হয়েই থেকে গেছে। সেই অংশের লোকেরাও বাঙালি, বাংলায় কথা বলে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে উত্তরটা গেছে মুখস্থ হয়ে। এখানকার প্রশ্নকর্তাকেও সেই মুখস্থ উত্তরটাই দিলাম। তবে মনে মনে বললাম আসল বাঙালি তোমরাই। মাতৃভাষার জয়ধ্বনি দিতে দিতে তোমরা প্রাণ দিয়েছো। সেই প্রাণের মূল্যে তোমরা অর্জন করেছে মুক্তি পাকিস্থানের অধীনতা থেকে। জগৎ সভায় স্থান করে দিয়েছো আমাদের দুখিনী মাতৃভাষা বাংলাকে। মাতৃভাষাকে মায়ের অধিক সম্মান দিয়েছো। তার পরিচয় পেয়ে এলাম সাগরদাঁড়ীতে, তার নমুনা দেখে এলাম শিলাইদহতে যেখানে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আসছে বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারা আসছে শিক্ষা-ভ্রমণে। আপন করে নিচ্ছে মধুসূদনকে, অন্তরে বসাচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে।

এমন সময় রাস্তা দিয়ে কী যেন হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছিলো একটা লোক। বুঝলাম না কিছুই। এখানকার লোকে যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে সে কথার এক বর্ণও বুঝি না। তখন মুখে তার চাটিগাঁর বুলি। আবার আমার সঙ্গে কথা বলছে যখন তখন মুখে পরিষ্কার বাংলা, যেন কলকাতার কথা।

লোকটিকে ডাকলেন এঁরা। হাতে তার মাটির একটা কলসি। তার সঙ্গে এঁদের কী কথা হচ্ছে হাবে-ভাবে বোঝার চেষ্টা করছি। মনে হোলো যেন খেজুরের রস আছে কলসীতে। আর এক এক গ্লাস খেজুরের রসের দাম এক টাকা করে। এঁরা এক গ্লাস করে রস খেতে শুরু করলেন। আর সেই ফাঁকে আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকলো। রসঅলা আমাদের কথাবার্তা থেকেই ধরতে পেরেছে আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

অন্যদের রস খাওয়া শেষ হলে রসঅলা গেলাসটি ধুয়ে আনলে। তরপর ডান হাতে এক গেলাস রস নিয়ে এবং বাঁ হাতটি ডানহাতের কনুই-এর কাছে ঠেকিয়ে আমার সামনে ধরলো। বাংলাদেশের সর্বত্র দেখেছি লোকে দেবার ও নেবার সময় এইভাবে যুক্ত করে দেয় ও নেয়। দেওয়া-নেওয়ার এই রীতিটি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের নিদর্শন। যেমন আমরা দেবতাকে যুক্ত করে অঞ্জলি দিই এবং প্রসাদ গ্রহণ করি।

দেখি, লোকটির মুখে স্মিত হাসি। বললাম, এখন তো চা খাবো। এখন রস খাবো না আমি।

লোকটি বলল, কেন বাবু! সকালের তাজা রস। এখুনি পেড়ে আনলাম। খেলেই মনটা তাজা হয়ে উঠবে। এমন রস খাবেন না কেন, বাবু!

তার সঙ্গে যোগ দিলেন অন্য সকলেও। তখন কী করি। ভাবলাম, উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে। আর আমি এক গেলাস রস গিলতে পারবো না। এক চুমুকেই শেষ করে দিলাম এক গেলাস রস। রসঅলা কিন্তু তৈরি-ই ছিলো। শেষ হতেই আবার এক গেলাস রস দিলো। তারপর সকলের মতো আমিও দু'গ্লাস রসের দাম দুটো টাকা তার হাতে দিতে



সীতাকুণ্ড — রামকৃষ্ণ আশ্রম

সন্ধ্যায় ফিরে এলাম শংকর মঠে। শ্রীগুরু মন্দির থেকে ভক্তিগীতির সুর ভেসে আসতেই উপস্থিত হলাম সেখানে। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত চললো ভক্তিগীতি। তন্ময় হয়ে শুনতে থাকলাম। নৈশ আহারের জন্য খাবার ঘরে যেতেই শ্রীমৎ স্বামী ওম্প্রকাশানন্দজী গিরি মহারাজ আমাকে ডাকলেন তাঁর পাশেটিতে বসার জন্য। সেই সময় স্বামীজী মহারাজের কাছে চন্দ্রনাথ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। স্বামীজী মহারাজ তখন মঠের জনৈক তরুণ কর্মীকে ডাকলেন এবং বলে দিলেন পরদিন সকাল ৭টায় সে যেন আমাকে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে বাবা চন্দ্রনাথকে দর্শন করিয়ে আনে। তরুণ কর্মীটি সম্মত হয়ে চলে গেলো। কিন্তু পর দিন সকাল ৭টার আমাকে নেবার জন্য এলো না দেখে খোঁজ করে করে তার ঘরে গেলাম। আমাকে দেখেই তরুণ কর্মীটি বলে উঠলো, আপনার সঙ্গে আজ তো আমার যাওয়া সম্ভব নয়।

শুনে বললাম, আমার সঙ্গে চন্দ্রনাথে যাওয়া তোমার সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু সেই সংবাদটুকু কি আমাকে জানিয়ে আসা উচিত ছিলো না। আর যেতেই যদি না পারো তাহলে গত সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজের কথায় সম্মতি জানালে কেন!

সে কথাব উত্তরে তরুণ কর্মীটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বললো। বললো, আপনি শুধু শুধু চন্দ্রনাথে ওঠাব এতো কষ্ট কেন কবতে যাবেন! আপনি ববং স্বয়ম্ভুনাথ দর্শন কবে আসুন। স্বযম্ভূনাথেব মন্দিব এমন কিছু উঁচুতে নয়। আপনার কোন কষ্টই হবে না। আব স্বযম্ভূনাথই তো আসল দেবতা।

ধৈর্য ধরে তাব কথাগুলি শুনলাম। তারপব বললাম চন্দ্রনাথে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব না হতে পাবে। তোমাব বক্তব্য এইখানেই শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে তুমি আমাকে ভুল বোঝাবাব চেষ্টা করছো কেন! কোন দেবতা আসল এবং কোন দেবতা নকল, এইসব শোনাব জন্যে আমি তো কলকাতা থেকে আসি নি। আর কোন কথা না বলে এবং তাকে আব কিছু বলতে না দিযে আমি চন্দ্রনাথ মন্দিবেব উদ্দেশ্যে একা-ই যাত্রা কবলাম। শুনেছি, পথ একটাই। সুতবাং পথ ভুল হবার বা পথ হারাবাব ভয় নেই।

পর্বতেব পাদদেশে বেশ খানিকটা যেতে হয় চড়াই পথ ধরে। তারপব সিঁড়ি। সিঁড়ি বেযে খানিকটা ওঠাব পব পেলাম ঘব কযেকের ছোট্ট একটা বসতি। সেই বসতিব পাশেই



সীতাকুণ্ড - - স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির দ্বার
(চন্দ্রনাথ পর্বতেব পাদদেশে)

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির। এগিয়ে গেলাম মন্দিরের দিকে। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের সুন্দর একটি তোরণ। তোরণ পার হয়ে ঢুকলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণে স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিবকে ঘিবে অনেক মন্দির। তাছাড়াও আছে অফিস, রান্নাঘর, অতিথিভবন ইত্যাদি। পাশেই আছে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির। সেগুলি পরিত্যক্ত।

স্বয়ম্ভুনাথ। যিনি নিজেই নিজেকে উৎপন্ন করেছেন। অন্য কেউ তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। সুন্দর একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে এই সম্পর্কে। এক সময় এই অঞ্চল ত্রিপুবা বাজ্যের অন্তর্গত ছিলো এবং বহু প্রাচীন কাল থেকেই এখানে ত্রিপুরী নামে এক জনজাতি বাস করে আসছে। এই ত্রিপুরীদের মধ্যে এক সময় এক অতি দীন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলো। গ্রামের গৃহস্থদের গোরু চড়িয়ে সে জীবিকা সংগ্রহ করতো। গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোরুগুলি সংগ্রহ করতো। তারপব পাহাড়ের গায়ে তাদের চরতে দিয়ে নিজে বিশ্রাম করতো কোন ঘনপল্লব গাছের ছায়ায়। এমনি করে তাব দিনগুলি কোনমতে কেটে যাচ্ছিলো।

এমন সময কোথা থেকে উটকো এক বিপদ এসে দেখা দিলো। এক গৃহস্ত অভিযোগ করতে থাকলো তাব দুধেল সাদারঙেব গোরুটা কিছুদিন থেকে মোটেই দুধ দিচ্ছে না। নিশ্চয়ই গোরু-চবানো লোকটা গেরুটাব দুধ দুয়ে নিয়ে বিক্রি করে।

এই অভিযোগ শুনে গরিব লোকটিব মনে বড়ো লাগলো। সে গরিব হতে পাবে কিন্তু অসৎ নয়। পরদিন সে গোরুটিকে চোখে চোখে রাখলো। এক সময় দেখে, গোরুটি পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থকলো। সে-ও গোরুটির পিছন নিলো। গোরুটি খানিক উঠে এক সমতল-প্রায় জায়গায় এলো। সেখানে ঘোব কৃষ্ণবর্ণেব অতি মসৃণ একটি পাথব ছিলো। গোরুটি গিয়ে সেই পাথবটির দুপাশে পা দিয়ে দাঁড়ালো। আর তাব চাবটে বাঁট থেকেই অঝোব ধাবায় ঝবতে থাকলো দুধ। দুধ দিয়ে পাথবটিকে স্নান কবিয়ে গোরুটি স্বস্থানে নেমে এসে চরতে থাকলো।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে লোকটিতো অবাক। গ্রামে ফিবে এসে গৃহস্থটিকে ও গ্রামেব সকলকে বললো এই অদ্ভুত ঘটনাব কথা। তাব কথায বিশ্বাস না করে গৃহস্থ নিজে দেখতে এলো। এই দৃশ্য নিজেব চোখে দেখে এসে সে গ্রামেব লোকেদের বলতে থাকলো এবং লোক মুখে প্রচারিত হতে হতে কথাটা ক্রমে গিয়ে উঠলো ত্রিপুবাব বাজাব কানে। তখন ত্রিপুরাব রাজা ছিলেন শ্রীধনমানিক্য। তিনি সেই কালো পাথবটিকে নিজ বাজধানীতে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাত্রে স্বপ্নে জানতে পাবেন ঐ প্রস্তবটি স্বয়ম্ভূনাথ। তাঁকে পর্বতগাত্র থেকে তোলা যাবে না। সেখানেই যেন তাঁব মন্দির নির্মাণ কবা হয। তখন ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ। শ্রীধনমানিক্য পর্বত গাত্রের সেই সমতলপ্রায স্থানে স্বয়ম্ভূনাথেব মন্দিব নির্মাণ করেন। তারপর কালের কবাল আক্রমণে স্বযম্ভুনাথেব মন্দির যতোবাব জীর্ণ হয়েছে ত্রিপুরার রাজারা ততোবারই নতুন করে মন্দিব নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন।

স্বযম্ভুনাথেব বর্তমান মন্দিবটিব মাথায গম্বুজ। সাধাবণতঃ মন্দিবেব মাথায থাকে চূড়া বা বত্ন। কিন্তু স্বযম্ভু নাথেব মন্দিবেব মাথায গম্বুজ কেন। গম্বুজ তো থাকে ঐস্লামিক স্থাপত্যবীতিতে গড়া সৌধেব মাথায। কথাটা ভাবতে গিযেই মনে হোলো, বাংলাদেশেব বৃহত্তব ইসলামী সমাজেব স্থাপত্যবীতিব প্রভাব অন্য স্তাপত্য বীতিতে পড়াই তো স্বাভাবিক।

যেখানে শিব সেখানেই শক্তি। স্বযম্ভুনাথেব মন্দিবেব সামান্য দূবে একটি সুন্দব মন্দিবে বিবাজ কবেছেন শিবশক্তি মা-কালী। মা কালীকে প্রণাম কবে বাবা চন্দ্রনাথেব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবলাম। দুটি সাবমেয আমাব সঙ্গ নিলো। ধর্মবাজ নযতো। তাহলে দু'টি কেন। আব আমাব সঙ্গেই বা কেন। ওবা কী উদ্দেশ্যে আমাব সঙ্গ নিলো কে জানে।



সীতাকুণ্ড – স্বযম্ভুনাথ মন্দিবেব গম্বুজ

চলেছি ধীব গতিতে। সঙ্গে সাবমেযদ্বয। এমন সময একটি ১৪/১৫ বছবেব কিশোব পিছন থেকে এসে আমাব সঙ্গ নিলো। তাব ডানহাতে একটা কাস্তে আব বাঁহাতে শুকনো লতা পাকিযে বানানো একটা দড়ি। এক সঙ্গে পাশাপাশি চলেছি, অথচ কেউ কোবো সঙ্গে কথা বলবো না, এতো চলে না বেশিক্ষণ। এই বযেসেব ছেলেবা সাধাবণতঃ লাজুক হয। তাই আমিই প্রথম কথা বললাম। বললাম, তুমি কোথায যাবে খোকা। খোকা ডাকটা

বোধহয় ভালো লাগলো তার। মুখে চোখেই সেই ভালো লাগার প্রকাশ ফুটে উঠলো। উঁচু পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ঐ যে দেখছো মন্দির। ঐটা বিরূপাক্ষ মন্দির। আমি ঐখানে যাবো। মুখে মিষ্টি একটু হাসি নিয়ে বললো। ওর বয়েসটাই যে মিষ্টি।

—তা ওখানে কী জন্যে যাচ্ছো?

—ঘাস কাটতে। ছেলেটা বললো, আমাদেব গোরুর জন্যে।

ওর ঘাস কাটতে যাওয়াব কাবণটা পাছে আমি বুঝতে না পারি তাই বোধ হয ওদেব গোরু থাকার কথাটা জানিযে দিলো। আমি বললাম তা, আমি তোমার সঙ্গে যাবো কি।

ছেলেটা বললো, তুমি চন্দ্রনাথে যাবে তো! তা চলো না। ভালোই তো হবে। বেশ কথা বলতে বলতে যাবো দু'জনে।

ছেলেটা আমার সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ সহজ হয়ে উঠলো। আর সেই সুযোগে আমিও নেমে এলাম 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ। আমি ছেলেটার সঙ্গ নিলাম। নাম তার সন্তোষ। তাব বাবা-মা আছে। তাদের পাঁচটা গোরু আছে। গেরুর দুধ বিক্রি কবে রোজগাব হয। না, বেশি লেখা পড়া করেনি। ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়েছে।

ছেলেটার সঙ্গে যেতে যেতে বছর পনেরো আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়লো। সেবার গিয়েছিলাম রাজস্থান দেখতে। আজমীর সরিফে মৈনুদ্দিন চিস্তির দবগা দেখা শেষ করে চড়ে বসলাম পুষ্করগামী বাসে। আজমীব থেকে পুষ্কর প্রায় সাতমাইল। পাহাড়ে একটা অঞ্চলে পুষ্কর হ্রদ। পবিত্র তীর্থ। মা বলে দিয়েছিলেন পুষ্কর হ্রদে যেন স্নান করি। মাতৃ-আদেশ পালন করতে পুষ্করে স্নান করতে গেলাম। কিন্তু নামবো কী কবে। জলে সোল মাছ যে কিলবিল করছে। জলে নামলে যদি কামড়ে দেয়। খুব ভয়ে ভয়ে নামলাম। মাছ গুলো সরে গেলো। সেই ফাঁকে গোটা চাবেক ডুব দিয়ে সোজা ব্রহ্মা মন্দিরে। পুজো দিয়ে সাবিত্রী, যাবো। তাই শুনে পূজারী বললেন, সেখানে কী জন্যে যাবেন শুধু শুধু। সাবিত্রী মা তো ব্রহ্মাপত্নী। তাঁর আসল অধিষ্ঠান তো এই মন্দিরেই। আপনারা এখানেই তাঁর পুজো দিন। তাছাড়া, সন্ধে হয়ে এসেছে। সাবিত্রী মন্দির থেকে ফিরতে ফিরতে আপনাদের রাত হয়ে যাবে। পথে অনেক সময় নেকড়ের দেখাও মিলে যায়।

এই পর্যন্ত শুনে মীরা বলেছিলো, কাজ নেই সাবিত্রী পাহাড়ে গিয়ে। মা সাবিত্রী আমাদের মাথায় থাকুন। মায়ের মুখে এই কথা শুনে কুনাল বলেছিলো, তাহলে আমবা পুষ্কর শহরটা দেখে নিই। বাসের তো এখনো দেরি আছে। তাই হোলো। কুনালের পবামর্শে আমরা পুষ্কর শহর দেখতে বেরোলাম। পুষ্করকে অবশ্য শহর বলা চলে না। ছোট্ট বসতি মাত্র। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুষ্করের একপাশ থেকে অন্য পাশে পৌছে গেলাম।

সেখানে দেখি একটা কিশোরী মেয়ে তাদের চবতে দেওয়া গোরু গুলোকে বাড়ি নিয়ে

যাচ্ছে। মীরা এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাব সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলো। তারই মাঝে সাবিত্রী-পাহাড়ে মায়ের মন্দির না যেতে পারার দুঃখও জানালো মেয়েটাকে।

শুনেই মেয়েটা বললো, এসব কথা কে বলেছে তোমাদের। ব্রহ্মা মন্দিরের পুরোহিত বুঝি! তারপর হাত বাড়িয়ে দেখালো একটা পাহাডের মাথা। বললো, ঐ দেখো সাবিত্রী পাহাড়ের মাথা। ওখানে মা সাবিত্রীব মন্দির। তোমরা চলে এসেছো অর্ধেকটা পথ। আর নেকড়ে! না না, নেকড়ে, চোর-ছ্যাঁচড় এসব এখানে কোথায় পাবে। মেয়েটার এইসব উৎসাহ দেওয়া কথা শুনে মীরা বলেছিলো, মা সাবিত্রী নিশ্চয়ই এই গয়লানী মেয়েটার বেশ ধরে এসেছেন আমাদেব কাছে।

তা, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠার পথে সঙ্গীরূপে পাওযা ছেলেটা তাদের গোরুর জন্যে যখন ঘাস কাটতে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই সে গোযালা। তাহলে বাবা চন্দ্রনাথও কি এই ব্যাটা গয়লা ছেলেটার বেশ ধাবণ করে এলেন আমার কাছে। হবেও বা! দেবতারা তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বেশ ধাবণ কবেন। বেশ ভালো লাগছে ছেলেটাকে বাবা চন্দ্রনাথ ভাবতে।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উত্তরে ভীষণ উঁচু এক পর্বত শীর্ষে রয়েছে বিরূপাক্ষ মন্দির। ত্রিপুরার মহারাজা বিজযমাণিক্য এই বিরূপাক্ষ মন্দির তৈবি করিয়েছিলেন। এখন এই মন্দিব অযত্নে পড়ে আছে। বহু দিন সংস্কার করা হয় নি। এই অবস্থায় থাকলে খুব বেশি দিন এই মন্দিরের অস্তিত্ব থাকবে বলে মনে হয না।

অপরিসর অথচ উঁচু-উঁচু সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে পা দুটো ধরে এসেছিলো। ক্লান্ত পা দুটোকে টানতে টানতে কোনরকমে এসে বসলাম বাবা বিরূপাক্ষের মন্দিরের দাওয়ায়। একটু জিরিয়ে নিতে হবে। এতোক্ষণ যে সিঁড়ি পথ পার হয়ে এলাম তা খুবই খাড়াই। কিন্তু এর পর যে পথ উঠতে হবে তাকে এক কথায় দুর্গমই বলা যায়। সেই দুর্গম পথের উপরে পর্বত শীর্ষের দিকে হাত বাড়িয়ে সন্তোষ বললে, ঐ দেখো বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির। সেইদিকে চোখ ফিরিয়ে চোখ আর ফেরাতে পারছি না। যেন আকাশের গায়ে আঁকা পট। মন্দির দেখছি। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার সিঁড়িও দেখছি। মন্দির দেখে চোখ উজ্জ্বল হচ্ছে। কিন্তু সিঁড়ি দেখে চোখে জল আসতে চাইছে। এমন সময় সন্তোষ বললে, আর তো যাবো না আমি।

কেন রে! আর যাবি না কেন? শঙ্কিত স্বরে জানতে চাইলাম আমি। তখন সন্তোষ বললে, এই তো বিরূপাক্ষ। এখানেই তো ঘাস কাটতে এসেছি আমি। একটু থেমে আবার বললে, কেন। তুমি একা একা উঠতে পারবে না। মনে মনে সাহস সঞ্চয করে বললাম, বেরিয়েছি যখন যাবো বলে, তখন যেতে আমি পারবো। তবে তুই সঙ্গে থাকলে দুজনে কথা বলতে বলতে যেতাম। পথের কষ্টটা টের পেতাম না। একটু থেমে কথার মোড়টা

একটু ঘুরিয়ে বললাম, তুই এক কাজ কর, সন্তোষ। তোর ঘাসের দামটা আমি না হয় দেবো তোকে। তুই ঘাস কিনে নিবি। এখন তুই চল আমাব সঙ্গে।

ছেলেটা ভাবলো একটু। তার পব বললো, তাই চলো। আমার বিশ্বাস তখন পাকা। এ ছেলে বাবা চন্দ্রনাথ না হয়ে যায় না। চন্দ্রনাথ পাহাড় চূড়ায় উঠতে শুরু করলাম নতুন উদ্যমে। বিরূপাক্ষ থেকে চন্দ্রনাথ পর্বত-শীর্ষে। বিরূপাক্ষ থেকে এই পথেব দূরত্ব বা উচ্চতা কতোখানি জানি না। তবে পথটা খুবই দুর্গম। তবু শেষ পর্যন্ত পার হলাম সেই দুর্গম চড়াই পথ। আমার নতুন উদ্যমে না দেবতার কৃপায জানি না। আমি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বারোশা ফুট উঁচুতে চন্দ্রনাথ পর্বত শীর্ষে উঠে এলাম।



সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড শীর্ষে চন্দ্রনাথেব মন্দিব

কিন্তু এ কি! মন্দিবেব দ্বার যে তালাবদ্ধ। এতো কষ্ট করে উঠে দেব-দর্শন হোলো না! বিমর্ষ মনে মন্দিবেব দাওযায় উঠে এসে বসলাম। একটু জিবিযে নিয়ে শান্ত হতেই চোখ পড়লো, যে পথে উঠে এসেছি তার উল্টো দিকেও একটা সিঁড়ির শ্রেণী নেমে গেছে। সেই পথের প্রায় শ'খানেক সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলে একটা চায়ের দোকান। সন্তোসকে

বললাম, দুঃখ করে কী আর হবে বল। বাবার দর্শন আমাদের কপালে নেই। তা চল। নেমে গিয়ে ঐ দোকানে এককাপ করে চা খাইগে চল।

দোকানে বসে চা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি সন্তোষের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বলে উঠলো, ঐ গো! তোমার কপাল ভালো। ঐ দেখো, পুরোহিত উঠে আসছে উল্টো দিকের সিঁড়ি দিয়ে। এখুনি মন্দিরের দরজা খুলবে। তুমি ঠাকুর দেখতে পাবে।

পরোহিতের সঙ্গে আবার সেই শতখানেক সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম চন্দ্রনাথ মন্দিরে। তখন হাসিমুখে সন্তোষ বললে, এবার আমি চলি। তার হাতে সামান্য কটা টাকা দিলাম। ছেলেটা হাত পেতে টাকা ক'টা নিলো ঠিকই। কিন্তু আমাব মন কিছুতেই মানতে চাইলো না, সে টাকা পাওয়ার আশায় আমার সঙ্গে চন্দ্রনাথ পাহাড় চূড়ায় মন্দির পর্যন্ত এসেছে। আমিও হাসিমুখে বিদায় দিলাম দুর্গম তীর্থপথে পাওয়া আমার সাথীকে। মাত্র তো কয়েক ঘণ্টার সঙ্গী আমার। তবু সন্তোষকে কেমন যেন একজন আত্মীয় বলে মনে হোলো। তাই যতোক্ষণ তাকে দেখা গেলো, আমি মন্দিব বারান্দা থেকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকলাম বিলীযমান সন্তোষের দিকে। কে জানে, জীবনে আর সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হবে কিনা।

বাবান্দাব প্রান্ত থেকে এসে মন্দির দ্বাবে দাঁড়ালাম। মন্দিরের গর্ভগৃহটি বেশ প্রশস্ত। তার মাঝখানে পাথরের বেশ উঁচু বেদি। সেই বেদির ওপর শিব লিঙ্গ (চন্দ্রনাথ) প্রতিষ্ঠিত। আশেপাশে আরও কিছু কিছু দেবদেবীর মূর্তি বসানো আছে।

পুরোহিত মশাই পুজো শেষে আমাব দিকে মন দিলেন। কলকাতা তেকে এসেছি শুনে আগ্রহ নিযে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু কবলেন। বললেন, এই মন্দিবেব বয়েস অনেক। ত্রিপুরার মহাবাজা গোবিন্দমাণিক্য এই মন্দিব তৈবি কবিযে ছিলেন। তবে মাঝে মাঝে অনেকবাব সংস্কার করা হযেছে। আমাব তো দেখে মনে হোলো, সংস্কাব করতে করতে মন্দিবের খোল-নলছে বদল হয়ে গেছে।

বললাম, পুরোহিতমশাই। বাবা চন্দ্রনাথকে শুধু দর্শন করে ফিরে যেতে মন চাইছে না। দেবতার আশীর্বাদও নিয়ে যেতে চাই। পুবোহিত মশাই বললেন, বেশ তো! আপনি দশটি টাকা দিন। আপনাব নামে পুজো দিই।

জোড়াহাতে বললাম, কেবল আমাব নামে নয়, আমাব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের মঙ্গলের জন্যে পূজো দিন। পুরোহিত মশাই হেসে বললেন, বেশ। তাই হবে।

পূজো শেষে প্রসাদ দিলেন কাগজে মুড়ে। বললাম, প্রসাদের আর একটি মোড়ক আমাকে দিন। যাঁব কথায় উৎসাহ পেয়ে এই মহাতীর্থে পৌছুতে পারলাম তাঁর জন্যে নিয়ে যাবো।



চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে
শ্রীরূপক শর্মা (শিমুল) ও তার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে লেখক

নেমে এলাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে। প্রায় সমতলে এসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো চট্টগ্রাম থেকে আসা দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের স । তাদের একজনের নাম রূপক সর্মা। ওরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমাকে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা চন্দ্রনাথ উঠতে পারবো কি? বলালম, আমার মতো বয়স্ক একটা লোক পাহাড় শীর্ষে উঠে তো দেখে এলাম বাবা চন্দ্রনাথকে। ওরা প্রণাম করলো আমাকে। মেয়েটি আমাকে দিলো একটা কমলালেবু। কিন্তু কেন? মেয়েটি কি আমার জন্যে প্রতীক্ষা করে ছিলো? যেমন প্রতীক্ষা করেছিলো শবরী শ্রীরামচন্দ্রের জন্যে। কোন মিল নেই এই ঘটনার সঙ্গে শবরীব প্রতীক্ষার। তবু কমলাটি হাতে নিয়ে গল্পটি মনে পড়লো। খেতে খেতে নেমে এলাম শংকর মঠে।

—☆—

একাদশ অধ্যায়

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মহেশখালি

ঢাকা-চট্টগ্রাম রাজপথেব শাখাপথ ধরে সেখান থেকে সীতাকুণ্ডে শংকব মঠে গিযেছিলাম। শংকর মঠ থেকে বিকসায় সেই শাখাপথ ধরেই আবার ঢাকা-চট্টগ্রাম রাজপথের সেইখানে ফিরে এলাম। বিকসাঅলা বললে, বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলেই বাস স্টপেজ পাবেন। বাঁপাশে এগিয়ে গিযে সতি-সতিই বাস-স্টপেজ পেলাম। বাস-স্টপেজেব আব কোন চিহ্ন না থাক, দাঁড়িয়ে-থাকা অল্প বেশ-কিছু উদ্‌গ্রীব যাত্রী দেখে খোলা-মেলা জায়গাটা এক বাস স্টপেজ বলে চিনতে ভুল হোলো না।

বাস-স্টপেজ গিযে দাঁড়াতেই শ্মশ্রু-শোভিত মুখের ভিতব থেকে মুক্তোব মতো দন্তরুচি প্রদর্শন কবে জনৈক ভদ্রলোক বললেন, মহাশয়েব যাওয়া হবে কোথা? বললাম। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা মিটলো না তাঁব। আবার জানতে চাইলেন, কোথা থেকে আসা হয়েছে আমাব। কলকাতা থেকে এসেছি শুনেই বললেন, কলকাতা থেকে এসেছেন একথা এখানে বলবেন না কাউকে। ইতিমধ্যে শ্মশ্রু শোভিত মুখেব হাসিটি অন্তর্হিত। তাব স্থান অধিকার কবেছে চোয়ালেব কাঠিন্য।

কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছি, একথা কেন বলবো না কাউকে, সে কথা বললেন না তিনি। আমি বললাম, আমাব পাসপোর্ট আছে, ভিসা নিয়েছি। বৈধ সকল প্রকার কাগজপত্র আছে আমার কাছে। আব কলকাতা থেকে এখানে আসাব ওপর বাংলাদেশ সবকার কোন প্রকাব বিধি-নিষেধ জাবি কবে নি। আর, আমি কলকাতা থেকে এসেছি, মাইক বাজিয়ে রাস্তায় বাস্তায় ঘোষণা করার কোন প্রয়োজনও আমার নেই। তবে কেউ যদি জানতে চান, যেমন আপনি জানতে চাইলেন, তাহলেও বলবো না আমি কোথা থেকে এসেছি! অথবা বানিয়ে বলবো অন্য কোন স্থানে নাম।

শ্মশ্রু-ধারী কণ্ঠস্বর ঈষৎ চড়িয়ে বললেন, বললাম তো, বলবেন না কাউকে! আর তর্ক চলে না। যাব কথায় যুক্তি নেই, আছে কেবল উষ্মা, যাব ভিত্তিতে আছে ঈর্ষা ও ঘৃণা, সেই ব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ করার আব কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হোলো না। তাব দরকারও হোলো না। চট্টগ্রাম-গামী বাস এসে পড়লো। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে আমিও উঠে পড়লাম বাসে।

বাংলাদেশেব সর্বত্র যেমন দেখে এলাম, এখানেও তেমনি দেখছি, দূরগামী বাসে মাঝপথে কন্ডাক্টরবা ভাড়ার টাকা নেয কিন্তু টিকিট দেয না। এই ভাড়াব হিসেব তারা কেমন করে রাখে। ভাড়াব টাকা কোথায জমা দেয় তারা, এসব খবর তারা জানে, আর জানেন আল্লা। এই অবস্থায ভাড়া দিয়ে আমি কোথায যেন টিকিট চেয়েছিলাম। একমুখ হেসে কন্ডাক্টর

ভায়া বলেছিলো আপনাগো তো 'জাওন' লইযা খতা। তা সত্যি! যাবার জন্যেই তো বাসে উঠেছি। টিকিটের জন্যে তো নয়। টিকিট নিয়ে কি চিবিয়ে খাবো। সেই থেকে মাঝপথে বাসে চড়ে ভাড়ার টাকা দিয়ে এসেছি সর্বত্র কিন্তু টিকিটেব কথা মুখে আনি নি কোথাও।

তার চেয়ে যেখানে যাচ্ছি সেই চট্টগ্রামের কথাই বলা যাক৷ চট্টগ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কর্ণফুলি নদী। নদীটি চট্টগ্রাম থেকে মাত্র উনিশ মাইল পশ্চিমে গিয়ে বঙ্গোপসাগবে পড়েছে। পার্বত্য নদী বলে কর্ণফুলি যেমন খবস্রোতা তেমনি গভীব। তাই বঙ্গোপসাগব থেকে সমুদ্রগামী জাহাজগুলো এই কর্ণফুলি নদী দিযে চট্টগ্রামে আসতে পাবে। হুগলী নদীব জন্যে কলকাতা যেমন, কর্ণফুলির জন্যেও চট্টগ্রাম তেমনি, বন্দরে পবিণত হয়েছে। অবশ্য চট্টগ্রামেব তুলনায় কলকাতা তো সে দিনের।

চট্টগ্রাম খুব প্রাচীন শহর। তন্ত্রশাস্ত্র ও পুরাণে নাকি এই শহবের উল্লেখ আছে। পুবাণে এই শহরকে 'চট্টল' বলা হয়েছে। খুব প্রাচীনকালে এখানে নাকি চট্টভট্ট নামে এক জতি বাস করতো। তাদেবই নাম অনুসারে এই শহবেব নাম চট্টল হয। অবশ্য চট্টল কথাটা আমাব খুব শোনা। চিত্তবঞ্জনে আমার এক দাদা ছিলেন। তাঁব বাড়ি ছিলো চট্টগ্রাম। চিত্তরঞ্জনে তিনি চট্টল সমিতি গড়েছিলেন। যাই হোক, চট্টলে এসে এই শহবেব নাম 'চিরস্থিব' হযে যায় নি।

একসময গঙ্গা নদী বয়ে যেতো সপ্তগ্রামের পাশটি দিযে। তখন সপ্তগ্রামেব কী জমজমাট অবস্থা। উপমহাদেশে এতো বড়ো বন্দব আব ছিলো না। আমাব 'কত্তামা' বলতেন 'ছেবোক্কাল' তো কারো সমান যায না। তাই গঙ্গা সবে গেলো তো সপ্তগ্রামেরও কপাল ভাঙলো। তখন মাঝি মল্লার থেকে শুরু করে ব্যাপারী-কাববারী সবাই ছুটলো অন্য কোন বন্দরের সন্ধানে। কলকাতা তখনো অনাগত, হুগলী গর্ভে। তাই আবও পূর্বপানে চট্টলে এসে 'থিতু' হোলো অনেকে। এখানে নতুন কবে কাববার গড়ে তুললো। চট্টল যা ছিলো তার চেয়ে বেশি জমজমাট হযে উঠলো।

কিন্তু ছেড়ে-আসা পূর্বপুরুষদেব জন্মভূমিব কথাতো ভুলতে পারে না লোকে। তা, সে তো আমরা এই যুগেও দেখলাম। পূর্ব-পাকিস্থান ছেড়ে আসা মানুষেবা পিতৃপুরুষেব ভিটে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে কবে এনেছে সেখানকাব নামগুলি। নতুন বানানো কলোনীকে সেই সব নামে ভূষিত করেছে। ঠিক তেমনি সেই পুবানো কালের সপ্তগ্রামবাসীরাও চট্টলে এসে তার নাম রাখলেন সপ্তগ্রাম। তারপর যা হয়। সপ্তগ্রাম কথাটার উচ্চারণ বিকৃতি হতে হতে চট্টগ্রাম হয়ে উঠলো।

চট্টগ্রাম নামের পিছনে আরও একটা কারণের দাবীদার আছেন অনেক। ব্রহ্মদেশে, বর্তমানে যে দেশের নাম মায়ানমার, খুব প্রাচীন কালেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিলো। সে দেশে জনবৃদ্ধির জন্যেই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, বৌদ্ধরা চট্টলে আসে এবং চট্টলে ও তার চারপাশে, বসবাস করতে থাকে। কিন্তু মানুষ তো অন্য আর পাঁচটা প্রাণীর মতো পেটে দুমুঠো ভাত পড়লেই সন্তুষ্ট হয় না। ধর্ম, সংস্কৃতি, এই সবও চায়। তাই ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধরা চট্টলে সঙ্গে করে নিয়ে এলো বৌদ্ধধর্ম এবং তার অনুসঙ্গরূপে গড়ে

তুললো মঠ বা চৈত্য। কিছুকালের মধ্যেই চট্টল অঞ্চলে চৈত্যের সংখ্যা এতো বেড়ে গেলো যে লোকে চট্টল না বলে অঞ্চলটাকে বলতে শুরু করলো 'চৈত্যগ্রাম'। আবার সেই উচ্চারণ বিকৃতির কথা বলতে হয়। চৈত্যগ্রাম পরিণত হোলো চট্টগ্রামে।

অবশ্য বিষয়টার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। এক সময়, খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতকে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ জগতে খুবই পরিচিত হয়ে উঠেছিলো। সুদূর তিব্বত, এমন কি চীন থেকেও অনেক বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী এখানে আসতেন। অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত এখানে বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করার জন্যে এসেছিলেন । বৌদ্ধ শ্রমণরা অবশ্য এই শহরকে বলতেন রমাবতী।

চট্টগ্রামের আর একটা নাম চাটিগাঁ। বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামকে বলা হয় চাটিগ্রাম। তা নাম তো অকারণে হয় না। পিছনে একটা কারণ থাকে। এক সময় আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করেন চাইতিগাঁও, যার অর্থ হোলো যুদ্ধে জয় করা নগর। পরবর্তী কোন সময়ে চট্টগ্রাম আরাকানের অধিকার মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এঁড়ে-দাগার মতো চাটিগাঁ নাম রয়ে গেছে।

আরাকান-রাজের উক্তি থেকে চট্টগ্রামের আর একটি নাম হয়েছিলো। চট্টগ্রামের রাজা ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি নাকি বলেছিলেন চি-ত-গং। তার মানে যুদ্ধ করা অন্যায়। অবশ্য যে যুদ্ধ দ্বারা তিনি চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন সেই যুদ্ধটাকেও তিনি চি-ত-গং বলেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু মজার ব্যাপার হোলো, বৃটিশেরা চট্টগ্রামের এতো নাম থাকতে "সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটাকে ধর"-এর মতো চি-ত-গং নামটিকে ধরলেন কেন এবং ঐ নামটিকে ভিত্তি করে চট্টগ্রামের নাম চিটাগং রাখলেন কেন! বোধ হয় ভাবতের বৃটিশ সরকারের সৈন্যসামন্তরা খুবই ধার্মিক ছিলো। তারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতো চি-ত-গং, যুদ্ধ করা খুবই অন্যায়।

শোনা যায়, বিখ্যাত সাধক পীরবদর চট্টগ্রামে এসেছিলেন এবং চট্টগ্রামের রাজার কাছে এক চাটি স্থান চেয়ে নিয়েছিলেন। একটি প্রদীপের আলোকে যতোটুকু স্থান আলোকিত হয় সেই স্থান টুকুর পরিমাণ একচাটি। চট্টগ্রাম রাজ তাঁর প্রার্থনা অনুসারে পীরবদরকে একচাটি স্থান দিলেন। তখন পীরবদর সাহেব এক পাহাড়ের মাথায় তাঁর প্রদীপ স্থাপন করলেন। এই পাহাড়ে অনেক দিন ধরেই অশুভ শক্তির অত্যাচার চলছিলো। পীরবদর সাহেব তাঁর প্রদীপে আলোকিত করে সেই স্থান থেকে অশুভ শক্তি বিতাড়িত করলেন। তখন থেকে ঐ স্থানের নাম হয় চাটিগাঁ।

গল্পটি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিনারায় থাকলেও পীরবদর সাহেবের প্রভাব অপরিসীম। আজও নৌকার মাঝিরা নৌকা ছাড়ার সময় পীর-বদর সাহেবকে স্মরণ করে। তাঁর নাম উচ্চারণ করে যাত্রা শুরু করে।

চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন ছিলো বহুকাল। দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার আগে সীতাকুণ্ডসহ চট্টগ্রামের অনেকখানি অঞ্চল ত্রিপুরার অধিকারে ছিলো। বর্তমানে সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের অধীনে চলে এসেছে।

বাস চট্টগ্রাম শহরে এসে ঢুকলো। তার আগে কখনো বাঁ পাশে, কখনো-বা ডানপাশে অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী দেখতে দেখতে এসেছি। কখনো আবার রেলপথও আমাদের

রাজপথের পাশে চলে আসছে। শহরে ঢোকার পরও এদিক ওদিক দেখতে দেখতে চলেছি। পাহাড়ে এলাকার ওপর শহর। রাস্তাও তাই উঁচু নীচু। কখনো উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। আবার কখনো অনেক নীচে নেমে গেছে। বাসের ভিতর চেয়ে দেখি প্রায় ফাঁকা। একটা নির্জনপ্রায় রাস্তার ধারে এসে বাস থেমে গেলো। কন্ডাক্টর ঘোষণা করলে এই শেষ। বাস আর যাবে না। তাই শুনে বাকি যাত্রীদের সঙ্গে আমিও নেমে এলাম বাস থেকে। পাশেই প্যাডেল-রিকসা। অন্য পাশে অটো রিকসা। উভয়েই ডাকাডাকি শুরু করলো। অটোরিকসার ড্রাইভারকে বললাম, আসকার দীঘির পশ্চিম পাড় চেনো। অম্লান বদনে বললো, খুব ভালো করেই চিনি। চড়ে বসলাম তার অটোরিকসায়।

খানিক এসে অটো-রিকসার ড্রাইভার বললে, কোথায় যাবেন? শুনে আমিতো বিস্ময়ে হতবাক্। যাকে বলে তাজ্জব। তার অটোতে ওঠার আগে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিলো, আসকাব দীঘির পশ্চিম পাড় খুব ভালো করেই চিনি। এখন সে জানতে চায় কোথায় যাবেন। শেষে এক ট্রাফিক পুলিশের শরণ নিলাম। সে ড্রাইভারকে বুঝিযে দিলো আসকাব দীঘির পশ্চিম পাড় কীভাবে যেতে হবে।



চট্টগ্রাম—শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

এখানে অটো রিকসায় উঠলেই কুড়ি টাকা ভাড়া দিতে হয়। সেই যুক্তিতে অটোর ড্রাইভার আরও টাকা চায় তাকে অনেক ঘুরতে হয়েছে বলে। এর আগেই একবার ধমক দিয়েছি। আব একবার ধমক সহ কুড়িটি টাকা তার হাতে দিতেই বিদেয় হোলো সে। আমি ব্যাগ হাতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ঢুকলাম। ঢুকেই ডান দিকে সেবাশ্রমের অফিস ও পুস্তক বিপণী। বাঁ পাশে সেবাশ্রমের পরিচালক ও ছাত্রদের আবাস। মাঝে বিস্তৃত উঠোন। সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম শতবার্ষিকী স্মৃতি সৌধ। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে এই স্মৃতি-সৌধের নির্মাণ শুরু হয়। সেই স্মৃতি সৌধের পশ্চিমে মন্দিরের বেদীর উপব শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তির বামে মা সারদার এবং দক্ষিণে স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপিত। মন্দিরের চারিপাশে বারান্দা মন্দিরকে যেন বেষ্টন করে আছে। দক্ষিণের বারান্দায় প্রতি উষায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সন্ধ্যায় বসে প্রার্থনা ও আলোচনা সভা।

সেবাশ্রমের পরিচালকদের অন্যতম অধ্যাপক পরিতোষ রায়। তিনি স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক। শ্রীবামকৃষ্ণ সেবাশ্রম পরিচালিত ছাত্রাবাসের তিনি সুপারিন্‌টেন্ডেন্টও। তিনি বিশেষ কাজে তাঁর দেশের বাড়ি, শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ-এ, গেছেন। অবশ্য সেবাশ্রম পরিচালনার ভাব দিয়ে গেছেন সহকারী সুপাবিন্‌টেনডেন্ট এর ওপর। পরে জেনেছি, এই সহকারী সুপাবিরিন্‌টেনডেন্ট এখানকার ছাত্রাবাসে থেকেই লেখাপড়া করেছেন। বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছেন।

তাঁর ঘবে গিযে দেখি, তিনি ধ্যানে উপবিষ্ট। তাই ঘরের বাইরে এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বেলুড় বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন পরিচযপত্র হাতে যাই নি। এই অবস্থায় আমার মতো হঠাৎ-এসে-পড়া উট্‌কো কোন লোককে এই সেবাশ্রমে থাকতে দেওয়া আদৌ সম্ভব হবে কিনা ভাবছি বাইবে বসে বসে। এমন সময সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ধ্যান সমাপ্ত করে বাইরে এলেন। তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ দেখতে এসেছি তাও বললাম। সব শুনে সহকারী সুপারিন্‌টেনডেন্ট বললেন, স্যার (অধ্যাপক পরিতোষ রায) বাড়ি গেছেন। অবশ্য প্রেসিডেন্ট আছেন। কিন্তু তিনি তো সেবাশ্রমে থাকেন না। থাকেন শহবের মধ্যে তাঁর বাড়িতে। তবে প্রতিদিনই তিনি আশ্রমে আসেন।

কথা হতে হতেই প্রেসিডেন্ট এসে পড়লেন আশ্রমে। আমার সমস্ত কথা শুনে তিনি বললেন, আমাদের অসুবিধেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনি।

এই সব কথা শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ কবছিলাম। তাই বললাম, আমি আপনাদের বিব্রত করতে চাই না। তাছাড়া, খুবই ক্লান্ত বোধ করছি। প্রায় সাবাদিন বাস যাত্রা করেছি। তাই একটু অনুরোধ করছি। চট্টগ্রাম শহরে নির্ভর যোগ্য কোন একটা হোটেলের ঠিকানা যদি দেন তাহলে সেখানে গিয়ে উঠতে পারি। সেখানে দিন দুই থেকে চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিতে পারি।

সভাপতি মশাই শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, না না! আপনি আমার কথাগুলো সেই অর্থে নেবেন না। আপনি আমাদের এখানেই থাকবেন। বলেই একজন কর্মচাবীকে বললেন, তুমি এঁকে ১৫নং ঘবে নিয়ে যাও।

আমি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৫নং ঘরে আশ্রয় পেলাম। এই ঘরে দুখানি শয্যা রয়েছে। তাব একটিতে রয়েছেন ডাঃ পরেশচন্দ্র রায়। তাঁকে দেখে মনে হোলো বয়েসে তিনি আমার চেয়ে বড়ো। তাই তাকে 'দাদা' সম্বোধন করলাম। পবে জেনেছি, শুধু বয়েসে নয়, তিনি সর্ব বিষযে আমার চেয়ে অনেক বড়ো। অধ্যাপক পবিতোষ রায় এই ডাঃ পরেশ বাযের কৃতী পুত্র। ডাঃ পবেশ রায এই সেবাশ্রমই থাকেন স্থায়ীভাবে।

অন্যটিতে আমি শয্যা নিলাম।

বিকেলে যাত্রা করলাম শ্রী চট্রেশ্ববী দেবীব মন্দিরেব উদ্দেশ্যে। শ্রী শ্রী বামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে চট্রেশ্বরী মন্দিব অনেক খানি। রিকসা ছাড়া গতি নেই। ভাড়া লাগে ছ'টাকা। তা লাগুক। চট্টগ্রামের রাস্তা গুলো উচুনীচু পাহাড়ে এলাকাব হলেও খানাডোবা নেই। বেশ চওড়া বাস্তা।

অনেক খানি এসেছি সহরেব পূর্ব অংশে। পথেব পাশে দোকানেব সাইন বোর্ডে দৃষ্টি পড়তেই দেখি, চট্রোশ্বরী বোড লেখা। চড়াই পথ। খানিক এসে রিকসাঅলা তাব বিকসা থামালো। তাবপব ডানদিকে হাত দেখিযে বললো, এই আপনাব চট্রেশ্ববীব মন্দিব।



চট্টগ্রাম

চট্রেশ্বরী মন্দিরের প্রবেশ দ্বার

বিকসা থেকে নেমে চড়াই পথে একটু যেতেই মন্দিব এলাকা যাবাব প্রবেশ তোবণ। তোরণটি বিশাল। খুব উঁচু। তোরণের পবেই সিঁড়ি। তাব ধাপেব সংখ্যা অনেক। সেই সিঁড়ি বেযে উপরে উঠতে উঠতে বেশ বোঝা যায়, মা চট্টেশ্বরীব মন্দিব প্রতিষ্ঠাব স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিলো ছোটখাটো একটা পাহাড়ের প্রায় সমতল মাথাকে।

সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশেব আবার একটা দরজা। এই দবজা পার হয়ে ঢুকলাম শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরী মাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণেব মাঝখানটিতে আযতাকাব নাটমন্দিব। তখনো মন্দিবেব দবজা বন্ধ। চট্টগ্রামেব এমন কি বাংলাদেশেব অনেক দূব দূব জাযগা থেকে এসেছেন দর্শনার্থীরা। তাঁবাও মন্দিবের দ্বাব খোলার অপেক্ষায় বসে আছেন নাটমন্দিবেব এখানে ওখানে ছড়িযে ছিটিয়ে। তাঁদের অনেকেব সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। শুনলাম, তাঁবা বাংলাদেশেই বযে গেছেন। 'ইন্ডিযা' যাননি। 'ইন্ডিয়া' যাবার সুযোগও পান নি অনেকে। পশ্চিমবাংলা সম্পর্কে ধাবণা নিতান্তই কম। তবে অনেকের আত্মীয়স্বজন চলে গেছেন কলকাতায বা ইন্ডিযাব অন্য জায়গায। তাঁবা মাঝে মাঝে আসেন। তাঁদের কাছে ইন্ডিযার কথা শুনেছেন। বাংলাদেশেব লোকে ভারত না বলে বলেন 'ইন্ডিযা'।



চট্টগ্রাম— চট্টেশ্বরী মন্দিবেব শীর্ষদেশ

বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে শ্রী শ্রী চট্টেশ্বরীর মন্দির শীর্ষে। পশ্চিম দিক থেকে মন্দির শীর্ষ দেখার উপায় নেই। তাই মন্দিরের পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে সূর্যালোকের বিপরীতে আলোকচিত্র নিতে হোলো। সূর্যকে রাখতে হোলো মন্দিব শীর্ষের আড়ালে।

মন্দির শীর্ষ পঞ্চরত্ন। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যে রত্নশীর্ষ মন্দির দেখি তাঁর সঙ্গে ঠিক মিল খুঁজে পেলাম না। স্থাপত্যরীতিতে খানিকটা যেন মোগল আমলের স্থাপত্য রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। মন্দিরের মাথার মাঝখানে বেশ বড়ো একটি রত্ন খানিকটা গম্বুজাকৃতি। তার চারপাশে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু দেখতে প্রায় একই রকম চারটি গম্বুজাকৃতি রত্ন।

সন্ধে প্রায় ছ'টায় মন্দিরের দবজা খোলা হোলো। দবজার কাছে গিয়ে দেখি, মন্দিবের গর্ভগৃহে কালীমূর্তি অধিষ্ঠিতা। কালী করালী, করাল বদনা, চতুর্ভুজা, দিগ্‌বসনা মা চট্টেশ্বরীকে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না, আনন্দ মঠের কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো "......ব্রহ্মচারী তাঁহাকে (মহেন্দ্রকে) এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই পথে আইস।' ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালী মূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।'

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, 'কালী'।

ব্র। কালী—অন্ধকাব সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনাব শিব আপনাব পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দব ধাবা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাতে খেটক খর্পর কেন?

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দেমাতবম।

'বন্দেমাতরম' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল।"

এই দেবী সাধারণেব কাছে চট্টেশ্ববী নামে পরিচিত। অনেকে আবার চট্টলেশ্বরীও বলে থাকেন। পুরোহিত মশাই বললেন, এক সময় এই অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমবা আমাদের পূর্বপুরুষ পরম্পরায় শুনে আসছি, ত্রিপুরেশ্বর ধনমাণিক্য মা চট্টেশ্ববীব প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই মাযের মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে ভক্তগণের অর্থে মন্দির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে অনেকবার।

বাব্‌রি-মসজিদ ভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় মা-চট্টেশ্বরীর মূর্তি ধ্বংস কবা হয়। মন্দিরেরও বিরাট ক্ষতি সাধন করা হয়। কে জানে, বাববি মসজিদ ধ্বংসের কাজে মা-চট্টেশ্ববীব অপরাধ কতোখানি। তবে 'মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়' বলে কথা তো আছে একটা।

মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান কালী মূর্তিটি কালো কষ্টি পাথরের তৈরি। কালীমূর্তির পদতলে শায়িত শিবমূর্তি শ্বেত পাথরের। শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ মহাশয়ের বদান্যতায় ভারতে এই মূর্তি নির্মাণ করা হয়। পরে ভারত থেকে এনে এই মন্দিরে মা-চট্টেশ্বরীর মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।

মাকে প্রণাম করে এবং কিছু পূর্বে আলাপিত এক নবদম্পতির দেওযা প্রসাদ খেয়ে বেরিয়ে এলাম মন্দির থেকে। না, এবার আর রিকসা নয। চট্টেশ্বরী রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। দু'পা হেঁটেছি কি হাটি নি, অমনি দেখি রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। ঢুকলাম মন্দির চত্বরে। বেশ বড় নাট মন্দির। নাট মন্দিরের সম্মুখে মূলমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি বিরাজ করছেন।

খুব প্রাচীন কাল থেকেই এই উপমহাদেশে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মতের মধ্যে, বিশেষ করে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে, একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরের মতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং অন্যের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করাই যে প্রকৃত মঙ্গল, স্থূল হলেও এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এই উপমহাদেশের মানুষ। তাই বোধ হয় শাক্তদের কালী মন্দিরের পাশে বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের মন্দির গড়তে কোন বিরোধের প্রয়োজন হয় নি।

রাধাকৃষ্ণের মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে, না, এবারও আর রিকসা নয়, স্বীয় চরণ ভরসা করে যাত্রা শুরু করলাম। আমার এক চাটগাঁয়ী দাদার কাছে শুনতাম, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি খুব মনোরম। হযতো সত্যি সত্যিই মনোহর ছিলো চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার সেই দাদার সকলই সুন্দর দেখার বযেস কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে। তিনি নিশ্চযই চট্টগ্রামকে দেখতেন সেই সন্ধিক্ষণের চোখ দিয়ে। আজ ইহজগতে ফিরে এসে আবার যদি চট্টগ্রামে আসতেন, তাহলে দেখতে পেতেন মানুষের ভিড়ে প্রকৃতি গেছে হারিয়ে। দালান কোঠার অবসরে প্রকৃতি দেবী আশ্রয়হীনা। তবে স্বীকার করতেই হবে উঁচুনীচু এই পাহাড়ে ভূমির ওপর ঘর বাড়িও তাদের ফাঁকে ফাঁকে দুচারটে গাছপালায় সাজানো চট্টগ্রামকে দেখতে ভালোই লাগে।

পরদিন সারাদিন ধরে চট্টগ্রাম শহর ও তার আশপাশের দর্শনীয়গুলি দেখে বুঝলাম চট্টগ্রামে দর্শনীয় স্থান অনেক আছে। তবে কথা হোলো, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখবেন। যদি ধর্মপ্রাণ হন আপনি তাহলে চট্টেশ্বরীর মন্দির দেখবেন, রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখবেন। অথবা দেখবেন পীরবদর উদ্দিন সাহেবের দরগাহ। শোনা যায, শ্রীহট্ট জয করার পর শাহ্ জালাল তাঁর একজন সেনাপতিকে চারিপাশের রাজ্যগুলি জয করার আদেশ দিলেন। এই সেনাপতির সঙ্গে ছিলেন চারজন আউলিয়া। এই আউলিয়াদের একজন ছিলেন পীর বদর উদ্দিন আউলিয়া। তিনিই প্রথম চট্টগ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন, বলা হয। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি স্থলে পীর বদর উদ্দিন দরগা নির্মাণ

করা হয়। এই দরগাহে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তগণ, শির্নি দিযে থাকেন। আর নৌকা যাত্রার সময হিন্দু মসুলমান সব ধর্মেব মাঝিরা বদর বদব বলে যাত্রা করে সে কথা তো আগেই বলা হযেছে।

আর যদি আপনি দেশপ্রেমী হন। তাহলে আপনি সোজা চলে যাবেন জালালাবাদ পাহাড়ে। আর যাবেন পুরানো দিনের সেই অস্ত্রাগাবে। যেখানে অসমসাহসিক এক স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘটেছিলো। এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আখ্যা দেওয়া হযেছে। কিন্তু কেন? এই যুদ্ধকে লুণ্ঠন বলা হয় কেন? যে সম্পদে আমার ন্যায় সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত নয়, সেই সম্পদে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম কি লুণ্ঠন হতে পারে!

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ভাবতেব স্বাধীনতা সংগ্রামেব এক গৌববময় অধ্যায। সেই অধ্যায়টি না জানলে চট্টগ্রামকে জানা সম্পূর্ণ হবে না।

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোবে ভাবতীয় জাতীয কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতেব পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হয। এই প্রস্তাব থেকে প্রেরণা লাভ কবেন চট্টগ্রামেব কয়েকজন বিপ্লবী যুবক। তাঁরা স্থিব কবেন বৃটিশ শাসকেব হাত থেকে চট্টগ্রামকে কেড়ে নিযে সেখানে স্বাধীন সবকার প্রতিষ্ঠা কবতে হবে। এই পবিকল্পনাব নেতা ছিলেন সূর্যসেন। যিনি মাস্টাবদা নামে সমধিক পবিচিত ছিলেন।

সূর্যসেনের প্রধান সঙ্গীদেব মধ্যে ছিলেন অনন্তলাল সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং নির্মল সেন। স্থিব হয ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ গুড-ফ্রাইডে, বাত্রি ১০টা ১০ মিনিটে, একই সঙ্গে অস্ত্রাগার, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসে, ইউবোপিযান ক্লাবে, সৈন্যবাস, বেলপথ প্রবৃত্তি অধিকার কবা হবে। তাবপব বিপ্লবী সূর্যসেনেব নেতৃত্বে স্বাধীন চট্টগ্রাম সবকাব প্রতিষ্ঠা কবা হবে।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুসাবে ভাবতেব সাধাবণতন্ত্রী বাহিনী সূর্য সেনেব নেতৃত্বে বাত্রি ১০টা ১০ মিনিটে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান গুলি আক্রমণ কবে অধিকাব কবে নেয। তারপব বিপ্লবীবা পুলিশ অস্ত্রাগাবে সমবেত হন এবং চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানেব সর্বাধিনাযক সূর্য সেন স্বাধীন চট্টগ্রামে স্বাধীন ভারতেব পতাকা উত্তোলন কবেন। তাঁব নেতৃত্বে স্বাধীন চট্টগ্রাম সবকাব প্রতিষ্ঠিত হয!

চট্টগ্রামেব ইংবেজ বাজপুরুষেবা চট্টগ্রাম বন্দবে অবস্থিত এক বিদেশী জাহাজে সপরিবারে আশ্রয় নেয়। জাহাজটি চলে যায বঙ্গোপসাগরে এবং সেই জাহাজ থেকেই কলকাতায বেতারে এই অভ্যুত্থানেব সংবাদ পাঠায়।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভাবতেব সাধারণতন্ত্রী বাহিনীব সকলেই উপস্থিত হলেন শহবেব নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে। ২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ ইংরেজ বাহিনী আক্রমণ কবলো জালালাবাদ পাহাড়। বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধে বিবাশীজন ইংবেজ সৈন্য নিহত হয। তখন ইংরেজ বাহিনী পাহাড়েব উল্টো দিকে উঠে মেসিনগান চালাতে থাকে। তার ফলে বিপ্লবীদেব বারোজন শহীদ হন।

জালালাবাদ ছোট্ট একটা পাহাড় মাত্র। তাব এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা দিযে তার স্থান হ্তে পাবে ইতিহাসেব পাতায। তবু জালালাবাদ পাহাড়েব সানুদেশে দাঁড়ালে মাথা আপনা থেকে নত হযে আসে শ্রদ্ধায। তখনই প্রশ্ন জাগে মনে, কেমন ছিলেন সেই বিপ্লবী তরুণেবা। কোথা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁবা। কেমন কবে তাঁদেব মনে জেগেছিলো সেই দেশপ্রেম যার বলে ভাবতে পেবেছিলেন "জীবন মৃত্যু পায়েব ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।"

কবিব মনেও সেই একই প্রশ্ন জেগেছিলো এমনি কোন দুর্জয বিপ্লবীদেব কাহিনী শুনে। আব সেই প্রেবণায লিখেছিলেন

"আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হযে ছুটে
কী যন্ত্রণায মবেছে পাথবে নিষ্ফল মাথা কুটে।"

সেই তরুণ বালকেবা যে পাথবে নিষ্ফল মাথা কুটে মবেছে সেই পাথব দিযেই রচিত হয়েছে আজকেব স্বাধীন দেশেব ভিত। অথচ, সেই তরুণ বালকেবা হাবিযে গেছে বিস্মৃতিব অতলে। তাদেব স্থান নিয়েছে আদর্শহীন তরুণেবা পশ্চিমেব ভোগবাদেব দিকে যাদেব চোখ। এখন প্রতিনিয়ত দেখি, বাষ্ট্রপতি জাঁকজমক কবে লক্ষ টাকাব ইনাম দিচ্ছেন নানা আব দেশেব তাবকাদেব। অত্যুৎসাহীবা নাচতে থাকে তাদেব মাথায তুলে। অবশ্য সান্ত্বনা পাই ভেবে যে এই সব তাবকাব দল উল্কাপিণ্ড মাত্র। ক্ষণিকজ্বলে পড়ে যায ভূমিতে মুখ থুবড়ে। অথবা তাবা সাগবেব ঢেউ মাত্র। "মিলি মিটি যাওব সাগব লহবী সমানা।" কিন্তু লোকে মনে না বাখলেও দেশপ্রেমেব আলোকে উজ্জ্বল হযে থাকবে সূর্যসেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, প্রীতিলতা ওযাদ্দেদাব, কল্পনা দত্তবা।

জালালাবাদকে সম্বোধন কবে বলতে ইচ্ছে হোলো, তুমি স্বাধীনতাব সেই বীব সৈনিকদের দেশভক্তিব সাক্ষী। তোমাব বুকে তাদেব বুকেব বক্ত দিযে লিখে রেখে গেছে তাদেব দেশপ্রেমেব কথা। দেশেব লোকে ভুলে যদি যায সেই মহান দেশ প্রেমিকাদের কথা, তুমি যেন তাঁদেব ভুলে যেয়ো না, জালালাবাদ। সেই বীবদেব ধাবণ কবে তুমি ধন্য হয়েছিলে। আমি জালাবাদেব সানুদেশেব ভূমিতে আমাব মস্তক অবনত কবলাম।

কক্স্ বাজার (Cox's Bazar)

চট্টগ্রামের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে পরদিন সকালে যাত্রা করলাম কক্'স (Cox's) বাজারের উদ্দেশে। গত সন্ধ্যায় অধ্যাপক পবিত্রোষ রায় বলে দিয়েছিলেন কীভাবে কক্স বাজারে যেতে হবে। তাঁর নির্দেশ অনুসারে রিকসায় এলাম চট্টগ্রাম জেনারেল পোস্ট অফিস। জিপিও র পাশেই এস্ আলম কোম্পানির অফিস ও বাস স্ট্যান্ড। সেখান থেকেই ছাড়ে কক'স্ বাজার যাওয়ার বাস। বাসের টিকিট পেতে অসবিধে হোলো না। পঁয়ষট্টিটি টাকা গুনে দিয়ে কক'স বাজার যাওয়ার একখানি টিকিট পেলাম। টিকিট হাতে বাসে উঠে বসলাম। চট্টগ্রাম থেকে কক্'স্ বাজারের দূরত্ব কম নয়। প্রায় আশী কিলো মিটার।

বাস ছাড়লো সকাল ৮ ৩০ মিনিটে। জাপানী বিলাস বহুল বাস। বাস যাবার রাস্তাটিও প্রায় নতুন। বাসের দোলায় ঘুম এসে যাচ্ছে। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না তো। সম্মুখে পড়ে আছে অনন্ত ঘুম। এগিয়ে আসতে সেই ঘুমের দেরি হবে না বেশি। অতএব ভগবানের দেওয়া চোখদুটি দিয়ে দেখতে দেখতে চলি।

এই রাস্তা আগে ছিলো না। আগে স্থলপথে চট্টগ্রাম থেকে কক'স বাজার যাওয়ার উপায় ছিলো না। যেতে হলে জলপথ ছাড়া গতি ছিলো না। চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে স্টিমার চড়তে হোতো। স্টিমার কর্ণফুলি নদী ধরে গিয়ে পড়তো বঙ্গোপসাগরে। তারপর সোজা দক্ষিণ মুখে ছোটোখাটো একটা কালাপানি যাত্রা সেরে উঠতে হোতো এসে কক'সবাজার বন্দরে। সেই সমুদ্র যাত্রা ছিলো সারা দিনরাতের। সঙ্গে চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে যেতে হোতো।

এখন কর্ণফুলির ওপর সেতু বানানো হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে কক'স্ বাজার পর্যন্ত নতুন রাস্তাও বানানো হয়েছে। ফলে, যাত্রার ধকল, সময় এবং সর্বোপরি অর্থব্যয় গেছে অনেক কমে।

ভেবেছিলাম, পথে বাংলার চিরপরিচিত সেই একই দৃশ্য দেখতে পাবো। কিন্তু যে দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি তা ঠিক বাংলার সমভূমির দৃশ্য নয়। রাস্তার বা দিকে অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী আমাদের সঙ্গে চলেছে। ডান পাশটা সমতল। কাছেই সমুদ্র। তবে দেখা যায় না বাস থেকে। পথে কর্ণফুলি নদীপার হয়ে এসেছি চট্টগ্রাম ছেড়েই। কক স্ বাজার ঢুকতেই আবার এক নদী। নাম তার মহিষখালি। বাংলাদেশ সত্যিই নদী মাতৃক।

বেলা ১ ৩০ মিনিটে বাস এলো কক্'স্ বাজারে। বাস থেকে নেমে দেখি, বেশ ভিড়-ভাট্টার শহর। তুচ্ছ করার মতো নিতান্ত ছোটোখাটো নয়। আর ছোটো খাটো হবেই-বা কেন। এক সময় এই কক্'স বাজার ছিলো চট্টগ্রাম জেলার একটা মহকুমা। এখন নিজেই একটা জেলা হয়ে উঠেছে। সেই কথায় আছে না, দশ জনার এক জনা। কক্স বাজারও তাই, চৌষট্টি জেলার এক জেলা। সেই জেলার সদর শহরও কক'স বাজার।

তবে দৈর্ঘ্যে যতো বড়ো কক্স্ বাজার প্রস্থে ততো নয়। আড়ে নয়, দীঘে খুব বড়ো। সাপের মেরুদণ্ডের মতো মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চলে গেছে একটা রাস্তা। তার থেকেই পাঁজরের হাড়েব মতো আশপাশেব বাস্তাগুলো।

একটা রিকসায় উঠে রিকসাঅলাকে বললাম, চলো বাবা ছোটোখাটো একটা হোটেলে নিয়ে চলো আমাকে। তা নিয়ে এলো সে। সেই সঙ্গে বিকসার ভাড়াটা যাতে একটু মোটা আকাবেব হয তাব ব্যবস্থাও কবলো সে। সমুদ্রের প্রায ধাবে বড়ো বাস্তাব ওপরেই একটা হোটেলে নিযে এলো। নাম তাব নুরানি। কিন্তু আসাব পথে অগুনতি হোটেল ছেড়ে নুরানিতে আনলো কেন সে! বোধ হয কমিশনেব ব্যবস্থাটা ভালো এখানে। তাহোক এইসব ছোটো-খাটো ব্যাপারে মাথা ঘামাতে নেই।

হোটেলের তিনতলায় ঘর মিললো। দুই শয্যায ঘর। চার্য দৈনিক আশী টাকা। অবশ্য কথা হতে হতেই আমাব বাংলাদেশে আসাব উদ্দেশ্য শুনে হোটেল ম্যানেজাব বললো, ঘরখানাব দৈনিক বাড়া আশী টাকা ঠিকই। তবে আপনি তো একা । তার ওপর বিদেশী মানুষ। আপনি ঐ ষাটটা টাকাই দেবেন। এক ঝটকায কুড়ি টাকা মাফ হয়ে গেলো। মন্দ কী। আর সত্যিকথা বলতে কি, হোটেল ম্যানেজাবের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেলো।

স্নান সেবে খাবার জন্য তৈবি হযে এসে ম্যানেজাবেব কাছে জানতে চাইলাম কাছাকাছি খাবাব হোটেল কোথায পাবো? এক গাল হেসে ম্যানেজাব বললে, এই তো! পাশেই বযেছে ভাতঘব।

ভাতঘব। ভাত খাবাব হোটেলেব নাম ভাতঘর। এব চেযে বেশি বাঙালিপনা আব কী হতে পারে। বলতে গেলে বাঙালিত্বেব হদ্দ একেবাবে। অবশ্য নামের ব্যাপাবে এমনি বাঙালিপনা এব আগে সারা বাংলাদেশ ঘুবতে ঘুরতে কতো দেখে এলাম। ভাই-ভাই সাইকেল ভাণ্ডাব, কিংবা মামা-ভাগ্নে বস্ত্রালয়, এমনি সব নাম দোকানের, শিল্পকাবখানাব, হোটেলের, চাযের দোকানের। দেখে শুনে মনে হয, বাংলাদেশে বাংলা প্রেম চুড়ান্তের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ভাতঘরে ভাতেব দাম কিন্তু কম নয়। মাছ ভাতের দেশে মাছ দিয়ে দুমুঠো ভাত খাবে তাব জো নেই। লাগলো পঁচিশ টাকা। বুঝলাম, এই মাছ ভাতের দেশে, আকাল চলছে মাছ এবং ভাত উভয়েব। এর আগে উত্তরবঙ্গে শুনে এসেছি, ভাবত ও ব্রহ্মদেশ থেকে চাল, এমন কি মাছও আমদানী কবতে হচ্ছে এখন।

বিকেলে বেরিযে পড়লাম, কক্স বাজারে সমুদ্র সৈকত দেখতে। সমুদ্রের বেলাভূমি দেখতে এখানে সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে। সে যেন কে জগদ-মেলা বসে যায বিকেল হলেই। ঠিক এমনি জগদ্-মেলা দেখেছিলাম রাজস্থানের জয়সলমিরে। সেখানে মরুভূমিব বালিয়ারিতে উঠে সূর্যাস্ত দেখতে লোক আসে ইউবোপ আমেরিকা থেকে, লোক আসে চীন জাপান থেকে।



ককস বাজাব সমুদ্রতটে সূর্যাস্ত

এতো বডো আব এতো দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত নাকি এশিযাব আব কোথাও এমনই। আত্মগর্বে উৎসাহীবা বলেন সাবা পৃথিবীতে এতো বডো সাগব সৈকত আব নেই। এই সব কথা অবিশ্বাস কবাব সাহস হয না আমাব। আবো উৎসাহীদেব মধ্যে যাঁবা অত্যুৎসাহী তাঁবা যদি বলে বসেন সাবা সৌব জগতে এতো বডো সাগব সৈকত আব নেই আমি তৎক্ষণাৎ তাঁব বাক্য অম্লানবদনে শিবোধার্য কববো। তবে কিছু জানেন শোনেন, সামান্য খববাখববও বাখেন, এমন লোকেবা বলেন এই সমুদ্র সৈকতেব দৈর্ঘ্য প্রায ৭৫ মাইল, এখনকাব ডেসিম্যালেব হিসেবে প্রায ১২০ কিলোমিটাব।

সমুদ্র তট পৌঁছুতে তখনো প্রায কিলোমিটাব খানেক বাকি, বিকসাঅলা বললে এখানেই নামতে হবে বাবু। আব যাওযা পুলিশেব বাবণ। চেযে দেখি, বাস্তাব ডান দিকে শ'খানেক বিকসা লাইন দিযে দাঁডিযে। আব বাঁপাশে দোকান। তাতে সৌখিন জিনিস সাজানো। শাঁখেব আর ঝিনুকেব তৈবি অলঙ্কাব আব ঘব সাজানোব জিনিসই বেশি। তা, ওসবে তো দবকাব নেই আমাব। তাই ছোটোমুখে সক্রেটিসেব বডো কথাটিই মনে মনে বলালম, হায।

হায়! জগতে এতো জিনিসও আছে! অথচ একটিতেও আমার দরকার নেই! সাগর সৈকতে যাবার সোজা পথটি ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

সত্যি, এতো বড়ো আব এতো মনোবম সাগব সৈকত আমি আগে দেখিনি। পুরী, গোপালপুর, চেন্নাই, পণ্ডিচেবি, বামেশ্ববম, ধনুষ্কোডি, কন্যাকুমারিকা, কোভালাম, কোচিন, আলেপপী এতোগুলি স্থানে সাগর-সৈকত দেখেছি! কিন্তু কক্স বাজারের সাগর সৈকতের সঙ্গে অন্য কোন স্থানের সাগব সৈকতেব তুলনায় হয় না। এখানে সমুদ্রে পুবীর সমুদ্রেব মতো বড়ো বড়ো ঢেউ উঠেছে। তবু এখন বেশ শান্ত। শুনেছি, ঝড়ের সময়ও এই সাগরের তুলনা মেলা ভার। স্নান করাও বিপজ্জনক নয় এখানে। পুরীতে নুলিয়ারা আছে অনভ্যস্তদেব স্নান করিয়ে দিতে। এখানে নুলিয়া দেখলাম না।

এই সমুদ্রে সৈকতের দৈর্ঘ্য সত্যি সত্যিই ১২০ কিলোমিটার কিনা সচক্ষে দেখলে কেমন হয। দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটেতেই দেখি সূর্যদেব অস্তাচলে এসে হাজির হলেন। তারপর এক কিলোমিটারও হাটিনি তিনি সাগব জলে নিমজ্জিত হবার আয়োজন কবতে থাকলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। সূর্যদেবের অস্ত যাওয়ার এই অপরূপ দৃশ্যটিও আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে থাকলো। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হোলো যে পথে সামান্য এক কিলোমিটার হাঁটতেই সূর্যাস্ত হয সেই পথ কতো না দীর্ঘ।

সমুদ্র-সৈকত থেকে ফেবাব পথে একটা কৌতূহল এসে আমাব মনটাকে জুড়ে বসলো। এই শহরেব নাম কক্স (Cox's) বাজাব হোলো কেন? কক্স (Cox's) কথাটার পবে যখন 's জোড়া বযেছে তখন নিশ্চয়ই কক্স নামে কোন ব্যক্তিব বাজাব হিসেবে প্রথম এই শহবেব পত্তন হয়েছিলো। কিন্তু কে ছিলেন সেই কক্স সাহেব?

হোটেলে ফিবে দেখি, ম্যানেজাবেব অফিসে খোশ গল্প চলছে কযেক জনের। তাঁদের মাঝে প্রশ্নটি বাখলাম। তখন এ ওব মুখপানে চাইতে থাকলেন। বুঝলাম, কক্স বাজাবের মাঝে থাকতে থাকতে এবং শহরটির নাম অনবরত শুনতে শুনতে নামটির ধার গেছে ভোঁতা হযে। নামেব কাবণ সম্পর্কে কৌতূহলও গেছে মবে। তবে না জানলেও ওঁদেব একজন বললেন, আপনি কক্স বাজাবে সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে যান। সেকানে কেউ না কেউ বলতে পাববেন।

খোঁজ কবে কবে গেলাম সেন্ট্রাল লাইব্রেবিতে। আমাব সেন্ট্রাল লাইব্রেবি দেখা হোলো। কিন্তু কৌতূহল মিটলো না। তবে একজন বললেন, আপনি প্রেস ক্লাবে যান। সেখানে জানতে পারবেন কেন এই শহবেব নাম কক্স্ বাজার হোলো।

গেলাম সেই ক্লাবে। প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব মহম্মদ নুরুল ইসলাম খুব সমাদর কবে বসালেন আমাকে। প্রেস ক্লাব সম্পর্কে বললেন, এই প্রেস ক্লাবে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি 'দৈনিক কক্স বাজার' পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে জনাব মহম্মদ নরুল ইসলাম জানালেন কক্স নামে চট্টগ্রামের জনৈক

প্রশাসক এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই নামে এই শহরের নাম হয় কক্‌স্ (Cox's) বাজার। বাংলায় হওয়া উচিত কক্স সাহেবের বাজার। এর বেশি আর কিছু জানার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

পরে জেনেছি, ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের, বর্তমান মায়নামারের, যুদ্ধ হয়। কী কারণে যুদ্ধ বাধে বলা শক্ত। তবে তখনকার উপনিবেশপন্থী ইংরেজদের কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কোন কারণের দরকার হোতো না। যুদ্ধ বাধলো, যুদ্ধ চললো, যুদ্ধে জয় হোলো তারপর ধীরে সুস্থে একটা কারণ খুঁজে বার করা হোলো। অথবা তৈরি করা হোলো, এমন একটা অকাট্য যুক্তি যার জন্যে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় ছিলো না সদাশয় বৃটিশ সরকারের।

সেই ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বৃটিশ ব্রহ্মযুদ্ধের বৃটিশ সেনানায়ক ছিলেন জেনারেল কক্‌স্। এই যুদ্ধে জেনারেল কক্‌স্ আরাকানসহ দক্ষিণ ব্রহ্মের অনেকখানি অঞ্চল বৃটিশ অধিকারে নিয়ে আসেন। সেই সময় প্রায় আশী হাজার আরাকানবাসী মগ আরাকান ছেড়ে চলে আসেন চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে। জেনারেল কক্‌স্ এই আরাকান ত্যাগী মগদের দক্ষিণ চট্টগ্রামে বসবাসের সুযোগ করে দিলেন। সেই মগদের নিয়েই অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গড়ে উঠলো এই শহর। শহরের নাম হোলো কক্‌স্ বাজার।

এই মগেরা আর ফিরে যায় নি আরাকানে। পরে জন বৃদ্ধির ফলে মগেদের একটা অংশ পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালিতে গিয়েও বসবাস করতে থাকে।

এই মগেরা রাখাইন নামেও পরিচিত। বঙ্গোপসাগরের উপকুল বরাবর চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলেই এদের বাস। ধর্মে এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ। এদের উপাসনা কক্ষগুলি বর্মী-ধাঁচের কাঠের তৈরি। মগেরা খুব রক্ষণশীল। তাই তারা আজও তাদের ধর্ম সংস্কৃতি নিয়ে টিকে আছে। স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় নি। তবে বর্তমানে তাদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসার হচ্ছে। আর খুব কর্মঠ বলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আর্থিক দিক থেকেও বেশ স্বচ্ছল। আগে এদের মূল জীবিকা ছিল লুঙ্গি তৈরি করা। ব্রহ্মদেশের মেয়ে পুরুষ সবাই তো লুঙ্গি পরে। সুতরাং লুঙ্গির কাপড় বোনা, লুঙ্গি তৈরি করা সেখানে খুবই প্রচলিত। কক্স বাজারে আগত মগেরা ব্রহ্মদেশ থেকেই এই জীবিকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো। বর্তমানে অবশ্য আরও নানারকম কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছে। শান্তিনিকেতনী ব্যাগের মতো রাখাইনরাও একরকম ব্যাগ তৈরি করে। কুটির শিল্পজাত এইসব দ্রব্য বিক্রী করে রাখাইনর মেয়েরা। কক্স বাজারের প্রধান রাস্তার পাশে তারা গড়ে তুলেছে সুন্দর সুন্দর দোকান। কক্স বাজার তো পর্যটন কেন্দ্র। অনেক পর্যটক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। তারা রাখাইন মেয়েদের দোকান থেকে নানা জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

রাখাইন মেয়েরা মোটেই পর্দানশিন নয়। এমনিতেই এই মেয়েরা খুব সুন্দরী। তার ওপর খুব সাজগোজ করে তারা। কি অপূর্ব তাদের মুখশ্রী। বিধাতা যেন দিশেহারা হয়ে শতেক চাঁদের সুষমা ছেনে নিয়ে মণ্ডিত করেছেন তাদের মুখমণ্ডল। ফুটন্ত এক একটা

গোলাপ যেন এই রাখাইন মেয়েগুলি। এই মেয়েগুলিকে দেখে তাদের রূপেব ভিতর দিযে মন চলে যায স্রষ্টাব দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাদের। জানতে কৌতূহল জাগে কোথায সেই স্রষ্টা। অমনি ব্রহ্মবাদী ঋষিব কথা মনে পড়ে যায়—তিনি আপন মহিমায়। তাহলে যাদেব রূপ দেখে দেখে আমাব আশ মিটছিল না, কবিবল্লভেব মতো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এই রূপও তো তাঁবই মহিমা। তোমাকে প্রণাম জানাই হে বিধাতা।

পরদিন সকালে উঠেই শুনি—নেই চলেগা, নেই চলেগা।

কী নেই চলেগা বে বাবা! আমাদের কলকাতার মতো এখানোও সেই নেই চলেগা। শুনে মনে হোলে, কতকগগুলো ব্যাপারে হিন্দির বিকল্প নেই। চলবে না, চলবে না-র চেয়ে নেই চলেগা, নেই চলেগা-র জোর কতো বেশি! তা, জোর যারই বেশি থাক, চলেগা নেইটা কী? হোটেল ম্যানেজারের অফিসে এসে শুনি, বর্তমান সরকার ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইসলাম-বিরোধী পথ নিয়ছে। এটা চলবে না। আর তারই প্রতিবাদে ছাত্ররা আজ সকাল ছটা থেকে দুপুব বারোটা পর্যন্ত কক্স বাজারে বন্দ্ ডেকেছে। বাস চলবে না, রিকসা চলবে না, কোন যানবাহনই চলবে না। দোকান পাট, ব্যবসাবাণিজ্য সব বন্ধ থাকবে বেলা বাবোটা পর্যন্ত। কিন্তু সব বন্ধ থাকলে মুটে মজুব বিকসাঅলা ঠেলাঅলারা খাবে কী? বলতে গেলে বন্দ্-অলাবা বলবে, আমাদের জ্ঞান দেবেন না। আসলে ধর্মান্ধতা ও রাজনীতিব মিক্শ্চার মাথায যখন ঢোকে, বিচাব ক্ষমতা তখন উড়ে যায় হাওয়ায়। কিন্তু আজ যে আমাকে মহেশখালি যেতে হবে! যাবো কী করে সেখানে। খানিকপরে শুনলাম স্থলযান বন্ধ থাকলেও জলযান চলবে। আশ্বস্ত হযে হোটেল থেকে হাঁটা দিলাম ছয় নম্বর জেটির দিকে। ঐ জেটি থেকেই মহেশখালি যাবার স্টিমাব ছাড়ে। মহেশখালি কক্স্বাজরের দক্ষিণে সাগর বুকে দ্বীপ একটি।

পলিমাটি দিয়ে গড়া বাংলাদেশের দক্ষিণে সাগবেব ওপর যে সব দ্বীপ রয়েছে সেগুলি গড়ে উঠেছে নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে। কিন্তু চট্টগ্রাম তো পলিমাটির ভূভাগ নয়। হিমালয় পর্বতমালা ভাবতের উত্তরপূর্ব সীমান্তে এসে হঠাৎ মোড় নিয়েছে দক্ষিণ দিকে। তখন তাদের নাম হয়েছে পাটকই, নাগা, লুসাই। নাগা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিযেছে জয়ন্তিয়া, খাসিযা, গারো। পাহাড়গুলি ডুব দিয়েছে সাগব জলে। তারাই কোথাও কোথাও মাথা তুলেছে, বোধ হয় নিঃশ্বেস নিতে। সৃষ্টি হয়েছে দ্বীপের। মহেশখালি এমনি একটা দ্বীপ।

হাঁটতে হাঁটতেই চলে এলাম ছয় নম্বর জেটি। এসে দেখি স্টিমার ছাড়ার তোড় জোব হচ্ছে। উঠে পড়লাম স্টিমারে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে স্টিমার যাত্রীদের ভাসিয়ে নিয়ে চললো মহেশখালির দিকে। হঠাৎ কখনো-সখনো প্রচণ্ড গতিতে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে স্পীড্ বোট। আবার কখনে কখনো দূরের কোন দ্বীপের নীলরেখা দেখা যাচ্ছে দিগ্বলয়ে বিলীন হযে যাচ্ছে পরক্ষণেই। কখনো দেখি, বকের মতো সাদা পাখীর ঝাঁক নীল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম ওখা বন্দর থেকে ভেট্ দ্বারকা যাবার সময়। উপরে

নীল আকাশ; নীচে নীল সমুদ্রে, মাঝে শ্বেত শুভ্র পাখীর ঝাঁক কী অপূর্ব দৃশ্য ! সত্যিই! ভগবান যেমন চোখ দুটি দিয়েছেন তাদের সার্থক করার জন্যেও তেমনি দিয়েছেন নয়নাভিরাম নিসর্গ-শোভা।

এইসব দেখতে দেখতে মিনিট চল্লিশের মধ্যে পৌঁছে গেলাম মহেশখালি। স্টিমার এসে লাগালো জেটিতে। মাতালের মতো টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালাম জেটির ওপর।

জেটির কাঠের সাঁকো ধরে খানিক যেতেই ছেঁকে ধরলো রিকসাঅলারা। প্রত্যেকেই আমাকে নিয়ে যেতে চায়। দেখিয়ে আনতে চায় আদিনাথের মন্দিব। রিকসা ভাড়া হাঁকে স্বাভাবিকের চতুর্গুণ। তার থেকে কতোখানি আব কমাবো। ঠকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই ঠকাতে ওস্তাদ এক রিকসাঅলার পাল্লাতেই পড়লাম শেষ পর্যন্ত।

মহেশখালি বাজারের মাঝখানটিতেই যা ভিড়। দুইপাশে সুটকি মাছের দোকান। গন্ধে ভূত পালায় আর ভুজনোর ভাত উঠে আসতে চায। তার ওপব ভিডটা একটু বেশি বলে খুব সাবধানে পার হতে হয় বাজারের মধ্যিখানটা। বাজার পার হয়ে খানিক গিয়েই রিকসাঅলা মোড় নিলো ডানদিকে। বললো, বড়-বৌদ্ধ বিহাব দেখবেন না ?



মহেশখালী—বৌদ্ধ বিহার

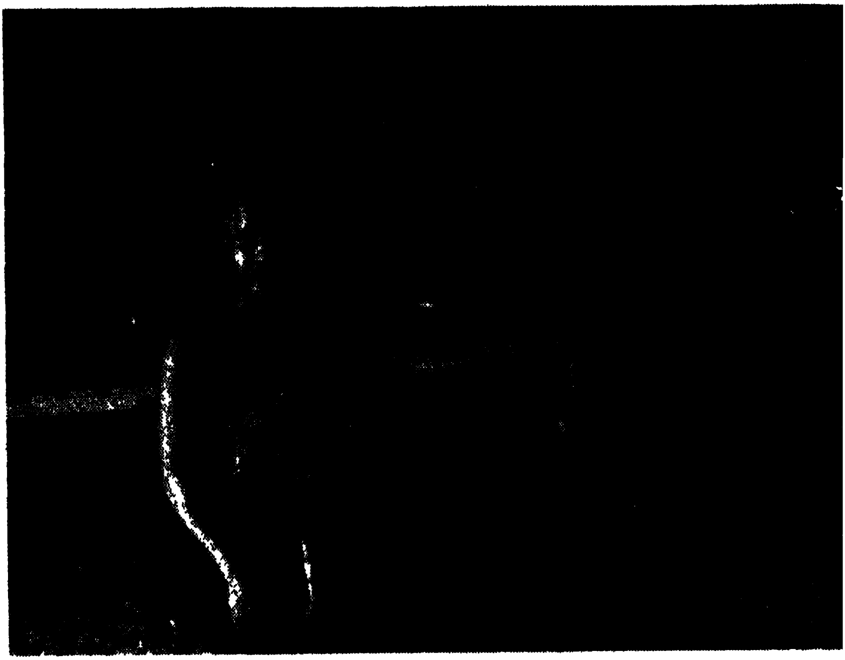
সত্যিই বৌদ্ধ বিহারটি খুব বড়ো। কতো কাল আগে তৈরি হয়েছিলো কে জানে। বিশাল অঞ্চল নিয়ে এই বিহার। খুব বড়ো প্রবেশ তোরণ। ভিতরে এখানে ওখানে নানা মন্দির। সেইসব মন্দিরে নানা বৌদ্ধ দেবদেবী। মধ্যস্থলে মূল মন্দিরটি। ব্রহ্মদেশীয় রীতিতে তৈরি। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি। দেখেই বোঝা যায় খুব মূল্যবান কাঠ দিয়ে তৈরি। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে দোতলায় উঠে গেলাম।

দোতলার মেঝেটি খুব বড়ো। ঘর না বলে হল্ঘর বলা চলে। চারিপাশে অনেক বুদ্ধমূর্তি—কাঠের পাথরের, নানা ধাতুর। কিন্তু একটি ব্যাপারে সকল বুদ্ধ মূর্তির মিল



মহেশখালী—বৌদ্ধমন্দিরে ভগবানবুদ্ধ

রয়েছে। মুখমণ্ডলে বর্মী আদল। বুদ্ধদেব যেন ব্রহ্মদেশী ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো মূর্তিটি পিতলের। ঘরের মাঝখানটিতে বসানো। কাছে গিয়ে মূর্তিটিকে নিরীক্ষণ করছি। এমন সময় বড় বৌদ্ধ বিহারের প্রধান ভিক্ষু এলেন। তাঁর নিজের পরিচয় দিয়ে বাংলায় বললেন আমার নাম উ মহেন্দা ভিক্ষু। আমি এই বড়ো বৌদ্ধ বিহারের প্রধান হিসেবে এই বিহারের পরিচালন দায়িত্ব পালন করছি।



মহেশখালী—বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান তাঁর নাম উ মহেন্দা ভিক্ষু

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথাকার লোক? উ মহেন্দা ভিক্ষু বললেন, আমবা বর্তমানে বাংলাদেশের লোক। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বহুকাল আগে ব্রহ্মদেশ থেকে এই চট্টগ্রাম পটুয়াখালি অঞ্চলে এসেছিলেন।

আবাব জানতে চাইলাম, এই জায়গাটার নাম কি? উ মহেন্দা ভিক্ষু বললেন, এর নাম বড় রাখাইন্ পাড়া। পোস্ট অফিস গোরুকাটা। আব মহেশখালিব জেলা কক্সবাজাব। উ মহেন্দা ভিক্ষুর বলা ঠিকানাটা শুনে মনে হোলো, বাংলাদেশে নদনদী পাহাড়পর্বত, শহব বন্দর ইত্যাদির নাম কতো সুন্দর, কতো শ্রুতিমধুর। সেই নামের সঙ্গে এখানকার পোস্ট অফিসের গোরুকাটা নামটা কতো বেমানান।

আদিনাথ পাহাড়ে আদিনাথের মন্দির যাবার পথে রিকসাঅলা বললে, মিঠাপানের বরোজ দেখবেন না বাবু! তখন আমার তাড়া রয়েছে আদিনাথ দর্শনের। আজই ফিরতে হবে কক্স্‌বাজার হয়ে চট্টগ্রাম। তাই বললাম, আমার যখন কোন পানদোষই নেই তখন তোমাদেব এই পান মিঠাই হোক আর তিতাই হোক, তাতে কী আসে যায় আমাব।

রিকসাঅলা আমার কথার কী বুঝলো সেই জানে। পাহাড়ের সানুদেশে একটা অশত্থ গাছের নীচে নিয়ে এসে বললো, রিকসা আর যাবে না বাবু। এই পথটুকু হেঁটে উঠতে হবে আপনাকে।

বেশ চওড়া সিঁড়ি আছে আদিনাথ পাহাড়ের ওপর বাবা আদিনাথের মন্দিরে যাওয়ার। উঠে গেলাম সেই সিঁড়ি বেয়ে। উঠে দেখি, দুই মহল্লা মন্দির। বার মহল্লায় কয়েকখানা ঘর রয়েছে যেখানে কয়েকটি গৃহস্থের বাস। তাঁরা নিশ্চয়ই বাবা আদিনাথের মন্দিরের কাজে নিযুক্ত। এই বার মহল্লা পার হয়ে যেতে হয় অন্দর মহল্লায় যেখানে রয়েছে বাবা আদিনাথের মূলমন্দির।

মূলমন্দিরে বাবা আদিনাথের শিবলিঙ্গ। পাশের ঘরে শিবের শক্তি দুর্গাপ্রতিমা। আদিনাথ পাহাড়ে বাবা অদিনাথের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাহিনী সুপ্রচলিত। এই একই কাহিনী শুনেছি বৈদ্যনাথধামেও। শিবভক্ত রাবণ বাবা আদিনাথকে কৈলাস থেকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চাইলেন। বাবা আদিনাথ লঙ্কায় যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। জোর করে পুষ্পক রথে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আদিনাথ পাহাড়ের কাছে এসে রাবণের ভীষণ মূত্রবেগ উপস্থিত হোলো। কী আর করেন রাবণ। সামনে দীর্ঘপথ। বঙ্গোপসাগার পার হয়ে যেতে হবে লঙ্কায়। তাই আদিনাথ পাহাড়ের ওপর স্থাপন করে মূত্রত্যাগ শুরু করলেন। কিন্তু মূত্রাশয়ের মূত্র আর শেষ হয় না। ক্রমাগত সাতদিন ধরে মূত্রত্যাগ করলেন। ততোক্ষণে বাবা আদিনাথ শিকড় চালিয়ে দিয়েছেন আদিনাথ পাহাড়ের গভীরে।

মূত্রত্যাগ শেষ হলে রাবণ এসে আদিনাথ শিবলিঙ্গকে তোলার জন্যে বহু টানাটানি করলেন। কিন্তু কিছুতেই তুলতে পারলেন না। শেষে শিব লিঙ্গের মাথায় জোর একটা মুষ্টাঘাত করে ফিরে গেলেন লঙ্কায়।

এই হোলো কৈলাস থেকে বাবা আদিনাথের মহেশখালির আদিনাথ পাহাড়ে আসার কাহিনী।

কাহিনীটি শুনে আদিনাথকে প্রণাম করে আমি কক্স্‌বাজারের উদ্দেশ্যে ফেরত-যাত্রা শুরু করলাম।

———☆———

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীহট্ট

আসকার দীঘির পশ্চিম পাড়ের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম থেকে এলাম চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে। বেশ বড়ো স্টেশন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও। গত সন্ধ্যায় টিকিট করাই ছিলো। সিটও সংরক্ষিত ছিলো। আজ সোজা এসে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা ট্রেনে উঠে বসলাম আমার জন্য সংরক্ষিত সিট্-এ। ট্রেন ছাড়লো সকাল সাড়ে দশটায। খাসা নাম ট্রেনখানির। পাহাড়িকা। চট্টগ্রাম আর শ্রীহট্টের মধ্যে তাঁতের মাকুর মতো যায় আসে। বাংলাদেশে এসে এই প্রথম ট্রেনে চড়লাম।

পাহাড়িকা চললো শহর-বাজার, গ্রামঘর, মাঠঘাট, নদনদী, পাহাড়পর্বত পার হয়ে। কতো দেশের কতো মানুষ ট্রেনে ওঠানামা করছে। চলচিত্র দেখছি যেন। এদিকে অগ্নিদেব ধীরে ধীরে জ্বলে উঠলেন উদরে। তখন পাশের যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম পাহাড়িকায প্যান্ট্রি-কার আছে কিনা! জানতে চেয়ে সে কী ফ্যাসাদ! প্যান্ট্রি কারের মানে কি? কোথাকার গাড়িতে সেই প্যান্ট্রিকার থাকে? সেই কারে কী কী পাওয়া যায়? সুকুমার রায় থাকলে আর একখানা 'অবাক জলপান'' লিখে ফেলতেন। শেষে আমার মনে হোলো, আর আমার প্যানট্রি কারে দরকারে নেই। দুটি মুড়িটুড়ি পেলে বাঁচি।

এমন সময় উঠলো এক কলা-বেচা হকার। এক 'খাসী' কলা দেখিযে তখনকার মতো শান্ত করলাম অগ্নিদেবকে। কিন্তু যাত্রাটি তো কম নয়। যাবো বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সেই সিলেট।

সিলেট বলতেই আমার ছোটবেলার একটা মজার কথা মনে পড়লো। শীতকালে মালভাঙার হাটে এক ফলঅলা কমলা লেবু বিক্রি করতো। বলতো---সেলেটের কমলা বাবু। যে সে কমলা নয়। শুনে ভাবতাম, কাগজে লেখার অধিকার পাবার আগে শেলেটে তো লিখতে হয়। শেলেটে আবার লেবু হয় কখনো! বড়ো হযে বুঝেছি। কমলা-অলার বিকৃত উচ্চরণে সিলেট (Sylhet) হযেছে শ্লেট (Slate)।

কিন্তু যে স্থান দেখতে চলেছি তার নাম তো শ্লেটও নয়, সিলেটও নয়। ইংরেজরা শ্রীহট্ট উচ্চারণ করতে না পেরে বলতো সিলেট। আর তখনকার প্রভুভক্ত বাঙালিরা ইংরেজের অনুকরণে শ্রীহট্টকে সিলেট বলে খুব আত্ম-প্রসাদ লাভ করতো। ভাবতো খুব 'সইভ্য' হয়েছি আমরা ইংরেজ প্রভুদের 'কইল্যাণে'। কিন্তু শ্রীহট্টকে শ্লেট, সিলেট অথবা অন্য যা-ই বলুক না লোকে, নামটা এলো কোত্থেকে! জানা যায় না। অন্ততঃ আমি জানাতে পারিনি। তবু যেটুকু জেনেছি সে টুকুর কথা পরে হবে। এখন শ্রীহট্ট সম্পর্কে যে কথাটা আমার সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসতে চায় তাই বলি।

শ্রীহট্ট

আমি দেখতে এসেছি বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে শ্রীহট্টের থাকার তো কথা নয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট খণ্ডিত হোলো ভারত। সেই সঙ্গে বাংলাকেও দু'খণ্ড করে পূর্ববাংলাকে জুড়ে দেওয়া হোলো পাকিস্থানের সঙ্গে। খণ্ডিত পূর্ববাংলার নাম হোলো পূর্বপাকিস্থান। তার চব্বিশ বছর পর কী মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্য দিয়ে পূর্ব-পাকিস্থান পাকিস্থানের কবলমুক্ত হোলো এবং সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হোলো সে তথ্য তো জানা সকলের।

কিন্তু সেই পূর্ব-পাকিস্থানে শ্রীহট্ট এলো কী করে। শ্রীহট্ট তো আবহমান কাল থেকে ছিলো আসাম প্রদেশের একটা জেলা। সেই আসাম প্রদেশ তো খণ্ডিত হয়নি ভারত ভাগের সময়। খণ্ডিত হয়েছিলো বাংলা প্রদেশ। তবু আসামের শ্রীহট্টকে আসাম থেকে খেদিয়ে পূর্ব-পাকিস্থানের খোঁয়াড়ে পুড়ে দেওয়া হয়েছিলো কেন?

আনন্দবাজার পত্রিকায় বাজার-সরকার ছদ্মনামে জনৈক সাংবাদিক বাজারদর সম্পর্কে একটি সরস কলম লিখতেন। এখন তিনি প্রয়াত। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর নামটিও আমার মন থেকে প্রস্থিত। সেই প্রয়াত সাংবাদিক 'দেশ' পত্রিকায় সমস্ত তথ্য দিয়ে লিখেছিলেন দীর্ঘ এক প্রবন্ধ। তার মধ্যে লিখেছিলেন আসামের শ্রীহট্ট জেলাকে কীভাবে এবং কেন আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব-পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিলো।

আসামের তখনকার প্রাদেশিক সরকারেরর সুপারিশ অনুসারে তখনকার ভারতের কংগ্রেস নেতারা স্থির করলেন শ্রীহট্টে গণভোট (plebiscite) নেওয়া হবে। এবং ঐ গণভোটের মাধ্যমেই স্থির হবে শ্রীহট্ট জেলার লোকেরা ভারতে থাকতে চায়, না পূর্ব পাকিস্থানে যেতে চায়। আসামের তখনকার প্রাদেশিক সরকার কেন এই সুপারিশ করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্থানের পূর্ব সীমান্ত বরাবর আরও তো অনেক জেলা আসামের ছিলো। তাদের সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে ব্যাটা শ্রীহট্টকে ধরা হয়েছিলো কেন? আর ভারতের তখনকার তাবড় তাবড় নেতারা সেই সুপারিশ লুফে নিয়েছিলো কেন?

'দেশ' পত্রিকার দীর্ঘ প্রবন্ধে সেই বিবরণ দিয়ে গেছেন অধুনা প্রয়াত সেই সাংবাদিক। সেই ভাগবাঁটোয়ারার যুগে সাংবাদিক ছিলেন তরুণ। গণভোট কভার করতে গিয়েছিলেন তিনি শ্রীট্টে। সেই সময় গণভোটের আগে অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনিও তখনকার শ্রীহট্ট জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা করতে যাওয়া সেই সব সাংবাদিকদের সম্মুখে জেলা কংগ্রেসের প্রবীণ প্রেসিডেন্ট হাউহাউ করে কেঁদে বলেছিলেন আপনারা বৃথাই এসেছেন গণভোট দেখতে। লোক দেখানো গণভোটের অভিনয় একটা হবে। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বহু আগেই ঠিক করে ফেলেছে আসাম থেকে ছেঁটে দিয়ে পূর্বপাকিস্থানকে দান করা হবে শ্রীহট্ট জেলা।

কিন্তু কেন? কেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড। আর কেনই-বা আসামের প্রাদেশিক সরকার এই সুপারিশ করেছিলো? শ্রীহট্ট জেলা মুসলমান প্রধান ছিলো এমন দাবী তো পাকিস্থানপন্থীরা করে নি? করলেও তার ভিত্তি ছিলো না। তবু শ্রীহট্টকে দান করার এই বদান্যতা প্রাদেশিক সরকার কেন দেখিয়ে ছিলো?

উত্তবে প্রবীণ জেলা কংগ্রেস সভাপতি বলেছিলেন শ্রীহট্ট যে বাংলা ভাষী জেলা। এই জেলা আসামের সঙ্গে থাকলে আসামে বাংলাভাষীদেব সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে যে।

অবশিষ্ট ভাবতও তা চায না। তাই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড আসামের প্রাদেশিক সবকাবেব সুবে সুব মিলিযে বলেছিলো, হ্যাঁ। গণভোট হোক শ্রীহট্টে। কিন্তু গণভোট যে কী বস্তু এখন পাঁচ বছবেব একটা শিশুও তা জানে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, কেন এই বাঙালি বিদ্বেষ অবশিষ্ট ভাবতেব ? বিদ্যাসাগবমশাই বড়ো ক্ষোভে মাঝে মাঝে বলে ফেলতেন, কেনবে। ওবা আমাকে গালাগালি দিচ্ছে কেন? আমি তো ওদেব কোন উপকাব কবিনি। অতি সংকীর্ণমনা মানুষেবা উপকাবীব উপকাব অস্বীকাব করতে চায এবং এই পথটাকেই আপন অক্ষমতা ঢাকাব একমাত্র পথ বলে মনে কবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেযে বেশি অবদান বেখে গেছে বাংলাব যুবকেবা। স্বাধীনতাব জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকাব কবছে বাংলাব মানুষেবা। ইংবেজ সবকাবেব সবচেয়ে বেশি অত্যাচাব হয়েছে বাংলাব মানুষেব ওপব। পাঞ্জাব আব মহাবাষ্ট্র ছাড়া বোধ হয় আব কোন প্রদেশেব অধিবাসী বাঙালীব মতন স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অবদানই বাখতে পাবে নি। সাহিত্যে শিক্ষায সংস্কৃতিতে বাঙালিব সমকক্ষ কেউ ছিলো না। আজও নেই। এই সত্য অন্য প্রদেশবাসী স্বীকাব কবে না। মহামতি গোখেলেব মত দু'চাব জন উদাবচেতা মানযকেই বলতে শোনা যায়—What Bengal thinks today the rest of India will think tomorrow । স্বাধীনতাব অর্ধশতাব্দী কেটে গেলেও আর্থিক অবস্থাব বিচাবে বাঙালি যে তিমিবে ছিলো আজও সেই তিমিবেই বযে গেছে। পূর্বপাকিস্থান থেকে আশ্রযপ্রার্থী হযে যে হিন্দুরা পালিযে এসেছিলো তাবা ছিন্নমূল হয়ে বযে গেছে আজও। আব পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে মুসলমানেবা চলে গিযেছিলো পূর্বপাকিস্থানে তাবাও চবম দাবিদ্র্যের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে।

আব নেপোব দই মাবার মতো স্বাধীনতাব ফলভোগ কবছে অবশিষ্ট ভাবত ও (পশ্চিম) পাকিস্থান। কিন্তু ন্যায্য অধিকাবীকে বঞ্চিত কবে অন্যাযভাবে স্বাধীনতাব ফলভোগ কবছে এই বোধটা মাঝে মাঝে চাবা দিয়ে ওঠে তাদেব মাথায। যেটাকে চাপা দিতে তাবা বাঙালিব দোষ খোঁজে। দোষ না পেযে "বিনা-দোষেব অপবাধে শৈলবালাব জীবন হল শুরু, পদে পদে অপবাধেব বোঝা হল শুরু।" অথবা, "নির্মলারে দেখত মলিন মাখিযে তাবে আপন কথার কালী।" শেষে কী করে তাকে অবলুপ্ত করা যায় সেই ষড়যন্ত্র শুরু হোলো। যে বঙ্গ ভঙ্গ রোধ করতে স্বযং রবীন্দ্রনাথও মসী ছেড়ে অসি ধরেছিলেন সেই বাংলাকে তাবা খণ্ডিত করলো। তাতেও তৃপ্তি হোলো না কারণ ঈর্ষার তৃপ্তি হয় না কখনো। তাই আসাম থেকে বাংলাভাষী শ্রীহট্টকে দিয়ে দিলো পূর্বপাকিস্থানকে গণভোটের অভিনয় কবে।

জগতে বুদ্ধিভ্রংশ ও দুর্বুদ্ধি হেতু আত্মঘাত বিরল হতে পারে। কিন্তু বাংলাভাষী শ্রীহট্টকে আসাম থেকে নির্মমভাবে ছেটে পূর্ব-পাকিস্থানকে দান করার মতো আত্মহননেব দৃষ্টান্ত বোধ হয় জগতে আর নেই।

প্রায় পুরো একটা দিন 'পাহাড়িয়া' ট্রেনের কামরায় কাটিয়ে দিলাম। সঙ্গে উত্তরে গেছে 'অনেকখানি। তখন ট্রেন এসে থামলো একটা স্টেশনে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি স্টেশনটির নাম শ্রীমঙ্গল। মনে পড়ে গেলে, এই শ্রীমঙ্গলেই ছিলো শচীমাতার পিতৃদেব নীলাম্বর চক্রবর্তীর পিতৃগৃহ। নালীম্বর চক্রবর্তী অগ্রজসম অদ্বৈত আচার্যের কাছে নবদ্বীপে আসেন বিদ্যার অন্বেষণে। তার পর নবদ্বীপেই বসবাস করেন। আমি সময় ও সুযোগ পেয়েছিলাম শ্রীমঙ্গল দেখার। কিন্তু অদৃষ্টে না থাকলে কোন তীর্থভূমি দেখা হয় না।

ট্রেন অবশেষে এসে থামলো শ্রীহট্টে যাত্রীরা নামতে শুরু করলো ট্রেন থেকে। আকাশ থেকে বৃষ্টিও নামলো মুসলধারে। কী করি। দিশেহারা অবস্থা। দৌড়ে গিয়ে উঠলাম স্টেশনের ছাদের নীচে। সেখানে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছি একটা অটোরিকসায় স্টার্ট দেওয়া হয়েছে। সেই অটোরিকসায় উঠেছেন একভদ্রলোক সপরিবারে। ধারে কাছে আর কাউকে না পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, 'উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস' কোথায় এবং কীভাবে সেখানে যাবো দয়া করে বলে দেবেন? কলকাতা থেকে এসেছি শুনে ভদ্রলোক বললেন, উঠে পড়ুন এই অটোতে।

তারপর কীভাবে শ্রীহট্ট শহরের চালিবন্দরের "উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস"-এ এলাম এবং আশ্রয় লাভ করলাম সেখানে সুহাসিনীদি'র অনুগ্রহে সেকথা এই অধ্যায়ের শেষে "মহীয়সীর পদতলে" অংশে বলা হয়েছে।

পরদিন সকালে তৈরি হয়ে নিয়ে গেলাম শ্রীহট্টের রামকৃষ্ণ মিশনে। সুহাসিনীদি ছাত্রাবাসের এক কিশোর-বয়স্ক ছাত্রকে আমার সঙ্গে দিলেন। ছাত্রটি বড়ো মিস্টি দর্শন। খুব চালাক-চতুরও। আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের সবকিছু চেনে-জানেও। তাকে ভুলিনি আমি। কিন্তু নামটি তার ভুলে গেছি। অথচ তার কথায় বারবার ছেলেটি ছেলেটি বলতেও ভালো লাগছে না। তার নাম ভুলে গেছিতো হয়েছেটা কি। বন্যায় ভূমিকম্পে দাঙ্গায় যুদ্ধে মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে বসে। পরে আবার তো সব গড়ে তোলে। ভাঙা-গড়ার জগতে এই তো নিয়ম। আর এতো একটা নামের ব্যাপার। তাহলে যে আমার মনের মাঝে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছে তিনদিন ধরে শ্রীহট্ট দেখিয়ে, তার নামটি যদি হারিয়েই ফেলি তাকে শ্রুতিমধুর একটা নাম দিতে পারবো না ! থাক সে শ্রীহট্টে তার বাবা-মার দেওয়া নাম নিয়ে। আমার মনে সে চিরজীবী থাক অন্য নামে। তার নাম থুই মিষ্টি।

তবে মিষ্টিকে নিয়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটতে থাকলো। আমি বর্ধমানের ঘটি। এই প্রথম গেছি বাঙাল-দেশে। আর মিষ্টি যায় বাঙালেরও ওপরে। একেবারে শ্রীহট্টিয়া টানে কথা কয়। সে কথা বোঝে কোন ঘটির বাপেরও সাধ্যি নেই। তবে আন্দাজ আর ইসারা নামের আদিম ভাষা দুটিতো আছে!

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী তাঁর ঘরে কর্মব্যস্ত ছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনেই বেরিয়ে এলেন এবং অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসালেন বসার ঘরে।

কুশল-পরিচয় সংক্রান্ত দুচারটে কথা হতে হতেই প্রসাদ এলো। সেই প্রসাদ খেতে খেতেই স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। বললাম, মহারাজ ! আমি কলকাতা থেকে এসেছি বাংলাদেশ দেখতে। বাংলাদেশ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমগুলির সেবাকার্য দেখতেও ভালো লাগছে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীহট্টের রামকৃষ্ণ মিশনে এলাম। মহারাজ ! আপনার সন্ন্যাসী-নামটি কী বলবেন দয়া করে?

স্বামীজি মহারাজ বললেন, আমার নাম স্বামী চন্দ্রনাথানন্দ। শ্রীহট্টে আসার আগে আমি ঢাকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম। মাস ছয়েক হোলো শ্রীহট্টে এসেছি এখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালন-দায়িত্ব নিয়ে।

আমি ঃ শ্রীহট্টের এই রামকৃষ্ণ মিশন কার উৎসাহে এবং উদ্যোগে প্রথম স্থাপিত হয়েছিলো। আর কখনই-বা স্থাপিত হয়েছিলো ?

স্বামীজী ঃ এই আশ্রম ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসী প্রেমেশানন্দের, যাঁর পূর্ব-আশ্রমে নাম ছিলো ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য, উৎসাহেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্ট তো ভক্তি-প্রবণ অঞ্চল। মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিলো এই শ্রীহট্ট অঞ্চলেই, শ্রীহট্টের অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণে। সুতরাং ভক্তদের বাসস্থান এই অঞ্চলটি। এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উৎসাহে এবং স্বামী প্রেমেশানন্দের উদ্যোগে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার দশবছর পরে এই আশ্রম বেলুড়মঠ কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে।

আমি ঃ মহারাজ! এখানে, এই আশ্রমে, পূজা-অর্চনার কাজ নিয়মিত অনুষ্ঠিত নিশ্চয়ই হয়। তাছাড়া, সমাজ-সেবামূলক কাজ এখানে কী কী হয়?

স্বামীজী ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি ভাগ হোলো, আধ্যাত্মিকসেবা। এই কাজ মূলতঃ মঠ বা আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। মঠ বা আশ্রমের মধ্যেই এই সেবাকার্য পরিচালিত হয়।

আর একটি ভাগ হোলো সমাজ সেবামূলক। সমাজসেবা বলতে বুঝি মানুষের সেবা। এই কাজে আমরা স্বামীজীর সেই কথাটাই স্মরণ-করি "জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" জীব সেবার মাধ্যমে ও আমরা আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে চাই। এই আমাদের আদর্শ। সমাজ সেবার জন্য কয়েকটি স্থানে আমাদের কেন্দ্র আছে। সেখানে সেবামূলক নানা কাজ করা হয়। প্রতি শুক্রবার সেইসব কেন্দ্রে 'কথামৃত' পাঠ করা হয়। প্রতি একাদশীতে রামনাম হয়। সেইসব স্থানে পূজা, মঙ্গলারতি, সন্ধ্যারতি হয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এইপাঠ ও নামগান, পূজা ও আরতি জনসেবারই অঙ্গ।

এইসব ছাড়া, দুর্গাপূজা, কালীপূজা সরস্বতী পূজা, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমী, বুদ্ধপূর্ণিমা ইত্যাদি পালন করা হয়। এইগুলি মঠ ও মিশনের আধ্যাত্মিক সেবার দিক।

আব সেবামূলক কাজের মধ্যে এখানে ছাত্রাবাস আছে। এই ছাত্রাবাসটি ১৯৯১ সালে বিধ্বস্ত করা হয়েছিলো। সেই ছাত্রাবাসকে আবার নতুন করে গড়ার চেষ্টা হচ্ছে। ভিত্তিস্থাপনও করা হয়েছে। এখন কুড়িজন ছাত্র আছে ছাত্রাবাসে অন্য গৃহে। আমরা বড়ো আকারের একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করতে চাই। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রায় কুড়ি লাখ টাকা সংগ্রহ করতে হবে এই ছাত্রাবাসের জন্য।

এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে। এই সেবাকেন্দ্রে প্রতি সপ্তাহে একজন ডাক্তার বসেন। তাছাড়া এখানে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসালয় খোলা হয়। সপ্তাহে যাতে দুই দিন খোলা হয তাব চেষ্টা হচ্ছে।

এখানে একটি গ্রন্থাগাব (library) আছে। গ্রন্থাগারটিতে মোটামুটি ভালো সংগ্রহ আছে বলা চলে। তাছাড়া, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিপর্যযের সময় ত্রাণকার্যে (relief work) আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে যাই।

পরিবার-উন্নয়নের কাজও হাতে নেওযার চেষ্টা চলছে। এই কাজে অনেক অর্থেব প্রয়োজন। সেই অর্থ সংগ্রহেব চেষ্টা চলছে। আশা করি, অচিবেই আমবা সেই কাজ শুরু কবতে পারবো।

আর আমাদেব যুবক ভাইদের নিযে একটি পবিষদ গঠন করা হয়েছে। নাম দেওযা হয়েছে বিবেকানন্দ শিক্ষা সংস্কৃতি পবিষদ। এই পরিষদ অনুন্নত এলাকায় একটি বিদ্যালয প্রতিষ্ঠা কবেছে। সেই বিদ্যালযে বর্তমানে ষাট-পযষট্টি জন ছেলেমেযে লেখাপডা করছে। আমরা চেষ্টা কবছি ওখানে একটা স্বযংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক স্কুল গড়ে তুলতে। জেলা প্রশাসক মহাশয়কে এবং ডিভিশনাল কমিশনাব মহাদয়কে বলেছি এবং তাঁবা সর্বপ্রকাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অবশ্য আমবা চাই স্থানীয লোকেব জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনসাধাবণেব সহযোগিতা নিযে প্রতিষ্ঠানেব কার্যাবলী প্রসারিত কবতে। মোটামুটি সমর্থন পাচ্ছি। এইভাবেই আমবা সেবাকার্যের পবিধি বিস্তাব কবতে চাইছি। অবশ্য সবই ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমি ঃ তাহলে, আমরা দেখছি, আপনাবা কেবল যে হিন্দুদেব মধ্যেই আপনাদেব সেবাকার্য সীমাবদ্ধ বেখেছেন তা নয। সমাজেব সকল ধর্মেব লোকেদের, সাধাবণ লোকেদেব মধ্যে কাজ কবছেন এবং সকলের সহযোগিতা পাচ্ছেন।

স্বামীজী ঃ আমবা হিন্দু মুসুলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এই সম্প্রদাযগত ধর্মে বিশ্বাস কবি না। আমরা বিশ্বাস কবি মানুষে। মানুষ নিজের আত্মার উন্নতিব জন্যে একটা পথ বেছে নেয. সেই পথ হিন্দুদের পথ হতে পাবে ইসলামেব পথ হতে পাবে, খ্রীস্টের অথবা বুদ্ধেব দেখানো পথ হতে পাবে। আমবা মানুষেব আচাব-আচবণের পথ দিয়ে নয, তার অন্তরে সে আসল ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে তাই দিযে মানুষকে বিচার কবি। আমরাও অন্তব দিযে মানুষেব জন্যেই কাজ কবার চেষ্টা কবি। আব সেই জন্যেই রামকৃষ্ণ মিশনকে সকল ধর্ম সম্প্রদায়েব সাধারণ লোকে যেমন, এই দেশের সরকাবও তেমনি, আপন বলেই গ্রহণ কবে।

আমি ঃ এখানে যে ছাত্রাবাসটি বিধ্বস্ত হয়েছিলো সেটি কি বাব্‌রি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় বিধ্বস্ত হয়েছিলো?

স্বামীজী ঃ না, ঠিক তা নয়। কিছু উত্তেজিত লোক এটি করেছিলো। তবে আমাদের বিশ্বাস, ঐ সময় এখানে যদি স্বামীজীদের কেউ উপস্থিত থাকতেন তাহলে এমনটা ঘটতো না। কারণ স্বামীজীদের সঙ্গে সকল ধর্মের লোকেদেব যোগাযোগ আছে। তাঁবা উপস্থিত থাকলে নিশ্চযই এই কাজ বন্ধ কবতে পাবতেন।

আমি ঃ এখানে যুবক ভাইদেব সহাযতায যে স্কুলটি কবা হয়েছে যেই স্কুলটি কোন স্তরের?

স্বামীজী ঃ সেটি প্রাইমাবি স্কুল।

আমি ঃ এখানকার ছাত্রাবাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাড়াও মুসলমান সম্প্রদাযেব ছাত্রও কি থাকে ? অথবা থাকতে পাবে ?

স্বামীজী ঃ মুসলমান সম্পাদয়ের ছাত্র থাকতে পারে। তাদেব থাকার কোন বাধা নেই' আমাদেরও অন্য কোন অসুবিধে নেই। তবে এই ব্যাপারে আমাদেব কতকগুলো নিয়ম আছে। যেমন ছাত্রাবাসের ছাত্রদেব প্রার্থনায যোগ দিতে হবে। ভোরে মঙ্গলারতিতে আসতে হবে। সন্ধ্যার উপাসনায যোগ দিতে হবে। মুসলমান ছাত্ররা এই সকল প্রার্থনা বা উপাসনায় যোগ দিতে ইতস্তত কবে। যদিও মুসলমান ছাত্রগণ প্রার্থনা এবং উপাসনায় যোগ দিলে আমাদেব কোন অসুবিধে নেই।

আমি ঃ বাইরে থেকে এখানে যাঁরা আসেন তাঁবা কি এই আশ্রমে থাকতে পাবেন ? এখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা আছে কি ?

স্বামীজী ঃ হ্যাঁ, তাঁরা থাকতে পারেন এখানে। তবে আমাদের এই আশ্রমে থাকাব ব্যবস্থা সীমিতভাবে আছে। একটা অতিথিশালা কবারও পরিকল্পনা আছে আমাদেব।

আমি ঃ আপনাবা কি অন্য ধর্মেব লোকেদেব ধর্মান্তবকবণে বিশ্বাস কবেন ?

স্বামীজী ঃ না, মোটেই না। বামকৃষ্ণেব আদর্শে বিশ্বাসীবা কোন মানুষেরই ধর্মান্তব চান না। আমবা বিশ্বাস করি, লোকে নিষ্ঠার সঙ্গে আপন আপন ধর্মাচরণ পালন করুক। একজন হিন্দু খাঁটি হিন্দু হোক। একজন মুসলমান নিষ্ঠাবান মুসলমান হোক, এই আমাদের আদর্শ।

স্বামীজীর সঙ্গে আরও কিছু সময় কাটাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু সময় যে বসে থাকে না কারও জন্যে। শ্রীহট্টের যতোটা পারি দেখে নেওয়ার ইচ্ছা আমাকে তাড়িয়ে নিযে চলেছে। আবার স্বামীজীও ব্যস্ত আশ্রমের নানা কাজে। তাই স্বামীজীর কাছে বিদায় চাইলাম। স্বামীজীও আমাদের বিদায় দিলেন স্মিতমুখে। শ্রীহট্টের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন থেকে বাব হযে পথে নামালাম আমরা—আমি ও মিষ্টি।

মিষ্টি বলো, এখন আমরা কোথায় যাবো? বললাম, যা দেখতে আমি ছুটে এসেছি শ্রীহট্টে, যা দেখবার আশায় আমি বসে আছি কতো কাল, সেই ঢাকা-দক্ষিণ যাবো। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভুর পৈত্রিক ভিটা দেখবো।

কাছেই এক চৌবাস্তা। সেই চৌরাস্তায় উঠলাম এক বিকসায়। বিকসাঅলা সুরমা নদীর সেতুর ওপব দিযে নিযে এলো এক বাসস্ট্যান্ডে। এই বাসস্ট্যান্ডে থেকে ঢাকা দক্ষিণের বাস ছাড়ে। কিন্তু বাসে উঠে শুনলাম ঢাকা-দক্ষিণে বাস যায় না। বাস যায গোলাপগঞ্জ হযে আবো দূরে অন্য কোন মুলুকে। আমাদেব নামতে হবে গোলাপগঞ্জে। সেখান থেকে অটোবিকসায ঢাকা-দক্ষিণ যেতে হবে।

বাসে এসে নেমেছি গোলাপগঞ্জে। সেখানে একটা অটোবিকসাব সঙ্গে ভাডা ঠিক কবে নিযে আমি ও মিষ্টি চড়ে বসলাম আটোবিকসায়। উঁচুনীচু ঢেউ-খেলানো হলেও পীচঢালা মসৃণ পথ। বেশ চলেছে অটো বিকসাখানা আপন গতিতে।

মনে পড়লো, সুকুমাব সেনেব চৈতন্যাবদানে পড়েছি, মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ধামে জন্ম হযেছিলো। বড়ও হযেছিলেন সেখানে। কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়াব সঙ্গে "বিবাহের অল্পকাল পরে চৈতন্য জলপথে পূর্ববঙ্গে গমন কবিলেন। কোথায় কোথায গিযাছিলেন তাহার কোন খাঁটি খবর নাই। সম্ভবত তিনি সিলেটে পিতৃভূমিতে পদার্পণ কবিয়াছিলেন। বোধ করি দেশেব ভূসম্পত্তি ও যাহা ছিল তাহার শেষ ব্যবস্থা কবিতেই তিনি বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন। পর্ববঙ্গে গিযা তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল এবং তিনি সেখান হইতে টাকাকড়ি লইয়া আসিযাছিলেন—একথা প্রায সব প্রাচীন জীবনী লেখকই বলিযাছেন। চৈতন্যের প্রথম ভক্ত তপন মিশ্র বঙ্গদেশেই চৈতন্যেব সহিত প্রথম মিলিত হন এবং তাঁহাবই উপদেশে সপরিবাবে কাশীতে চলিযা যান।" (সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড)

তাহলে মহাপ্রভু নবদ্বীপ থেকে শ্রীহট্টে এসেছিলেন এবং সেখান থেকে ঢাকা-দক্ষিণে এসে ছিলেন এই অনুমান করা অসঙ্গত নয। তবে ঢাকা-দক্ষিণে তো জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃগৃহ। অধ্যাপক রাধা বিনোদ মিশ্র দাবী কবলেন তিনি জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যম দাদা পরমানন্দ মিশ্রেব উত্তর পুরুষ। তাঁব বক্তব্য অনুসারে জগন্নাথ মিশ্রেব পিতৃগৃহেব নাম ছিলো ঠাকুববাড়ি। এই ঠাকুববাড়ি ছিলো দত্তবাইল গ্রামে। কিন্তু ডঃ সুকুমাব সেনেব বাংলার ইতিহাসে দেখছি তিনি প্রথম খণ্ডেব একাদশ পবিচ্ছেদেব টীকায় লিখেছেন, "জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মতে শ্রীহট্টেব মধ্যে জয়পুর গ্রামে জগন্ননাথেব পিতৃগৃহ ও শ্বশুরালয় ছিল। দৈব বিপাক ও রাষ্ট্র বিপ্লব দুই মিলিয়া শ্রীহট্ট উচ্ছন্ন করিলে শচীদেবীব পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী সপরিবার-পরিজনে নবদ্বীপে চলিযা আসেন।"

জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃগৃহ "ঠাকুরবাড়ি" যে গ্রামেব অন্তর্গত ছিলো সেই গ্রামের নাম দত্তরাইল অথবা জয়পুব যাই হোক না কেন, আজ সেই গ্রামেব স্বতন্ত্র পরিচয় শুনতে পাই না। নিশ্চয়ই সেই গ্রাম ঢাকা-দক্ষিণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। আর নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিলো শ্রীমঙ্গল, জয়পুর নামে অধুনা লুপ্ত কোন গ্রামে নয়। এই কথাই বললেন শ্রীমঙ্গল গ্রামের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি।

ঢাকা দক্ষিণ বাজাবে অটোরিকসা থেকে নেমে কিছুটা হেঁটে এসে উপস্থিত হলাম বেশ বড়ো একটি দীঘিব পাড়ে। সেই দীঘিব পশ্চিম পাড় ধবে আরও খানিক গিয়ে পৌঁছুলাম

ঠাকুর বাড়িতে। শ্রীহট্ট শহর থেকে ঢাকা দক্ষিণের এই ঠাকুরবাড়ি তেইশ কিলোমিটার পূর্বে।

অনেকখানি উঁচু এক টিলাব উপর ঠাকুর বাড়ি। ঠাকুরবাড়ির তিনটি অংশ। দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে উঠলে প্রথমেই বিস্তৃত চত্বর। এই চত্বরের দক্ষিণ অংশে দেবমন্দির। দেবমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। সেবাইতদের কথা অনুসারে এই দেবমূর্তি শ্রীচৈতন্য তাঁর পিতামহীকে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের আর একটি যুগলমূর্তি এবং গৌব-নিতাই-এর মূর্তি সংযোজিত হয়েছে।

চত্বরের উত্তরে অধ্যাপক রাধা বিনোদ মিশ্রের বাসগৃহ। অধ্যাপক মিশ্র স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর দাবী, তিনি জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যম ভ্রাতা পরমানন্দ মিশ্রের উত্তরপুরুষ।

চত্বরের পশ্চিমে আর একটি উচ্চতর টিলার উপর জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃগৃহ। এই গৃহেই জগন্নাথ মিশ্র জন্ম গ্রহণ কবেছিলেন। ঠাকুরবাড়িব দেবমন্দির ও অধ্যাপক রাধা বিনোদ মিশ্রেব বাসগৃহ দেখে উঠে এলাম জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃগৃহে। বেশ কষ্ট সাধ্য ঐ বাড়িতে ওঠা।



ঢাকা দক্ষিণ—মহাপ্রভূর পৈত্রিক ভিটা

আজও দাঁড়িযে আছে প্রায ছয় শতাব্দী আগে তৈরি বাড়ির দেওয়ালগুলি। মাথাব উপব ছাদ অবশ্য ভূমিসাৎ হয়ে গেছে।



ঢাকা দক্ষিণ---মহাপ্রভুব পৈত্রিক ভিটায তুলসীমঞ্চ

দক্ষিণদুয়াবী এই কুঠবী দুটিব কোনটিতে জগন্নাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। দুই কুঠুরির কোঠাবাড়ি। উঠানে তুলসী মঞ্চ। উঠোনেব দক্ষিণে উত্তব দুয়াবী বান্নাঘব। পূর্ব ও পশ্চিম দিক ছিলো পাঁচীলঘেবা। আজও সেই পাঁচীলেব চিহ্ন বয়েছে।

মহাপ্রভুব পৈত্রিক বাড়ি দেখাব বাসনা আমাব কতোকালের। আজ আমাব সেই বাসনা চরিতার্থ হোলো। বিচিত্র এক অনুভূতি আমাব সমস্ত সত্তাকে যেন আনন্দে পুলকিত করে তুললো। মনে হোলো আমার জীবনও যেন ধন্য হয়ে উঠেছে. কিন্তু কোন্ পুণ্যবলে আমাব জীবন এমন কবে ধন্য হোলো তাতো জানি না।

শুনলাম অধ্যাপক রাধাবিনোদ মিশ্র ফিবেছেন কলেজ থেকে এবং আমাদেব জন্যে অপেক্ষা কবছেন। তাই যথাশীঘ্র এলাম তাঁর বাড়ি। কুশল পবিচযেব পর বললাম. অধ্যাপক মিশ্র আমি কয়েকটি প্রশ্ন নিযে আপনার কাছে এসেছি। উত্তর পেলে ধন্য হবো। অধ্যাপক মিশ্র বললেন আমার জানা থাকলে আমি নিশ্চয়ই আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবো।

আমি ঃ অধ্যাপক মিশ্র আপনি নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রের দাদা অথবা ভাই-এর উত্তরপুরুষ।

অধ্যাপক ঃ আজ থেকে চব্বিশ-পঁচিশ উর্দ্ধতন পুরুষ ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র ও তাঁব ভাই-এরা । তাই বংশাবলীর সম্যকপবিচয় দেওয়া তো সম্ভব নয়। তবু এই ঢাকা দক্ষিণে মিশ্র বংশের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় তাব পবিচয দিচ্ছি।

শ্রীহট্ট অঞ্চল বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিবতীর্থরূপে খ্যাত ছিলো। এই তীর্থ দর্শনের মানসে মিথিলার এক ব্রাহ্মণ, ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এই শ্রীহট্ট অঞ্চল তীর্থ ভ্রমণে আসেন। তিনি এসেছিলেন তাব পত্নী শোভাদেবীকে সঙ্গে নিযে। এই শ্রীহট্টে এসে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে এবং সাধাবণ মানুষের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে উপেন মিশ্র ও শোভাদেবী স্থির করেন, তাঁরা আর ফিরে যাবেন না মিথিলায়। শ্রীহট্টের এই পূর্ব-অঞ্চলেই বসবাস করবেন স্থায়ীভাবে। এখানেই নতুন করে ঘর বাঁধলেন তাঁরা। শ্রীহট্ট নিবাসী শোভাদেবীব গর্ভে মিশ্রেব সাতপুত্রের জন্ম হয়। জন্ম-ক্রম অনুসাবে উপেন মিশ্র ও শোবাদেবীব পুত্রদেব পরিচয়—

উপেন্দ্রনাথ মিশ্র
ও
শোভাদেবী

কংসারি মিশ্র | পরমানন্দ মিশ্র | পদ্মনাভ মিশ্র | সর্বেশ্বব মিশ্র | জগন্নাথ মিশ্রও নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবী | জনার্দন মিশ্র | ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী:

বিশ্বরূপ | বিশ্বম্ভের (নিমাই) শ্রীচৈতন্য

আলোচনা শেষে আমি ও মিষ্টি বিদায় নিলাম অধ্যাপক রাধাবিনোদ মিশ্রের কাছে।

দ্বিপ্রাহবিক আহার কবাব জন্য খুবই অনুবোধ করেছিলেন অধ্যাপক মিশ্র। আমবা সেই অনুবোধ বাখতে পাবিনি নানা কারণে। কিন্তু একটি বিষযেব উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন। অধ্যাপক মিশ্র বললেন মহাপ্রভুব পিতামহ ও পিতামহী, উপেন্দ্রনাথ মিশ্র ও শোভাদেবী শ্রীহট্টেব ঢাকা-দক্ষিণের অন্তর্গত দত্তবাইল গ্রামে এসেছিলেন এবং এই গ্রামে বসবাস কবেছিলেন। কিন্তু ডঃ সুকুমাব সেনেব "বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস"-এব ১ম খণ্ডেব একাদশ পবিচ্ছেদ-এব টীকায বযেছে—'প্রসঙ্গান্তরে জযানন্দ লিখিযাছেন—

"চৈতন্য গোসাঞিব পূর্বপুরুষ আছিলা যাজপুবে।

শ্রীহট্টদেশেবে পলাএগা গেল বাজা ভ্রমবেব ডরে।।"

উপেন্দ্রনাথ মিশ্রেব পূর্ব-নিবাস কোথায ছিলো বিহাবেব মিথিলায অথবা উড়িষ্যার যাজপুবে সেই সম্পর্কে কোন স্থিব সিদ্ধান্তে আসা আজ আব বোধ হয সম্ভব নয।

ফেবাব পথে সুবমা নদীর সেতুব ওপর দিযে আসছি, এমন সময মিষ্টি বললে ঐ দেখুন বাজা গৌড়গোবিন্দেব গড। বললাম, গৌডগোবিন্দেব গড় ! গৌড়গোবিন্দ আবাব কে ? মিষ্টি বললে, তাতো জানি না আমি।

পবে জেনেছি, এই অঞ্চলে ছোট ছোট তিনটি বাজ্য ছিলো তাদেব নাম ছিলো গৌড়, লাউড আব জযন্তিযা। রাজ্য তিনটিব মধ্যে গৌড বাজ্য ছিলো প্রধান। গৌড়েব বাজধানী ছিলো শ্রীহট্ট। খ্রীস্টীয দ্বাদশ শতকে শ্রীহট্টে গৌডগোবিন্দ নামে এক বাজা ছিলেন। শ্রীহট্ট শহবেব গড-দুযাব পল্লীতে গৌডগোবিন্দেব যে দুর্গ ছিলো সুবমা সেতুব উপব থেকে সেই দুর্গেবই ভগ্নাবশেষ মিষ্টি দেখিয়ে ছিলো আমাকে। শহরেব মধ্যে মনাবাযেব টিলা এবং টিলাগড়েও গৌডগোবিন্দেব দুর্গ ছিলো।

বাজা গৌডগোবিন্দ সম্পর্কে সুন্দব একটি মনোজ্ঞ কাহিনী শোনা যায। এক সময় বাজা গৌডগোবিন্দ কোন এক কঠিন পীড়ায আক্রান্ত হন। স্থানীয় চিকিৎসকগণ বাজাব সেই বোগেব উপশমেব জন্য বহু চেষ্টা কবলেন। কিন্তু বাজা বোগমুক্ত হলেন না। তখন উত্তব-পূর্ব ভাবতেব সেই সময়েব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্তেব কাছে লোক পাঠানো হোলো।

চক্রপাণি দত্ত একদিকে ছিলেন সেইযুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, অন্যদিকে ছিলেন বহু গ্রন্থের বচযিতা। তাঁব বচিত গ্রন্থগুলিব মধ্যে চিকিৎসা সংগ্রহ, দ্রব্যগুণ, সর্বসাব সংগ্রহ, চবকতত্ত্ব-প্রদীপিকা, শুশ্রুতটীকা, ভানুমতী, চবক-চতুবানন, শুশ্রুত-সহস্রনয়ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়াও তিনি ব্যাকরণ-তত্ত্বচন্দ্রিকা এবং শব্দচন্দ্রিকা গ্রন্থদ্বয়ও বচনা করেছিলেন।

এই মহাপণ্ডিত এবং চিকিৎসক শিবোমণি চক্রপাণি দত্ত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকেব শেষেব দিকে ববেন্দ্রভূমিব ময়ুবেশ্বর গ্রামে বর্তমান ছিলেন। ময়ূবেশ্বব ছিলো গঙ্গাতীববর্তী বহুপ্রাচীন বর্ধিষ্ণু একটি গ্রাম।

বোগাক্রান্ত বাজা গৌড়গোবিন্দেব চিকিৎসাব জন্য যখন চক্রপাণি দত্তেব কাছে লোক পাঠানো হয় তখন তিনি বার্ধক্যহেতু জড়াক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই অবস্থায় তিনি গঙ্গাতীববর্তী ময়ুবেশ্বব ছেড়ে গঙ্গাহীন শ্রীহট্টে আসতে বাজি হলেন না।

কী আব কবণীয়! হতাশ হয়ে বানী, আত্মীয় স্বজন এব প্রজাগণ বাজাব মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে মুহ্যমান। তখন বানী গা থেকে তাঁব সমস্ত অলঙ্কাব খুলে একটি পেটিকায ভর্তি কবলেন এবং পেটিকাখানি চক্রপানিব কাছে পাঠিযে বলে পাঠালেন, আপনাব চিকিৎসা ছাড়া মহাবাজেব জীবনেব আশা নেই। আব মহাবাজই যদি জীবিত না থাকেন আমাব জীবনে কী প্রয়োজন থাকতে পাবে! আমিও মহাবাজেব অনুগামী হবো স্থিব কবেছি। তাই অলংকাবেব এই পেটিকাটি আপনাব কাছে পাঠালাম। আপনি এমন চিকিৎসায় এইসব অলংকাবেব বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় কববেন যাতে কোন নাবীকে তাব মৃত স্বামীব অনুগামী না হতে হয়।

স্নেহ অতি বলবান। অতি পাষাণ হৃদয়ও গলে যায় স্নেহেব শক্তিতে। মহাবানীব প্রাণ স্নেহ তিনপুত্র সহ চক্রপানিকে টেনে আনলো শ্রীহট্টে পীড়িত মহাবাজ গৌড় গোবিন্দেব শয্যাপাশে। চক্রপাণিব চিকিৎসায় মহাবাজ বোগ মুক্ত হলেন। তাবপব চক্রপাণি তাঁব জ্যেষ্ঠপুত্র সহ ফিবে গেলেন ববেন্দ্রভূমিব গঙ্গাতীবেব ময়ুবেশ্বাবে। অপব দুই পুত্র মহীপতি ও মুকুন্দকে মহাবাজ গৌড়গোবিন্দ বহু ভূসম্পত্তি দান কবে শ্রীহট্টে বসবাস কবালেন।

শ্রীহট্টেব বাজা গৌড়গোবিন্দ সম্পর্কে আব একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি যদি সত্য হয় তাহলে সত্যেব খাতিবে বলতেই হয় এই বাজা গৌড়গোবিন্দেব ন্যায় ধর্মান্ধ, পাষাণ হৃদয় নিষ্ঠুব ব্যক্তি জগতে অতি অল্পই জন্মেছেন এবং ধবণীকে কলঙ্কিত কবেছেন।

কাহিনীটি হোলো, বাজা গৌড়গোবিন্দেব বাজত্বকালে বুলটিকব নিবাসী বুবহানউদ্দিন নামে একব্যক্তি তাঁব পুত্রেব জন্ম উপলক্ষে গোহত্যা কবেন। একটি চিল এক খণ্ড গোমাংস ঠোঁটে নিযে যাবাব সময সেই গোমাংস বাজবাড়িতে পড়ে যায। তাব ফলে বাজা গৌড়গোবিন্দ ক্রুদ্ধ হযে বুবহানউদ্দিনেব হাত কেটে দিতে এবং নবজাত শিশুপুত্রটিকে হত্যা কবাব আদেশ দেন। গোবধেব জন্য নুবউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকেও নিহত কবা হয।

বুরাহনউদ্দিন এবং নুবউদ্দিনেব ভাই সুবর্ণগামেব বাজা শাম্‌সউদ্দিন ইলিযাসেব কাছে যান এবং গৌড়গোবন্দিকে শাস্তি দানেব আবেদন জানান। বাজা শাম্‌সুউদ্দিন একদল সৈন্য

পাঠালেন গৌড় গোবিন্দেব বিরুদ্ধে। কিন্তু গৌড় গোবিন্দের সঙ্গে যুদ্ধে পবাজিত হয়ে সেই সৈন্যদল পালিয়ে যায়।

তখন বুবাহানউদ্দিন ও নুবউদ্দিনেব ভাই দিল্লিব সুলতান আলাউদ্দিন ফিবোজ শাহ্ তুঘলকের কাছে যান এবং সমস্ত ঘটনা বলেন। সুলতান তাঁব ভাগ্নে সিকন্দার শাহ গাজীব অধীনে একদল সৈন্যকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে পাঠিযে দেন। কিন্তু উত্তবপূর্ব ভারতের বর্তমান অসম অঞ্চলের বর্ষায় সৈন্যদল অসুস্থ হযে পড়ে। সিকন্দার শাহ্ পুনরায় সৈন্যদল নিযে আসেন। কিন্তু সেই সৈন্যদলও অসুস্থ হয়ে পড়ে বর্ষায়। তখন সিকন্দর শাহ্ গৌড়গোবিন্দকে পরাজিত কবার আশা ত্যাগ কবে দিল্লি ফিবে যায়। বুবহানউদ্দিন হতাশ হযে মদিনা যাবার সঙ্কল্প করলেন। মদিনাব পথে দিল্লিতে উপস্থিত হলে বুরহানউদ্দিনের সঙ্গে প্রসিদ্ধ দববেশ হজরত শাহ্ জালালের দেখা হয়। বুবহানউদ্দিনের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে হজবত শাহ্ জালাল নিজ দলবল সহ শ্রীহট্টের পথে যাত্রা করলেন। এদিকে সিকন্দার শাহেব পবাজযের কথা শুনে সুলতান নসীবউদ্দিন নামে এক সেনাপতিকে একহাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং তিন হাজাব পদাতিক সৈন্য সহ পাঠালেন। পথে এলাহাবাদে এই উভয দলের সাক্ষাৎ হোলো। আবাব পরাজিত সিকন্দর শাহ্ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

সম্মিলিত সৈন্যদল ব্রহ্মপুত্র তীবে পৌঁছুলে তাবা যাতে ব্রহ্মপুত্র পার না হতে পারে তার জন্য গৌড়গোবিন্দ সমস্ত নৌকা চলাচল বন্ধ কবে দিলেন। কিন্তু হজবত শাহ্ জালালের অলৌকিক ক্ষমতাবলে সৈন্যদল নমাজ পড়বার নিজ নিজ চর্মাসন জলে ভাসিয়ে এবং তাই ধবে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে এলো। পথে বরাক নদী এবং পরে সুরমা নদীও একই উপায়ে পাব হয়ে এলো সৈন্যদল। শ্রীহট্ট অতি সহজেই পবাজিত হোলো। গৌড়গোবিন্দ সেই যুদ্ধে নিহত হলেন। তিনি ছিলেন শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা।

হজবত শাহজালাল কুবেশী বংশে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। হজরত মুহম্মদও কুরেশী বংশীয ছিলেন। যুদ্ধজয়েব পর হজবত শাহ্ জালাল শ্রীহট্টেই বয়ে গেলেন এবং নির্জন একটি স্থান বেছে নিযে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন ও ধর্মসাধনায মনোনিবেশ করলেন। শ্রীহট্টে তিরিশ বৎসর ধর্ম সাধনার পর বাষট্টি বৎসব বযেসে হজরত শাহ্ জালাল দেহত্যাগ কবেন। মসজিদের পাশেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

শাহজালালেব এই দরগাহ্ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছেই তীর্থে পরিণত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদেব কল্যাণ-কামনায় এই দরগাহে শির্নি দিয়ে থাকেন।

সন্ধের সময অফিস থেকে ফিরে শ্রীমান নিবঞ্জন বললে, চলুন শ্রীহট্টের এক খ্যাতিমান

আহা ! তখন যদি যেতাম ! তাহলে সুহাসিনীদিকে তখনই দেখতে পেতাম। পরিচয়ও হয়ে যেত হয়তো। তিনিও যে নোয়াখালি গিয়েছিলেন মহাত্মাজীর মহান ব্রতে ব্রতী হতে। কিন্তু এসব কথা পরের। পরে হবে। বাংলাদেশ যাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে সেদেশে গেলাম এবং সারা দেশটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। আমার ভ্রমণ-সূচীতে শ্রীহট্ট আছে শুনে জয়াগের "গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের" সেক্রেটারি শ্রীযুক্তা ঝর্ণাধাবা চৌধুরী ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন, আপনি শ্রীহট্টে গিয়ে "উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাসে" শ্রীযুক্তা সুহাসিনী দাসেব কাছে উঠবেন। তখন জানি না, সুহাসিনীদি কে ! কী তাঁর পরিচয়।

পরিচয় পেলাম "পাহাড়িকা" ট্রেন ধরে এসে শিলেট স্টেশনে নামতেই। যাত্রীবা ট্রেন থেকে নামছে ঝুপ ঝুপ করে। ওদিকে আকাশ থেকে বৃষ্টিও পড়তে শুরু কবলো ঝুপ ঝুপ করে। অজানা-অচেনা জায়গায় আমি তো দিশেহারা। কোনরকমে আধভেজা জামা-কাপড়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। দেখি, জনৈক ভদ্রলোক অটোরিকসায় উঠলেন সপরিবাবে। অটোরিক্সা ছাড়ো-ছাড়ো, আমি কাছে গিয়ে বললাম, উমেশচন্দ্র-নির্মলা বালা ছাত্রাবাসে কীভাবে যাবো বলে দেবেন?

ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন ? কলকাতা থেকে আসছি শুনে বললেন, এই অটোতেই উঠে পড়ুন। পথে যেতে যেতে জানতে চাইলাম তিনি সুহাসিনীদিকে চেনেন কিনা। ভদ্রলোক বললেন, শিলেটে সুহাসিনীদিকে চেনে না কে ! তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্রী।

ছাত্রাবাসের দরজায় এসে ডাক দিতেই একটি ছাত্র বেরিয়ে এল এবং কলকাতা থেকে এসেছি শুনে আমাকে সুহাসিনীদির দরজায় নিয়ে এল। সুহাসিনীদি জপ কবছিলেন তখন ঘরে বসে। সেই অবস্থাতেই বেরিযে এলেন। হাতে জপের মালা। আমি স্পষ্ট দেখলাম, আমার সম্মুখে এক দেবীমূর্তি আবির্ভূতা হলেন। আমি পদপ্রান্তে শিব লুটিয়ে দেবীকে প্রণাম করলাম।

কিছুপরে কর্মস্থল থেকে ফিরে এল শ্রীমান নিবঞ্জন দত্ত। এই ছাত্রাবাসেব প্রাক্তন আবাসিক। বর্তমানে এই ছাত্রাবাসের সেবাতেই নিজেকে উৎসর্গ করেছে। বলা নেই, কওযা নেই, আমার মযলা কাপড়-চোপড় নিয়ে নিরঞ্জন কাচ্‌তে বসলো। আমি সঙ্কোচে বাঁচি না। ব্যক্তি জীবনের স্বাবলম্বনে আমি গান্ধাজীব অনুসারী। কিন্তু নিরঞ্জনের দাবী অতিথি সেবার। অতিথি নারায়ণ যে। রাতে দুটি ছাত্রী আমার রাতের-খাবার নিয়ে এলো। সাবাক্ষণ সম্মুখে থেকে এটা ওটা খাওয়ার দাবী জানিয়ে কয়েক মিনিটেই ওরা আমার কন্যার স্থানটি অধিকার করল সেবার মধ্য দিয়ে। আসলে, ছাত্রাবাসের সম্পাদিকা সুহাসিনীদি'র প্রকৃতির প্রতিফলন এইসব প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রাছাত্রীদের নিরহঙ্কার আত্মপ্রচার-বিমুখ সেবাব্রতে।

পরদিন সকাল থেকে দেখে বেড়ালাম শ্রীহট্টেব দর্শনীয় স্থানগুলি। তাবপর গেলাম ঢাকা-দক্ষিণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পৈত্রিকভূমি দেখতে। ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। সুহাসিনীদি'

হাত মুখ ধুযে আসতে বললেন। তাঁর ঘরে গিযে দেখি টেবিলের ওপর বড় একটা প্লেটে পাটিসাপ্‌টা, পুলি, নারকেলনাড়ু ও আমার নাম-না-জানা নানারকমের খাবার সাজানো। জিভে জল নিয়ে আম অবাক বিস্মযে চেয়ে আছি খাবারগুলির পানে। সুহাসিনীদি' ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন আমি বর্ধমানেব ঘটি। তাই আমাকে অমনভাবে চেয়ে থাকতে দেখে স্মিত মুখে বললেন, তোমাদেব ওখানে তো এইসব তৈরি হয় না। তাই ভাবলাম, নিজের হাতে বানাই বাংলার এই বিশেষ খাবারগুলি।

অমৃত তো খাইনি জীবনে। তাই ঠিক তুলনা করতে পারছিনা চুরাশী বছর বয়স্কা এই মহীয়সীব হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহমাখানো স্বহস্তে-তৈরি এই খাদ্যগুলির সঙ্গে দেব-ভোগ্য অমৃতেব।

সুহাসিনীদি'র কাছে আমার কতকগুলি প্রশ্ন করার ছিলো। পরদিন সকালে টেপ-বেকর্ডারখানি নিয়ে তাঁর কাছে এসে বসলাম। প্রশ্ন করার অনুমতি পেয়েই বললাম, দিদি! আপনি কীভাবে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন ?

সুহাসিনীদি' বললেন, আমার জন্ম হয়েছিল সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার জগন্নাথপুর গ্রামে। আমার বাবা স্বর্গীয় প্যারীমোহন রায় ভক্তিমান ও ধনী ছিলেন। আমার মা ছিলেন স্বর্গীয়া শোভা রায়। আমি ছিলাম তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা। আমি গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলে লেখাপড়া কবেছি।

ষোল বছর বয়েসে আমার বিযে হয় সিলেট নিবাসী কুমুদচন্দ্র দাসের সঙ্গে। তিনি সিলেটেব জামতলাব এক প্রাচীন বুনিযাদী পবিবারের সন্তান ছিলেন। আমার শ্বশুরমশাই স্বর্গীয কোটিচাঁদ দাস সিলেটে প্রথম "কোটিচাঁদ লাইব্রেরি" নামে বই-এর দোকান স্থাপন কবেছিলেন।

আমাব স্বামী আই.এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপব কলেজ থেকে বাব হযে সুনামগঞ্জে যান এবং একটা প্রেসে কাজ শিখতে আবম্ভ করেন। বছর তিনকের মধ্যে কাজ শিখে তিনি সেই প্রেসটা কিনে নিলেন এবং সিলেটে নিযে এলেন। তখনকার দিনে সিলেটে কোন প্রেস ছিল না। আমাদের বাড়িতে অনেকখানি জায়গা ছিলো। সেই জায়গায ঘর তুলে আমার স্বামী বাড়ির মধ্যেই প্রেস করলেন। সেই প্রেস হল সিলেট শহরের প্রথম এবং সিলেট জেলার দ্বিতীয প্রেস।

বিয়ের পর আমি সিলেট শহবে এলাম। বছর তিনেকেব মধ্যে আমার মেয়ের জন্ম হল। তারপর আমাব স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুখ সারছে না দেখে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু সেরে উঠলেন না তিনি। কলকাতাতেই আমার স্বামীর মৃত্যু হল। আমার মেয়ে তখন একবছব পাঁচমাসের। আমি ভীষণ আঘাত পেলাম। সব হাবিয়ে যখন বাড়ি ফিরে এলাম তখন আমার মানসিক অবস্থা এমন যে মেয়েটার যত্ন করতেও ভালো লাগতো না। মনে হত সংসারে তো আমার কিছুই নেই। কিন্তু আমার শ্বশুর-বাড়ির পরিবারটি খুব ভাল ছিল। আমার বড়-জা চাইতেন আমার মেয়ে যেন এই বাড়িতেই মানুষ হয়। আমাব দেওর আমার মেয়ের জন্যে আলাদা চাকর রেখে দিলেন।

আমার মন যাতে ভাল থাকে তার জন্যে আমাব দেওব লাইব্রেরি থেকে ভাল ভাল বই এনে পড়তে দিতেন। আমার শ্বশুব বাড়িতে আনন্দবাজার পত্রিকা, গান্ধীজীব হরিজন পত্রিকা প্রভৃতি আসত। সেই পত্রিকাগুলি আমি পড়তাম। আমার দেওব ছিলেন স্বদেশী মনোভাবাপন্ন। তখন ইংবেজ সবকাব কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত কাগজপত্র আমাদেব প্রেসে ছাপানো হত। এইসব কাগজপত্র পড়ে আমাব বেশ কয়েক বছব কেটে গেল।

আমি বিশ বছর বযেসে বিধবা হয়েছিলাম। তাবপব পাঁচ সাত বছব বাড়ি থেকে বাব হইনি। আমাব বিশ ভড়ি সোনাব গয়না ছিলো। সে সব গা থেকে খুলে বাখলাম। আত্মীয়-স্বজনেদের বহু অনুরাধেও সেই সব গযনা আব পবলাম না। তাব বদলে গলায় তুলসী মালা পরলাম। সাদা সেমিজ ও থান পবলাম। স্যান্ডেল পবতাম না। খালি পায়ে থাকতাম। এই সময সিলেটে একটা মহিলা কনফারেন্স হল। সেই কনফাবেন্সে এসেছিলেন ঢাকাব আশালতা সেন। দুই দিন পব তৃতীয দিনে আমাদেব পাশেব বাড়িব একটা বউ আমাকে বললো, চলনা তুমি তো কোথাও যাও না। সেখানে অনেক মহিলা এসেছেন। তখন আমি সেমিজ ও মিলেব ধুতি পবি। সেই পোশাকেই তিনি আমাকে কনফারেন্সে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি বক্তৃতা যা শুনলাম তাতে আমি মুগ্ধ হলাম। সেখানে দেখলাম আশালতা সেন এবং অন্যান্য মহিলাবা চবকায সুতো কাটছেন। পত্রপত্রিকায ছবিতে গান্ধীজীকে সুতো কাটতে দেখেছি। এতো সেই সুতো কাটা। ভেবে দেখলাম, বাড়িতে তো আমাব সময কাটে না। আমি তো ঘবে বসে সুতো কাটতে পাবি।

বাড়ি এলাম। আমাদেব বড়বাড়ি। আমবা তো বাড়ির বাইবে যেতাম না। কিছু দবকাব হলে চাকবে জিনিস এনে দিতো। শুধু লিখে দিলেই হত। আমি লিখে দিলাম আমবা জন্যে একটা চরকা আর কিছু তুলো আনতে। সে একটা বক্স-চবখা আব কিছু তুলোব পাঁজ নিয়ে এল। কিন্তু আমিতো সুতো কাটতে জানি না। শিখবো কী কবে। এই চিন্তায় আছি।

এই সময় মহিলা সংঘের সভানেত্রী ছিলেন কিরণশশী দে এবং সম্পাদিকা ছিলেন সরলাবালা দেব। নরেশ নন্দিনী দত্ত ছিলেন মহিলা সংঘের উৎসাহী কর্মী। নরেশ নন্দিনী দত্ত আমাদের বাড়িব সামনে দিয়ে যাতাযাত করতেন। তখন প্রায়ই আমি আমাদের বাড়ির দরজায দাঁড়িযে থাকতাম। একদিন আমাকে দরজায দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেশ নন্দিনী দত্ত কিরণ শশী দেকে বলেছেন, সেই বড়বাড়ির দবজায় একটা স্বাস্থবতী অল্পবয়েসী বউ, খুব লম্বা লম্বা চুল তার, দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। চলো না, একদিন গিয়ে আলাপ করে আসি।

একদিন ওঁরা আমাদের বাড়ি এলেন। বললেন, তুমি বাড়িতে বসে থাকো। বাড়িতে তো দেখি আনন্দবাজার, গান্ধীজীর হবিজন পত্রিকা ইত্যাদি রয়েছে। তা তুমি কংগ্রেসেব সদস্যা হও না। আমি বললাম, আমি তো বাড়ির বাইরেও যাই না। সদস্যা হয়ে কী করব। ওঁরা ছাড়লেন না। আমিও আমার ছোট-জা সদস্যা হলাম। ওঁদের সঙ্গে আমার পবিচয়

হয়ে গেল। ওঁবা আমাকে সুতো কাটা শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি আমাদের মহিলা সংঘে এস।

তাব কয়েকদিন পব ২৬শ জানুযাবি। মহিলা সংঘে সভা হবে। নবেশ নন্দিনী দত্ত এসে আমাকে মহিলা সংঘের সভায় নিয়ে গেলেন। তখন সভাব সমস্ত দেখলাম, বক্তৃতা শুনলাম। সম্পাদিকা সবলাবালা দেব সেই সভায ২৬শে জানুয়ারিব সঙ্কল্পগুলি পড়ে বললেন, তোমবা এই সঙ্কল্পগুলিব অন্ততঃ একটা জীবনে গ্রহণ কবো। তাই শুনে কেন জানি না, আমাব মনে হল এবং বললাম, আমি প্রতিজ্ঞা কবছি, আগামীকাল থেকে আজীবন আমি খদ্দব পবব। আজ ১৯৩৯ সালেব ২৬শে জানুযাবি এই হল আমাব সঙ্কল্প। আমাব সেই সঙ্কল্প আজও আমি বহন করে চলেছি।

তখন আমি অনেক সুতো কেটেছি। সেব-পাঁচেক সুতো জমেছে। পরদিন চাকবকে দিযে আমার সমস্ত সুতো খদ্দবেব দোকানে পাঠিযে দিলাম। সেই সুতোর বিনিময়ে দশগজ খদ্দবেব কাপড নিযে এল সে। সেই আমি খদ্দব পবতে শুরু কবলাম।

একদিন আমাদেব চাকব দোকানে সুতো নিয়ে গেছে। সেই সময় ধীরেন দাসগুপ্ত দোকানে বসা। তিনি সুতো দেখে জিজ্ঞেস কবলেন, এই সতীশ ! এতো ভালো সুতো কে কেটেছে বে ? দোকানেব মালিক সতীশ নাগ বলেছেন, আমি চিনি না। শুনেছি, জামতলাব বড-বাড়িতে একটি বৌ আছে, সে নিজেও সুতো কাটে। আবাব কয়েকজনকে সুতো কাটতে শিখিয়েছেও। তখন ধীবেন দাসগুপ্ত আমাদেব চাকরকে বলেছেন, তুমি ফণীকে বলবে গিযে, আমি তাব বাড়ি গিয়ে তাব বৌদিব সঙ্গে কথা বলতে চাই তাব যদি আপত্তি না থাকে। চাকব এসে যখন বললো আমাব দেওবতো মহা খুশি।

পবদিন বেলা চাবটেয তিনি এলেন। সেই সময আমি যাদের সুতো কাটা-শিখিযেছিলাম তাবাও এল। উনি দেখে খুব খুশি হলেন। তাবপব বললেন, পাঁজ কিনে সুতো কাটলে চলবে না। স্বাবলম্বী হতে হবে। তুলো ধোনা, পাঁজ বানানো, এসবও শিখতে হবে। আমি লোক পাঠাবো। সে ঐসব শিখিয়ে দেবে।

আমি মহিলা সংঘেব সঙ্গে ধীবে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়লাম। তখন ধীবেন দাসগুপ্ত বললেন তুমি মহিলা সঙ্ঘের কোন একটা কাজেব ভাব নাও। প্রস্তাবটা আমার খুব ভাল লাগল। বাড়িতে বান্নাবান্না সেরে খাওযা দাওয়া সেরে আমি বেলা একটার মধ্যে মহিলা সঙ্ঘে চলে যেতাম। সেখানে চামড়াব ওপব নানা ডিজাইন করার কাজ ও তাঁত-বোনাব কাজ শিখলাম। তখন আমাকে মহিলা সঙ্ঘে তাঁত-বোনাব কাজ দেওয়া হল। আমি কাজের ভাব নিলাম, কিন্তু বেতন নিতে রাজি হলাম না।

এলো '৪২-এর "ভাবত-ছাড়ো" আন্দোলন। আমবা এখানকার জেলা-কংগ্রেসের শাখা মহিলা সঙ্ঘে কাজ কবতাম। অনেক সদস্যা ছিলেন মহিলা সঙ্ঘের। '৪২-এব আন্দোলনে কংগ্রেসের ছেলেরা যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলা সঙ্ঘের সদস্যারাও তেমনি যোগ দিল। সেইসময় একদিন কোর্টে পিকেটিং করা হবে স্থির হল। মহিলা সঙ্ঘের সদস্যাদের সঙ্গে

আমিও গেলাম পিকেটিং করতে। নির্দেশ এলো, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সে সেখানেই থাকবে। হাজার গুলি চললেও স্থানত্যাগ কববেন না। নির্দেশ মতো আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

এমন সময় হঠাৎ একটা হুলস্থুল শোনা গেল। জজ-কোর্টের সামনে একটা কলেজ-ছাত্রী দাঁড়িয়েছিল। জজ-সাহেবকে কোর্টে ঢুকতে সে বাধা দিয়েছে। জজসাহেব তাকে ধাক্কা দিয়েছে। তার গায়ে হাত দিয়েছে এই অপবাধে মেয়েটি তার পায়ের চটি খুলে জজসাহেবর গায়ে বসিযে দিয়েছে ঘা-কয়েক। আমরা শুনলাম গুলি চলবে। তা শেষ পর্যন্ত গুলি চললো না।

ইতিমধ্যে স্বদেশপন্থী এক উকিলের স্ত্রী স্নেহলতা বসু এক কাণ্ড কবে বসলেন। জজসাহেবের ঘরের দরজায় পুলিশপাহাবা নেই দেখে তিনি গিয়ে জজসাহেবের চেয়াবে বসে পড়লেন। স্নেহলতা ছিলেন সুভাষ-পন্থী। আমাদের ওপর বাড়ি চলে যাবার নির্দেশ এলে আমরা বাড়ি চলে গেলাম। শুনলাম, বেলা চারটে পর্যন্ত স্নেহলতা জজসাহেবের চেয়ারে বসে ছিলেন। সেই চেয়ারে যে বসে আছে তাকে জোর করে তোলা যায় না। চারটের পর স্নেহলতা এক দৌড়ে গেটের বাইরে চলে আসে। সেখানে সুভাষপন্থী ছেলেবা অপেক্ষা করছিল। তারা গাড়ি করে স্নেহলতাকে নিয়ে পালিয়ে যায। পুলিশ স্নেহলতাকে ধরতে পারলো না। দুই মাসের মধ্যে তাকে আর পাওযা যাযনি।

দিনকয়েক বাদে আমাদের গ্রেপ্তাব করে থানাব লক্-আপ এবং সেখান থেকে জেল হাজতে নিয়ে গেল। পরে বিচারে কারো ৬ মাস, কারো এক বছর, কারো-বা দুই বছব জেল হল। আমার এক বছব জেল হলেও নয় মাস জেলে ছিলাম। জেলে আমাদের এ. বি. ও সি এই তিন শ্রেণী দেওযা হযেছিল। আমবা প্রতিবাদে একদিনের অনশন করলাম, আমবা একই শ্রেণীতে এক খাবার এক পোশাক চাই। জেল-সুপার আমাদের দাবী মেনে নিলেন।

আমি জানতে চাইলাম, দিদি ! আপনারা কোন জেলে ছিলেন ? সুহাসিনীদি বললেন, আমরা সিলেট জেলে ছিলাম। দুই মাস পরে স্নেহদিকে গ্রেপ্তাব করা হয়। তখন তাঁব দুই মেয়ের বড়টি ৬ বছরের এবং ছোটটি ৩ বছরের। জেলে দুই বছরের বেশি বয়েসেব ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু স্নেহদি জানালেন, আমার স্বামীও জেলে। আমার মেয়েদের দেখবে কে? হয়, আমাকে সঙ্গে নিতে দাও, নয়তো তোমরা যা হয় করো। আমি মেয়েদের ছেড়ে জেলে যাবো না। অবশেষে দুই মেয়েকেই নিয়ে স্নেহদি জেলে গেলেন। প্রসঙ্গতঃ জানাই স্নেহদি এখনো জীবিত আছেন।

মেয়াদ শেযে আমরা মুক্তি পেলাম জেল থেকে। তখন কম্যুনিস্টরা খুব শক্তিশালী হযে উঠেছে। '৪২-এর আন্দোলনে কম্যুনিস্টরা যোগ দেয়নি। উল্টে বাধা দিয়েছে। যদিও বাধা দিতে পারেনি। অবশ্য কংগ্রেস নেতা ও কর্মিগণ জেলে গেলে তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে কম্যুনিস্টরা শক্তি অর্জন করে।

৪৩, ৪৪ এবং ৪৫ সালের মধ্যেই সব কংগ্রেসকর্মী ও নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। তখন আন্দোলন থেমে গেছে। সেই সময় জহরলাল নেহেরু সিলেটে এলেন।

তার বহু আগে (১৯৩৭) সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে সিলেট এসেছিলেন। জহরলালকে মহিলা সঙ্ঘের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করার দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হয়।

এই সময় নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হল। কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যপদপ্রার্থী হয়ে সিলেট থেকে দাঁড়ালেন পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত। সেই সময় আমি পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত ও নিকুঞ্জ গোস্বামীর সংস্পর্শে এলাম এবং ওঁদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলাম। তখন ওরা চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করেন। আমিও সেই কাজে যুক্ত হলাম। চা-শ্রমিকদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার করা ছিল আমার কাজ। তখন চা-শ্রমিকদের ভোটাধিকার ছিল না। তারজন্যে আমরা আন্দোলন করি এবং সফল হই। চা-শ্রমিকগণ ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে চা-শ্রমিকদের মধ্য থেকে জীবন সর্দার নামে একজনকে প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যপদপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়।

এই সময় আমি আবার প্রশ্ন করলাম। বললাম, দিদি ' আপনি কীভাবে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এলেন। ?

সুহাসিনীদি' বললেন, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল এবং খুব কম সময়ে সর্বত্র বিশেষ করে নোয়াখালীতে সেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। তখন শুনলাম গান্ধাজী নোয়াখালী আসবেন। আমি ভাবলাম, গান্ধীজী সম্পর্কে এতো শুনেছি, এতো পড়েছি, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। অথচ তাঁকে দেখলাম না এখনো। এই সময় মহিলা-সঙ্ঘের সরলা দেব সহ চার-পাঁচজন মহিলা এবং নিকুঞ্জ গোস্বামী সহ কয়েকজন পুরুষ নোয়াখালী যাচ্ছেন শুনে আমি বাড়ি এলাম এবং দেওরকে বললাম, ফুলবাবু' আমাকে কটটা টাকা দিন। তিনি জানতে চাইলেন, ব্যাপার কী ? আমি বললাম, আমি নোয়াখালী যাবো। তাই শুনে দেওর বললেন, অ্যাঁ ? নোয়াখালী ? সেখানে দারুণ দাঙ্গা হচ্ছে। আমি বললাম, সরলাদি এবং আরো অনেকে যাচ্ছেন। শুনে বললেন, সরলাদি যাবেন। ক'দিন লাগবে ? আমি বললাম পাঁচ-সাত দিন লাগবে। দেওর বললেন, তবে যাও। বলে আমাকে একশোটা টাকা দিলেন।

আমরা সিলেট রেল স্টেশন থেকে যাত্রা করলাম। পরদিন নোয়াখালীর চৌমোহনীতে পৌঁছুলাম। গান্ধাজী তখন রামগঞ্জে গেছেন শুনে আমরাও গেলাম সেখানে। যে বাড়িতে গান্ধীজী ছিলেন তার কাছেই একটা টিনের ছাপরা ঘরে উঠলাম। বিকেলে প্রার্থনা-সভাস্থলে আমরা অনেক আগে পৌঁছে গেছি। বিকেল চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটে গান্ধীজী এলেন। তাঁর একদিকে মানুগান্ধী আরেক দিকে আভাগান্ধী। আমি দূর থেকে দেখছি। আমার চোখে জল এসে গেল।

এইবার প্রার্থনা সভা শুরু হবে। সেই সময় নিকুঞ্জ গোস্বামী সভাপরিচালকদের কাছে গিয়ে বললেন, আমাদের সঙ্গে ইলা দাসগুপ্ত নামে একজন স্কুল-শিক্ষিকা এসেছেন। তিনি খুব ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন। আপনারা সুযোগ দিলে তিনি আজকের প্রার্থনা সঙ্গীতটি গাইবেন। ওঁরা রাজি হলেন. সেদিন প্রার্থনার শুরুতে ইলা দাসগুপ্ত রবীন্দ্র-নাথের "ভুবনেশ্বর হে" গানটি গেয়েছিলেন।

পরদিন সকালবেলা। আমরা মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছি। এমন সময় দেখি, দলবল সহ গান্ধীজীও বেড়াতে বেরিয়েছেন। সরু আলপথ। গান্ধীজী আসছেন দেখে আমরা আলপথ ছেড়ে জমিতে নেমেছি। গান্ধীজী আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী লক্ষ্য তাঁব। ইলা দাসগুপ্তকে বললেন, কাল তুম্ আচ্ছা গানা গায়ী হ্যায়। শুনে ইলাদি'তো মহাখুশি ! এইভাবেই আমাদের সেদিনেব গান্ধী দর্শন হল।

পাঁচ-ছয়দিন পর অনেককেই ফিরে আসতে হল। কিন্তু নিকুঞ্জদা, সরলাদি, কিবণশশী দে, নরেশনন্দিনী দত্ত এবং আমি, এই পাঁচজন মনে কবলাম, এসেছি যখন তখন যতদিন পারি কাটিয়ে যাই গান্ধীজীর সঙ্গে। কিন্তু থাকতে হলে গান্ধীজী ও তাঁব সঙ্গীদের কার্যসূচী অনুসাবে চলতে হবে। কলকাতা থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ সহ অনেকেই এসেছেন। বিভিন্ন গ্রামে তাঁবা যাবেন। আর আমাদের ওপব ভাব পড়ল, গান্ধীজী যেখানে যাবেন আগে থেকে সেখানে গিয়ে প্রস্তুতি নেওয়াব। আমুলিয়া বলে একটা গ্রামে আমাদের পাঠানো হল।

গান্ধীজী যাওয়ার পাঁচ-সাতদিন আগেই আমরা আমুলিযা গেছি। সেদিন বিকেলবেলা হঠাৎ আমার খুব জ্বব এল। পরদিন সকালে দেখি আমার গাযে গোটা গোটা বসন্ত বাব হয়েছ। তখন আমাকে এক কৈবর্ত বাড়িতে পৃথক করে বাখা হল। সেইসময় গান্ধীজী সেই গ্রামে এলেন এবং আমার অসুখেব কথা শুনলেন। দুপুরবেলায় তাঁর নাত্নী আর নাত্বৌ, মানুগান্ধী আর আভাগান্ধী, আমাকে দেখতে এলো। তারা বললে, আজ বিকেলে বাপুজী তোমাকে দেখতে আসবেন। আমি বললাম, আমাব রোগটা সংক্রামক। বাপুজী যেন না আসেন।

রোগক্রান্ত আমি সারাদিন বিছানায় পড়ে আছি। বিকেলে প্রার্থনা সভার পর দলবল সহ গান্ধীজী এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। আমি উঠে বসলাম। গান্ধীজী বললেন, কিছু ভেবো না। ভালো হয়ে উঠবে। তাবপব আবার কাজ কববে। এই বলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

গান্ধীজী আমাকে দেখতে এসেছেন। আমি অভিভূত হযে পড়েছি। আমি তাঁকে প্রণাম করতেও ভুলে গেলাম। কলকাতার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ আমাকে বলেন, সুহাসিনী যে কী ! গান্ধীজীকে একটা প্রণাম পর্যন্ত করলো না।

সেই সময় বিহার থেকে গান্ধীজীর ডাক এলো। সেখানে দাঙ্গা বেধেছে। গান্ধীজী নোয়াখালী ছেড়ে চলে গেলেন বিহার। আর তাঁব আরব্ধ কাজ চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে রয়ে গেলেন চারু চৌধূরী, চারুভাণ্ডারী এবং আরো অনেকে। আমবা তাব পরেও নোয়াখালীতে অনেকদিন ছিলাম।

সেই সময় হবিগঞ্জের গ্রামে গ্রামে দাঙ্গা বাধাল। নিকুঞ্জদা বললেন, চলো! আমরা সিলেট ফিরে যাই। আমরা সিলেটের হবিগঞ্জে কাজ কবছি, এমন সময় খবর এলো গান্ধীজী নিহত হয়েছেন। আমরা মর্মাহত তাই শুনে।

তাব ঠিক পরেই সেবাগ্রামে সর্বোদয কন্‌ফারেন্স হল। সেই কন্‌ফাবেন্সে সর্বোদয নেতা বিনোবা ভাবে সহ গান্ধী-পথেব পথিক নেতা ও কর্মিগণ সাবা ভাবত থেকে এসে যোগ দিলেন। যেন পিতার মৃত্যুব পব সন্তানগণ ইতিকর্তব্য স্থিব কবাব জন্যে মিলিত হয়েছিলেন সেবগ্রামে। আমরাও সেই কন্‌ফাবেনেন্স যোগ দিলাম।

সেই সময শুভার্থীদের পবামর্শে আমি মেদিনীপুরের বলরামপুবে কস্তুরবা গ্রামে সেবিকা শিক্ষণ গ্রহণ করলাম। শিক্ষণ শেষে ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে গ্রামে কাজ করার জন্যে বঙ্গিরকুল যাই এবং গঠনমূলক কাজে মেয়েদেব যুক্ত করি। পাকিস্থানী আমলে অনেক উত্থান পতনেব মধ্য দিয়ে কাজ করতে হযেছে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত। ঐ বৎসবেই বিনোবাজীর সঙ্গে রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে সফর করেছিলাম। ঐ ১৯৬২ সালেই নিকুঞ্জ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করলেন "উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস।" তাঁর কাজেও যুক্ত ছিলাম।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মেলন। যোগ দিয়েছিলাম সেই সম্মেলনে। তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি ইন্দিরা গান্ধী ও ভি ভি গিবি আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রদত্ত পেন্‌শান্ গ্রহণের অনুবোধ জানান। আমরা সেই সম্মেলনে যোগদানকাবী কযজন ঐ পেন্‌শান গ্রহণে রাজি না হয়ে বলেছিলাম বাংলাদেশের সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদেব দেওযা হোক। ইন্দিরা গান্ধী রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদেব সেই প্রস্তাব কার্যকরী হয নি।

নিকুঞ্জ গোস্বামী পরলোক গ্রহণ করলেন। তখন সকলের অনুবোধে "উমেশচন্দ্র-নির্মলাবালা ছাত্রাবাস"-এব পবিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করলাম এবং বঙ্গিরকুল আশ্রম ছেড়ে এখানে চলে এলাম। তখন থেকে এই ছাত্রাবাসেই বাস করছি এবং ছাত্রাবাস পরিচালনাব দাযিত্ব পালন কবে চলেছি।

সুহাসিনীদি'ব নিজেব কথা দিযেই তাঁব পুণ্য জীবনেব সামান্য পবিচয দেবার আমার এই অক্ষম প্রয়াস। আব পাঁচজন ঘবনীব মতো ঘব করতে চেযেছিলেন সুহাসিনীদি'। কিন্তু তাঁর ঘরেব ছাউনি গেলো উড়ে। তখন মর্মবেদনায দিদি দিশেহারা। সেইসময় তাঁর জীবনদেবতা নতুন পথ দেখালেন তাঁকে । মৃতুদেবতার কাছে স্বার্থ-সর্বস্ব ঘরটুকু হাবালেন। কিন্তু জীবন-দেবতা তাঁকে নিযুক্ত করলেন বিশ্বেব সেবায। নিজেব দুই বিঘা জমি বাবু কেড়ে নিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ লিখে দিলেন বিশ্বনিখিল।

শ্রীহট্ট দেখা শেষ করে বিদায় নেবার সময এলো। বিদায় দিতে সুহাসিনীদি' এসে দাঁড়ালেন ছাত্রাবাসের দোর-গোড়ায। প্রণাম সেরে বিদায় নিতে বড কষ্ট হচ্ছে। আর কি এই জীবনে দেখা পাবো!

আমার এই তুচ্ছ জীবনে তো কোন সুকৃতি নেই। তবু এমন মহীয়সীব, এমন দেবীর দর্শন হল কী করে ! তাহলে কি আমার জন্মান্তবেব কোন সুকৃতি ছিল ?

———☆———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবার ঢাকায়

ছাত্রাবাসেব শ্রীমান নিবঞ্জন দত্ত গত সন্ধ্যায অফিস থেকে ফেরাব পথে টিকিট করে এনেছিলো শ্রীহট্ট-ঢাকা এক্সপ্রেসের। ছাত্রাবাসেই মিষ্টি নামেব ছেলেটি আমাকে ট্রেনে তুলে দিযে গেলো। বড্ডো কষ্ট হচ্ছিলো ছেলেটাব কাছ থেকে বিদায় নিতে। ছেলেটা কথা বলে কম। তার সেই কম-কথার চেযেও কম কথা বুঝি আমি। বুঝলাম না-বোঝা কথাব মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

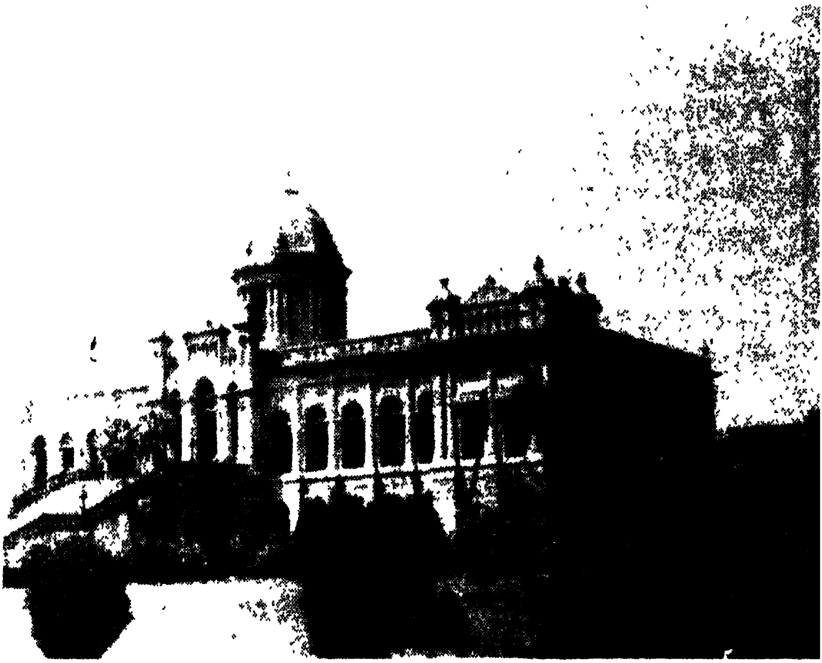
সকাল দশটায ট্রেন ছাড়লো। বাংলাদেশের সেই একই দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। সে দৃশ্য শতবার দেখলেও পুরোনো হয় না। ক্লান্তি আসে না এক দৃষ্টে তাব পানে চেযে থাকতে। তাই সারা দিনেব ট্রেন যাত্রা আমাব কাছে একটুও ক্লান্তিকর মনে হোলো না। রাত্রি প্রায আটটায় এসে পৌঁছুলাম ঢাকা স্টেশনে।

ষ্টেশন থেকে বাব হযে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলে তবে বিকসা স্ট্যান্ড। কিন্তু মুশকিলে পডলাম যে অঞ্চলে যেতে হবে আমাকে তাব নাম নিযে। নামটি মনে পড়ছে না কিছুতেই। বলছি, জগন্নাথ সাহা রোডে যাবো। বিকসাঅলাবা বলছে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু সেই জাযগাটাব নাম কী? শেষে এক বযস্ক বিকসাঅলা বললো, আপনেব ঐ জগন্নাথ বোড-টোডে কাম আইবো না কত্তা। আপনাবে কইতে আইবো আমলী-গোলা 'জাইমু'। এক ঝটাকায মনে পড়ে গেলো আমলীগোলাব নাম। বললাম, ব্যাপাবটা কী জানো ভাই। তোমাদের কথাব অর্ধেক আমি বুঝতে পাবি না। আব বাকি অর্ধেক আমার মাথায ঢোকে না।

পরদিন সকালে গেলাম আহ্‌সান মঞ্জিল দেখতে। ঢাকা নগরীব পাশ দিযে বযে চলেছে বুড়ি-গঙ্গা। তাব তীবে রযেছে বিখ্যাত বাক্‌ল্যান্ড বাঁধ। এই বাঁধেব পশ্চিমে আহ্‌সান মঞ্জিল। আহসান মঞ্জিল আসলে ছিলো ঢাকাব নবাবদেব একটা প্রাসাদ। এই অঞ্চলে ফরাসীদের ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো অনেক আগে। এখানে তাদেব একটা কারখানাও ছিলো।

এখন যেখানে আহ্‌সান মঞ্জিল বয়েছে সেখানে জালালদি-ফবিদপুরের জমিদার শেখ এনাযেত উল্লা বিশাল এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেই প্রাসাদের নাম ছিলো রংমহল। জমিদার শেখ এনায়েত উল্লাব পুত্র মতি উল্লা এই রংমহল প্রাসাদ ফরাসীদেব কাছে বিক্রি করে দেন।

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে নবাব খাজা আবদুল গনিব পিতা খাজা আজিমুল্লাহ্ ফরাসীদের কাছ থেকে রংমহল প্রাসাদ কিনে নেন এবং এই প্রাসাদেব নাম দেন আহ্‌সান মঞ্জিল। ১৮৭২



ঢাকা—আহ্সান মঞ্জিল যাদুঘর

খ্রীস্টাব্দে নবাব খাজা আবদুল গনি এই আহ্সান মঞ্জিলকে আবার নতুন করে গড়ে তোলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আহ্সান মঞ্জিল নামের প্রাসাদটিকে অধিগ্রহণ করেছেন এবং প্রাসাদটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। এখন, আহ্সান মঞ্জিলে যাদুঘর করা হয়েছে। ঢাকার নবাবদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকে শুরু করে পুরানো ঢাকার নানা বিষয় এখানে প্রদর্শিত হয়।

দুই টাকার টিকিট লাগে আহসান মঞ্জিলে ঢুকতে। ঢুকতে গিয়ে দেখি, প্রবেশ দ্বারে লেখা আনন্দ ও অভিজ্ঞতার জন্য আহ্সান মঞ্জিল যাদুঘরে আসুন। লেখাটি পড়েই মনের মধ্যে সেই কৌতুক বোধটি নেচে উঠলো। ভাবলাম, দেখা যাক কী আনন্দ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় দুটি টাকার বিনিময়ে। তবে ভবনটি প্রাচীন বলে সাবধানে চলাফেরা করার নির্দেশ রয়েছে। নিষেধ রয়েছে এক স্থানে অনেকে মিলে জটলা করার। এই যাদুঘর খোলা থাকে শনিবার থেকে বুধবার। এ দেশে সাপ্তাহিক ছুটি বৃহস্পতি ও শুক্রবার। তাই বাংলাদেশে সপ্তাহ শুরু হয় শনিবারে।

ওয়াজেদ এবং মায়ের নাম বেগম সৈয়দুন্নেসা। ফজলুল হক বরিশাল জেলা স্কুল থেকে বিভাগীয় বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন। পরে ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন, গণিত ও পদার্থ বিদ্যায় অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। তিনি ১৮৯৬ সালে গণিত শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এইরূপ উজ্জ্বল ছিলো তাঁর ছাত্রজীবন।

কর্মজীবনের শুরুতে হক সাহেব বরিশাল কলেজে অধ্যাপকের পদে ব্রতী হন। পরে কলকাতা হাইকোর্টে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েব জুনিয়র ব্যবহারজীবীরূপে ওকালতি ব্যবসায় শুরু করেন। তার কিছুদিন পরেই চলে যান ববিশাল কোর্টে। তারপব কিছু দিনেব জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি রেজিস্ট্রাবের পদে চাকরিও করেছিলেন। এই সব কাজের ফাঁকে তিনি বালক, ভারত-সুহৃদ, নবযুগ প্রভৃতি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাব সম্পাদনাও করেছেন।

১৯০৬ সালে ঢাকার রমনা ময়দানে যে সারা ভাবত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয় তাব সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হক সাহেব। এই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রথম প্রবেশ। ১৯১৩ সালে তিনি প্রবেশ করলেন বঙ্গীয় আইন সভায়। তখন থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৩৪ বৎসর তিনি বঙ্গীয় আইন সভাব সদস্য ছিলেন।

১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৬ সাল, এই তিন বছব তিনি বঙ্গীয প্রাদেশিক মুসলিম লীগেব সম্পাদক রূপে কাজ করেছেন। তারপর, ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি সাবা ভারত মুসলিম লীগের সভাপতির পদে ব্রতী হন। আবাব, ঐ সময় তিনি জাতীয কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সালে হক সাহেব জাতীয কংগ্রেসের যুগ্মসম্পাদকও হয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা কাণ্ডের তদন্তেব জন্য কংগ্রেস "পাঞ্জাব এনকোযাবি কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটিতে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিত্ব। শেবে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকও সেই কমিটিব সদস্য ছিলেন। এখানে মনে বাখা দরকার, জাতীয কংগ্রেস এবং সাবা ভাবত মুসলিম লীগেব সম্পর্ক তখন পবস্পব বিবোধী ছিলো না।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৩ সালে লন্ডনে যে তিনটি গোল টেবিল বৈঠক হয ফজলুল হক সেই বৈঠকগুলিতে মুসলমানদেব প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। পবে কংগ্রেস নেতাদেব সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায হক সাহেব নিখিলবঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি নামে এক বাজনৈতিক দল গঠন কবেন। তার ফলে মুসলিম লীগ নেতাদেব সঙ্গে তাঁব মত বিবোধ দেখা দেয। ১৯৩৬ সালেব নির্বাচনে তাঁর পার্টি নির্বাচন ইস্তাহারে জমিদাবী প্রথা উচ্ছেদেব দাবী জানায। এই নির্বাচনে তিনি লীগনেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে শোচনীযভাবে পবাজিত করেন। এই সকল ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায তখনও বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করেনি।

কিন্তু ১৯৩৬ সালের নির্বাচনেব পবেই আসে সেই পরিস্থিতি যা সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে আনে দুর্যোগের ঘনঘাটা। হক সাহেবের পার্টি বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন কবে শাসন পরিচালনাব জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই ব্যাপাবে বাংলার তৎকালীন কংগ্রেস নেতারাও খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তখনকাব কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সেই কোযালিশন মন্ত্রী সভা গঠন অনুমোদন করলো না। অথচ এই হাই কম্যাণ্ড উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোযালিশন মন্ত্রীসভা অনুমোদন কবেছিলো। ভাবতে হিন্দু মুসলমানেব তিক্ত সম্পর্ক স্থাপনে কংগ্রেসের এই দুমুখো নীতি অনেকখানি দাযী ছিলো। সুভাষ চন্দ্র তখন চিকিৎসাব জন্য ভিযেনায। শবৎচন্দ্র সহ বাংলাব তখনকাব কংগ্রেস নেতাবা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডেব এই যুক্তিহীন খামখেয়ালী নীতি অস্বীকার কবে হক সাহেবেব সঙ্গে হাত মেলাবাব সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ কবতে পাবেন নি। সুতবাং বাংলো ভাগেব দায় দুর্বল চেতা বাংলার কংগ্রেস নেতারা অস্বীকাব কবতে পাবেন না।

হক সাহেবেব নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতিব সঙ্গে বাংলার কংগ্রেসেব সেই কোযালিশন মন্ত্রীসভা যদি গঠিত হোতো তাহলে বাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বাংলা ভাগ হোতো না। ভাবত ভাগও হোতো না। ১৯৩৬ সালেব কোন এক তাবিখের বাত্রি দুটো পর্যন্ত হক সাহেবেব সঙ্গে কোযালিশন মন্ত্রীসভা গঠন নিযে আলোচনা চলেছিলো শবৎ বসুব বাড়িতে। কিন্তু হতাশা হযে চোখেব জল ফেলতে ফেলতে শরৎ বসুব বাড়ি থেকে হক সাহেবকে বেবিযে আসতে হযেছিলো সেদিন। সেই বাত্রিতেই বাংলা ও ভারত ভাগ-রূপ বিষবৃক্ষেব বীজ উপ্ত হযে গেলো। দীর্ঘ এক দশক ধরে অনুকুল পবিবেশ পেযে সেই বিষবৃক্ষটি ফলন্ত হযে উঠেছে ১৯৪৭ সালেব ১৫ই আগষ্ট। বাংলা ও ভাবত ভাগের জন্যে ষোল আনার ওপব আটাবো আনা দাযী ভাবতেব জাতীয কংগ্রেসেব হাইকম্যাণ্ড এবং দুর্বলচেতা বাংলার কংগ্রেস নেতাবা।

মুসলিম লীগ এই সুযোগে বাংলায় হক সাহেবেব নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে কোযালিশন মন্ত্রীসভা গঠন কবল এবং এই সময থেকেই বাংলায হাজাব বছব একসঙ্গে বসবাসকাবী হিন্দু-মুসলমানেব ভ্রাতৃ সম্পর্কে ফাটল ধবল। সেই ফাটল বন্ধ করা আব সম্ভব হয নি। পবিবর্তে বৃদ্ধিই পেতে থাকলো। দুটো ধর্ম সম্প্রদায কোন এক শয়তানী মন্ত্র শক্তিতে দুটো পৃথক জাতে পবিণত হোলো।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলাব প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন দুইবার। ১৯৪০ সালে তিনি বিখ্যাত লাহোব প্রস্তাব উত্থাপন কবেছিলেন। এই প্রস্তাবে ভাবতে মুসলমানদেব জন্যে একটা পৃথক রাষ্ট্রেব দাবী কবেছিলেন জিন্নাব ন্যায উগ্রপন্থী মুসলমান নেতাবা। কিন্তু হক সাহেব তাঁদেব সঙ্গে একমত হতে পাবেন নি। তিনি পাকিস্থান প্রস্তাবেব সর্বনাশা রূপ উপলব্ধি কবে এই প্রস্তাবেব বিবোধিতা কবেছিলেন। দেশভাগেব প্রশ্নে তাঁব সঙ্গে মুসলিম লীগের মত বিরোধ হয।

দেশভাগের পর অবশ্য তিনি পূর্ব-পাকিস্থানেই চলে যান। তারপব সেখানে তিনি

"কৃষক শ্রমিক পার্টি" নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। অতঃপর লীগ বিরোধী দলগুলিকে একত্রিত করে একটি যুক্তফ্রন্ট্ গঠন করেন। এই যুক্ত ফ্রন্টের কাছে নির্বাচনে লীগের পরাজয় ঘটে, এবং ১৯৫৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু "ফজলুল হক ভারতের চর" এই অভিযোগ তুলে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সবকার তাঁর মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দেয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিজগৃহে অন্তরিত করা হয়।

পরে ১৯৫৫ সালে তিনি পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। তারপর পূর্ব-পাকিস্থান-এর গভর্ণর করা হয় তাঁকে। ১৯৫৮ সালে গভর্ণবের পদ থেকেও তাঁকে অপসারিত করা হয়।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপকে কখনো কখনো সাম্প্রদায়িক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত সেগুলি তাঁর ভুল যে ভুলেব মাসুল দেশবাসীকে বহুবার দিতে হয়েছে। তবু বার বার মনে হয ব্যক্তিজীবনে হক সাহেব সম্পূর্ণ অসাম্প্রদাযিক ছিলেন। তাঁব প্রজাস্বত্ব আইন পাশ এবং ঋণসালিনসী বোর্ড গঠন সম্প্রদায নির্বিশেষে বাংলার কৃষকদের দুরবস্থা অনেকখানি লাঘব করেছিলো। নিজেকে তিনি খাটি বাঙালি এবং খাঁটি মুসলমান মনে কবতেন। ১৯৬২ সালেব ২৭শে এপ্রিল বাংলাব এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতার মৃত্যু হয়।

ফজলুল হক শিক্ষা সংস্কৃতিতে, ধনসম্পদে এবং জীবনের নানা ক্ষেত্রে উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন। অথচ অতি সাধারণ কৃষক শ্রমিকেব সঙ্গেও তাঁব সম্পর্ক কতো নিকট আত্মীয়ের মতো ছিলো। তাঁর সংস্পর্শে আসা লোককে বলতে শুনেছি, ববিশালেব কৃষকদেব এক জনসভায লুঙ্গি পরে উপস্থিত হযে তিনি ববিশালিযা ভাষায় বলেছিলেন আপনারা লুঙ্গি পবে এসেছেন। তাই আমিও এই সভায লুঙ্গি পবেই চলে এলাম। আমি আপনাদেবই লোক।

কৌতুক প্রিয়ও কম ছিলেন না হক সাহেব। জনৈক যুবক তাঁর কাছে চাকবিব উমেদার হয়ে গেলে তিনি তার কাছে জানতে চান কতো দূর লেখা পড়া করেছে সে। উত্তরে যুবকটি বলেছিলো, সে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়েছে। তাই শুনে হক সাহেব গম্ভীর হয়ে বলেন, তাহলে আমার মন্ত্রীসভায় কোন এক মন্ত্রীর চাকরি ছাড়া আর কী চাকবি দেবো তোমাকে।

আবার বলি, ব্যক্তি-জীবনে হকসাহেব অনেক উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন। কিন্তু মাঝে মধ্যেই মতিভ্রান্তি ঘটেছে এই অস্থির-মতি মানুষটির। তাই অভীষ্টে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি তাঁব পক্ষে।

হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দি

অবিভক্ত বাংলার আর একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন সহীদ সুহরাওয়ার্দি। সুহরাওয়ার্দিকে মুসলিম লীগপন্থী বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলা যায় না। তবু তাঁরই শাসন কাল চুড়ান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্কে কলঙ্কিত। আর সেইজন্যে কলকাতার ১৯৪৬

সালের ১৬ই জুলাই-এর ডাইরেক্ট একশান এবং তার আগুন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী ও অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ায় দায় স্বাভাবিক কারণেই পড়ে তাঁর ওপর। ভালো মানুষ ছিলেন তিনি সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা সঙ্কুল বাংলার শাসন যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ছিলো না তাঁব। সেই সুয়োগে সুযোগ-সন্ধানীরা তাঁর হাতে তামাক খেয়ে গেছে।

সহীদ সুহরাওয়ার্দির জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে মেদিনীপুরে। সেখান কার মাদ্রাসায় তাঁব শিক্ষা শুরু হয়। পরে ১৯১৩ সালে কলকাতার সেন্ট্‌জেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। তারপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এ এবং আইন পাশ করেন।

সুহরাওয়ার্দি সাহেব কর্মজীবন শুরু কবেন কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী হিসেবে। দেশবন্ধু যে সময়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মেযর ছিলেন সেই সময় সুহরাওয়ার্দি সাহেব ছিলেন ডেপুটি মেয়ব। পরে, ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল সুহরাওযার্দি সাহেব বাংলাব মন্ত্রী ছিলেন। আব ১৯৪৬ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলাব প্রধান মন্ত্রী হন। প্রসঙ্গতঃ তখনকার দিনে প্রার্দেশিক মুখ্য মন্ত্রীকে বলা হোতো প্রধান মন্ত্রী।

এই সমযের বিশেষ একটি ঘটনা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৪৬ সালে কলকাতাব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযেব ছাত্রগণ কোনও এক দাবী নিযে (দাবীব বিষযটি স্মবণ করতে পাবছি না) বাইটার্স অভিযান করে। পথে লাল বাজারের কাছে পুলিশ বাধা দিলে ছাত্রগণ পথেব ওপরে বসে পড়ে। এই অবস্থায পথের ওপর ছাত্রগণ প্রায দুই দিন অবস্থান কবে। জটিল এই পবিস্থিতির পবীক্ষায় ছাত্রগণকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে নেতৃত্ব দেন গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাসগুপ্ত মহাশয় এবং তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন সহীদ সুহবাওযার্দি।

সুহরাওয়ার্দি সাহেব বাংলা ভাগ করার পক্ষে ছিলেন না। তিনি এবং সুভাষ অগ্রজ শরৎ বসু চেয়েছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র। কে জানে, তেমন হলে তার কী পরিণাম হোতো।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্যে মহাত্মাগান্ধী ১৯৪৬ সালেব শেষার্ধে যখন নোয়াখালী জেলার গ্রামে গ্রামে পদপরিক্রমা শুরু করলেন, তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুহরাওয়ার্দি সাহেব মাঝে মাঝে গান্ধীজীর এই সম্প্রীতি পরিক্রমায় সাথী হয়েছেন।

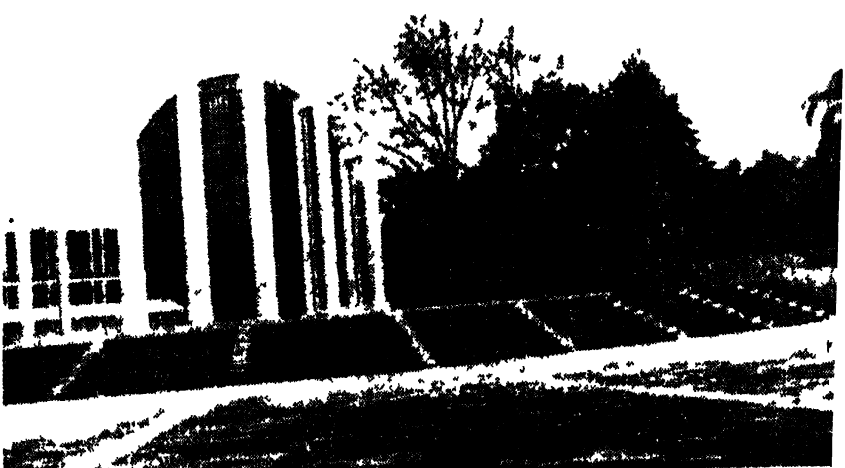
১৯৪৯ সালে সুহরাওয়ার্দি সাহেব পূর্ব-পাকিস্থানে চলে যান এবং ফজলুল হকের সঙ্গে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। এই জয়লাভে সুহরাওয়ার্দির যথেষ্ট অবদান ছিলো।

১৯৫৬ সালে সুহরাওয়ার্দি সাহেব পাকিস্থানেব প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু জেনাবেল আয়ুব খানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সুহরাওয়ার্দির রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে।

স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন

তৃতীয় নেতা, যাঁর মাজার রয়েছে রমনা ময়দানে অপর নেতৃদ্বয়ের পাশে, হলেন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন। স্যার নাজিমুদ্দিন প্রধানতঃ লীগপন্থী ছিলেন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি বলে মন্তব্য করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ। এই কারণেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের সমর্থন লাভ করলেও সমগ্র বাংলার জনসাধারণের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেন নি।

উপরিউক্ত তিন রাজনৈতিক নেতার মাজার রমনা ময়দান সংলগ্ন যে স্থানে রয়েছে তার বিপরীত দিকে একটু দূরে রয়েছে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি ফলক। সম্মুখে পাশাপাশি সমান্তরাল তিনটি শ্বেত দণ্ড ভূমির ওপর উলম্বভাবে বসানো। উপরের অংশে এই ফলক তিনটি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে। দণ্ড তিনটির পশ্চাতে রক্তিম গোলক, বোধ হয়, ভাষা আন্দোলনকারী শহীদ ছাত্রদের বুক থেকে ঝরা রক্তের প্রতীক।



ঢাকা ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের অভ্যুদয় হলে বাঙালি মুসলমান ছাত্রগণ আশা করেছিলেন তঁদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবাব পূর্ণ হবে। কিন্তু তাবপর একটি বছরও পূর্ণ হয় নি তখন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তখনকার পূর্ব-পাকিস্থনেব প্রধানমন্ত্রী স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা করলেন "পূর্ব-পাকিস্থানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে।" দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ছাত্রগণও সবিস্ময়ে দেখলেন, পশ্চিম পাকিস্থান প্রভুত্ব কবতে চায় পূর্ব-পাকিস্থানেব ওপব। পূর্ব-পাকিস্থান যেন সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম-পাকিস্থানের একটা কলোনী মাত্র, এবং বাঙালি নাগবিকেবা পশ্চিম-পাকিস্থানেব অধীনস্থ প্রজা।

ছাত্রগণ প্রতিবাদে ফেটে পড়লো তখনকাব ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা রুখতে ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর বহমান দেশের ছাত্রদেব এব প্রতিবাদে আন্দোলনে ঝাঁপিযে পড়াব ডাক দেন।

আন্দোলনেব তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে মুসলিম লীগ সরকাব ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫০ সাল এই দুই বৎসবেব মধ্যে অনেক বাব গ্রেপ্তাব কবে জেলে পাঠায় শেখ মুজিবুর বহমানকে। কিন্তু পীডন কবে আন্দোলন থামানো গেলো না। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাব প্রতি গভীব প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছাত্রগণকে আবো উত্তাল কবে তুললো। এই সময ১৯৫২ সালেব ২১শে ফেব্রুযাবী ছাত্রগণ মুসলিম লীগ সবকাবেব দমন মূলক নীতিব প্রতিবাদে এক মিছিলেব আযেজন কবে। সেই মিছিল যখন বমনা মযদানেব পার্শ্ববর্তী পথ অতিক্রম কবছিলো তখন সবকাব থেকে সেই মিছিলেব ওপব গুলি চালনাব আদেশ দেওযা হয। তাব ফলে অনেক তরুণ ছাত্র লুটিযে পড়ে মাটিতে। তাদেব তাজা বক্তে বাঙা হয়ে ওঠে রমনা মযদানেব মাটি।

কঠোর আঘাত হেনে নির্দয়, পাষাণ-হৃদয শাসকেবা ভেবেছিলো মাতৃভাষাব অধিকাব অর্জনে বাঙালির আন্দোলনকে তারা পিষে দিতে পাববে। কিন্তু জানা ছিলো না তাদেব, সে উর্দুকে বাংলা ভাষাব ওপর চাপিয়ে দিযে বাঙালির মাতৃভাষার অধিকাবকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলো তারা, সেই উর্দু ভাষাতেই আছে—

"রাত জিতনী ভি সঙ্গিন হোগি
সুবহ্ উত্নী ভি রঙিন হোগি।"

বিকেলে বীরেশ তার ছোট ভগ্নিপতির গাড়ি করে আমাকে নিয়ে গেলো উত্তরা''য়। পথে তুলে নিলো ঢাকার এক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী আলহাজ্ব ওহিদুর রহমানকে। 'উত্তরা' ঢাকা শহরের উত্তর দিকে তৈরি বিস্তীর্ণ এক সবকারী আবাসন প্রকল্প। এই প্রকল্প কলকাতার সল্টলেক অপেক্ষা আয়তনে অনেক বড়ো। বিশাল এক অঞ্চলকে অধিগ্রহণ করে বাংলাদেশেব সরকাব সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ঘটিয়েছে অঞ্চলটার। তারপর 'প্লট' করেছে। বিক্রি কবেছে বাংলাদেশের নাগরিকদের। 'প্লট' ক্রেতাবা নিজেদের রুচি ও প্লান অনুসারে বাড়ি বানাচ্ছে।

এই উত্তরাতেই বাড়ি বানিয়েছেন ডাঃ হাবিবুর রহমান। ডাঃ রহমান ধনী ব্যক্তি। তাঁর সম্পদের প্রকাশ তাঁর গৃহ পবিকল্পনায়, গৃহের উপকরণে, আসবাবপত্রে এবং অন্যান্য ধন সম্পদে। চিকিৎসা এবং বীমা কর্পোরেশন সংক্রান্ত বিষয়ে ডাঃ রহমানের সঙ্গে কাজ ছিলো বীরেশ ও আলহাজ ওহিদুর বহমানের।

আলহাজ ওহিদুর রহমানও খুবই ধনী ব্যবসায়ী। আবাব খুবই মুক্তমনা উদাব ব্যক্তি। আমার সঙ্গে সামান্য আলোচনার পর আমার প্রতি তাঁব যেন একটা অনুরাগের সৃষ্টি হোলো। তারপর জেদ ধবে বসলো আমাকে তাব বাড়ি নিয়ে যাবেই।

তাঁর আগ্রহকে ঠেলতে পারলাম না আমি। তাঁর বাড়িতে এলে তাঁর বেগম ক্যায়সাব সালেহীন অভ্যর্থনা কবলেন আমাদের। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার মাঝখানেই বেগম ক্যায়সাব সালেহীন বললেন আপনি আমার বাবার মতো। আমিও তাঁকে গ্রহণ করলাম আমার কন্যারূপে।

আলহাজ ওহিদুর রহমানেব বাড়ি থেকে বিদায় নেবাব সময হয়ে এলো। বিদায় চাইতেই বেগম ক্যায়সার সালেহীন বললেন, আপনি আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ কবেছেন। এটা যেন শুধু মুখের কথা না হয়। পবের বার ঢাকা এলে আপনাকে আপনাব এই মেয়ের বাড়িতেই উঠতে হবে কিন্তু।

জানি না, আবাব আমি কখনো ঢাকা যেতে পারবো কিনা। যদি আবার কখনো যেতে পারি তাহলে আমাব কন্যাসম ক্যায়সার সালেহীনের বাড়ি নিশ্চয়ই যাবো।

দুই বারে ছয় দিন ধরে দেখলাম ঢাকা শহরকে— বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে। পুরানো ঢাকাকে দেখেছি। দেখেছি আধুনিক ঢাকাকেও। দেখে মনে হয়েছে—

"কলকাতার মতো ঢাকা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার দান নয়। মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার দান। এর সর্বত্র আরব পারসিক শৈলীর মসজিদ ও ইমারত। যে দেশের রাজধানী সে দেশেরও শতকরা নব্বই জন মুসলমান। স্বাধীনতা বলতে প্রতিক্রিয়া শীলতার স্বাধীনতাও বোঝায়।" "বাংলাদেশে"—অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃষ্ঠা ২৪ (১ম সংস্করণ)

কে জানে! "স্বাধীনতা বলতে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতাও বোঝায়" কিনা। যদি বোঝায়, তাহলে শুধু ঢাকা কেন কলকাতা দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই সর্বত্রই তো সেই প্রতিক্রিয়াশীলতার স্বাধীনতা মাথাচারা দিয়ে উঠতে চাইছে!

আমার ঢাকা দেখা শেষ হোলো এবারের মতো। আজ রাতেই যশোর যাবার বাস ধরলাম। বাস অবশ্য ছাড়লো রাত দশটার বদলে রাত দুটোয়। বীরেশ সেই রাত দুটো পর্যন্ত কাটালো আমার সঙ্গে যাত্রী শালায়। বীরেশ বাংলাদেশ দেখাতে কেন আমার জন্যে এতো করলো কে জানে। বাইরে সে তো আমার কেউ নয়! কিন্তু অন্তরে!

———☆———

বিদায় বাংলাদেশ

আমার বাংলাদেশ দর্শন শেষ হোলো। ঠিক তিবিশ দিন ধরে ঘুরে বেড়ালাম বাংলাদেশেব উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম। প্রায সমগ্র বাংলাদেশ। কতো মানুষের সংস্পর্শে এলাম। কতো লোকের সঙ্গেই না মেলামেশা করলাম। আমার মতো তাবাও বাঙালি আমার আপন লোক। তবু কতো অজানা, কতো বিচিত্র। দেশটার মাঠ-ঘাট, নদীনালা পাহাড়-পর্বতই কি কম বৈচিত্র্যময় ! আর ইতিহাস! বাংলাব উদার প্রকৃতির কোলে মানব সভ্যতার সেই কোন্ প্রত্যুষে অন-আর্য মানুযেরা এসে ঘর বেঁধেছিলো। তার অনেক পরে, সভ্যতাব প্রভাত-সূর্য তখন ঝলমল করছে আকাশে, আর্যরা এসে মিলিত হোলো অন্-আর্যদের সঙ্গে। নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হোলো, যে সভ্যতা ভাবতীয় হযেও একান্তভাবে বাংলার। সেই সভ্যতাব অবশেষ ছড়ানো আছে সাবা বাংলাব মাঠে-গ্রামে-শহবে। বাংলার নিজস্ব এই সভ্যতাকে দেখাব চেষ্টা করেছি। বোঝার চেষ্টা কবেছি। যতোটুকু বুঝেছি, তাতে আমার সারাটা মন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। সেই তৃপ্তি নিযে ফিবে চলেছি বাংলাদেশেব ওপারে পশ্চিমবাংলায়।

রাতের বাস। ছাড়ে ঢাকা থেকে বাত দশটায। তাবপব একটানা দৌড়ে বেনাপোলে এসে পৌঁছায ভোর চাবটেয। কিন্তু সেই কথায় আছে না, ছ'টাব 'টেরেন' ক'টায় ছাড়ে গো! আমাবও হোলো সেই দশা। যে বাসেব ঢাকা ছাড়ার কথা রাত দশটায় সেই বাস স্ট্যান্ডে এসে হাজিব হোলো ইংরেজি মতে পরদিন। বাত একটায।

বাস এসে হাজিব হতেই ঝিমিযে পড়া বাসস্ট্যান্ডে সাড়া পড়ে গেলো। মাল জমা দেওয়া, তার রসিদ নেওয়া, ঘুমে ঢুলতে থাকা ছেলেমেযেদেব হাত ধবে টেনে বাসে তোলা, যাত্রী-যাত্রিনীদের বাসে ওঠ, এইসব পাট খানিক চললো। পাট চুকলে, কন্ডাক্টর বাসের দরজা বন্ধ কবতে যাবে, এমন সময় বীবেশ উঠে এলো বাসে। আমি ঠিক ঠিক বসেছি কিনা দেখলো। তারপর বললো, যেতে আপনাব খুব কষ্ট হবে। আর বাড়িতে পৌঁছেই খবর দেবেন যেন। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে. ভালো করে কথা বলতেও পারছিনা। তবু বীরেশকে হাসি মুখ দেখালাম। বীরেশ নেমে যেতেই বাস ছেড়ে দিলো।

বারাবার একই প্রশ্ন করেছি নিজেকে। বীরেশ এবং মোশব্বফ্ সাহেব আমার কে? ঝর্ণাধারা এবং সুহাসিনীদির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক! আর যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজের তরুণ অধ্যাপক ছোলজার রহমান? জন্ম অথবা বৈবাহিক কোন সূত্রেই তাঁরা আমার আত্মীয় নন। এই তো মাস দুই আগেও তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়টুকুও ছিলো না। তবু তাঁদের প্রত্যেকে আমার আত্মীয়, আমার পরম আত্মীয়। যে টান হৃদয়কে টেনে আনে হৃদয়েব কাছে, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন ঘটায়, সেই টানকেই বোধ হয় আত্মীয়তা বলে।

বাংলাদেশের হৃদয়-বীণা

মাথাটা সোজা করে রাখতে পারছি না। বাসের খানিক দুলুনি খেয়ে ঢুলুনিটাও এসে পড়লো। হেলানো সিটে অবসন্ন দেহটা যেন আপনা থেকেই এলিয়ে পড়লো। মনটাও যেন ধীরে ধীরে চেতনার সীমা পার হয়ে গেলো।

চেতনার সীমার ওপারে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। ধীরে ধীরে মনে হোলো আমি একটা অজানা-অচেনা জগতে এসে পড়েছি। সেখানকার অদ্ভুত একটা পথ ধরে হেঁটে চলেছি। সেই পথের একদিকে বিস্তৃত শ্যামল মাঠ। আকাশের নীলের সঙ্গে মিশে সেই মাঠ অপরূপ এক রূপ ধারণ করেছে। রাস্তার অপর পাশটা কুয়াসায় ঝাপসা। তার ওপাশে কী আছে দেখার উপায় নেই। অবাক বিস্ময়ে সেই কুয়াসার পানে চেয়ে চেয়ে চলেছি যদি ওপারের রহস্যের কোন উদঘাটন হয় ! কিন্তু চলেছি কোথায় কে জানে।

খানিক যেতেই দেখি, অনেকখানি বড়ো একটা গেট। একেবারে ফাঁকা। জনমানব কেউ কোথাও নেই। ঢুকে পড়বো না কি গেট দিয়ে রহস্যের রাজ্যে। কী মনে হোলো, এগিয়ে গেলাম ফাঁকা গেটটার পানে। কাছাকাছি হতেই সভয়ে দেখি যমদূত প্রায় এক দ্বারপাল। কই, এতোক্ষণ তো দেখিনি ওকে । দ্বারপাল বললো না কিছুই। শুধু বাঁহাতের তালুর উল্টো পিঠ নেড়ে তফাৎ যাওয়ার ইঙ্গিত করলো। ভয় পেয়ে আমি পিছন ফিরেছি কি ফিরিনি। অমনি শুনি জলদ-গম্ভীর কণ্ঠের এক আদেশ—ফিরিয়া আইস।

ফিরে দাঁড়ালাম। কোথায় সেই যমদূত ! তার স্থানে দাঁড়িয়ে—কে উনি ! অতি পরিচিত ওঁর ঐ আকৃতির প্রতিকৃতি কতোবার দেখেছি। পরনে আজানুলম্বিত চাপকান। মাথায় উনবিংশ শতকের আভিজাত বাঙালির উষ্ণীষ। উন্নত নাসা, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বাঁহাতে বুকের ওপর চেপে ধরা খানদুই বই। ওঁর এই প্রতিকৃতি কোথায় দেখেছি।

—কোথা হইতে আসিতেছ ? প্রশ্নটি শুনেই বিস্মৃতির সকল কুয়াসা ভেদ করে বেরিয়ে এলেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রাণিপাত করে বললাম, আমি বাংলাদেশ দর্শন করে এলাম, হে সাহিত্য সম্রাট !

—বাংলাদেশ। বঙ্গভূমি! আমার সেই সুবর্ণময়ী বঙ্গভূমি। এই পর্যন্ত বলেই মুদিতনেত্রে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র যুক্ত করে বলতে থাকলেন, "চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজা—দশদিক— দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শক্তিবিমর্দ্দিত, বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত .... দিগভূজা, নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ — আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

সাহিত্য-সম্রাটের উদাত্ত কণ্ঠে বঙ্গপ্রতিমার এই বর্ণনা শুনতে শুনতে আমার কর-দ্বয়ও যুক্ত হয়ে এসেছিলো। অশ্রুবাষ্পাকুল চক্ষুদ্বয়ও মুদিত হয়ে এসেছিলো। বর্ণনা শেষ হতেই

আমার চোখের পাতা খুলে গেলো। চেয়ে দেখি কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র আর কোথায়-বা সেই বিশাল গেট। সমস্তই নিবিড় কুয়াসায় আচ্ছন্ন।

আগের সেই পথটা ধরে আমি আবার অগ্রসর হতে শুরু করলাম। আমার সময় জ্ঞান বিলুপ্ত। আমি কতোক্ষণ ধরে হাঁটলাম বলতে পারি না। হঠাৎ দেখি দূরে, বহুদূরে, অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যেন আকাশ জুড়ে আঁকা ছবি একখানি, রবীন্দ্রনাথ। দূরে দাঁড়িয়ে দূর থেকেই প্রণাম করলাম বিশ্বকবিকে। তখন কেমন যেন অদ্ভুত একটা অনুভূতি জুড়ে বসলো আমার সমস্ত হৃদয়কে। মনে হোলো কবির না-বলা কথাগুলি আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সেকথা বাইরের নয়, হৃদয়ের। আকাশের ন্যায় বৃহৎ হৃদয় থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে ক্ষুদ্র এই হৃদয়ে। আকাশের বৃষ্টি যেমন পূর্ণ করে ধরণীর গোষ্পদকে।

কবি ভর্ৎসনার স্বরে বলে উঠলেন, কার্জনের খণ্ডিত বঙ্গকে আবার অখণ্ড করার কী বিপুল সাধনা করেছিলেন তখনকার দেশজোড়া মানুষ। সেই বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছিলো। আমি নিজেও তখন মসী ছেড়ে অসি ধরেছিলাম। সরকার শেষ পর্যন্ত পশ্চাদ্-অপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলো। অবশেষে এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু নানা রঙ্গে ভরে উঠেছিলো। নতুন অখণ্ড বঙ্গদেশ হয়ে উঠেছিলো কেবল ভারতের নয়, সারা বিশ্বের অক্ষয় সম্পদ। আর সেই অক্ষয় সম্পদের ক্ষয় সাধন করলে তোমরা !

বললাম, অনেক বিচ্ছেদকামী ইস্‌লামী তখন জিগির তুললো তারা ভারতীয় নয়। তারা আলাদা জাত। তাই তারা ভারতের থেকে আলাদা হয়ে যেতে চায়। ভারতকে ভাগ করে পাকিস্থান নামে আলাদা দেশ চায় তারা। আর অন্য নেতারাও তাদের দাবীতে সায় দিলেন।

আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন কবি। বললেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলো ক্রীতদাসপন্থী দক্ষিণের রাজ্যগুলো। কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন তাদের দাবী মেনে নেননি। তার পরিবর্তে গৃহযুদ্ধকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করেছিলেন। সেই ঝুঁকি নেবার সাহস ও দৃঢ়তা আব্রাহাম লিঙ্কনের ছিলো। তাই আজও পর্যন্ত তিনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে বিরাজ করছেন মানব হৃদয়ে।

ভারতেও এসেছিলেন তেমনি রাষ্ট্রনেতা। তাঁর ন্যায় স্বার্থত্যাগী সাহসী বীর জগতে বোধ হয় আর আসেননি। তবু সফল হননি তিনি। তার কারণ সারা ভারতে তখন এমন একজনও ছিলেন না যিনি তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারতেন। ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে সত্যি। কিন্তু কোন ভারতকে ছেড়ে গেছে ! কদর্য-চরিত্রের মানুষে ভরা কোন ভারতবর্ষকে। কথাগুলো বলতে বলতে কবির মুখ হতাশার অন্ধকারে কালো হয়ে উঠলো। কিন্তু হতাশা তো কবির জন্যে নয়। মানুষের প্রতি বিশ্বাসও হারাননি কখনো। তাই ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কবির আয়ত আঁখি দুটি।

কবি যা বলতে চাইলেন আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে। মনে হোলো,

কবি বলছেন, আলাদা ঠাঁই-এ থাকলেও ভাই ভাই-ই থাকে। বরং তখন ভ্রাতৃপ্রেম নিবিড় হয়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত কাছে কাছে থাকলে পরস্পরের দোষ ত্রটিগুলো বড়ো বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে পবস্পরের চোখে। তখন ঝগড়া-ঝাঁটি বাড়ে। ঐ যে কথায় বলে না ঘটি-বাটি একসঙ্গে থাকলে ঠুং-ঠাং লেগেই থাকে !

অপরদিকে, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই থাকলে মনের কল্পনা মাধুরি মিশিয়ে ভ্রাতৃপ্রেমকে নির্মল করে তোলে, স্বচ্ছ করে তোলে। ভাই-এর প্রতি ভাই-এর স্নেহ-ভালোবাসা গাঢ় হয়ে ওঠে।

সত্যিই তো। কবির অন্তরের এই কথাটাই তো প্রত্যক্ষ করে এলাম সারা বাংলাদেশে। কলকাতা থেকে এসেছি শুনে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলার সে কী আকুতি। বাংলাদেশের অপর পারে যে আর একটা বাংলা আছে সে কথাটা যেন মনেই ছিলো না তাদেব! আমাকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো তাদের কথা। তখন সেই বাঙালিরা কেমন আছে জানার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলো তাদের মনে। শুধোয়, সেই বাঙালিরা কি বাংলাদেশের বাঙালিদের কথা ভাবে!

ভাবে না ! বলেছি, তোমরা আর আমরা যে ভাই ভাই।

সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে বিভেদ দেখা দিয়ে ছিলো, যা আমাদের মধ্যে দুস্তব একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছিলো। সেই গোঁড়ামির বোধ হয় এখন বিদায় নেবার পালা এসেছে। আজ আমরা উভয়েই স্থির চিত্তে বুঝতে চাইছি, মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। আব ধর্মের কথা যদি উঠলো তো বলি, ধর্মাচরণের পথটুকু দেশকাল পাত্র ভেদে আলাদা হতে পারে। কিন্তু সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বমানুষের ধর্ম এক। এই ব্যাপারটুকু বুঝতে আমাদের কেন এতো দেরি হচ্ছে ভাই। আফ্গানিস্থানেব চমকপ্রদ একটা ঘটনার উল্লেখ কবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" প্রবন্ধে মানব ধর্মের সুন্দব এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। উল্লেখ কবি দৃষ্টান্তটির।

"কয়েক বৎসর পূর্বে লন্ডনের টাইমস্ পত্রে একটি সংবাদ বেরিয়েছিলো, আমেরিকাব নেশন পত্র থেকে তার বিবরণ পেয়েছি। বায়ুপোতে চড়ে ব্রিটিশ বায়ুনাবিক সৈন্য আফ্গানিস্তানে মাহ্মুদ্ গ্রাম ধ্বংস করতে লেগেছিলো ; শতঘ্নী বর্ষিণী একটা বায়ুতরী বিকল হয়ে গ্রামের মাঝখানে গেল পড়ে। একজন আফ্গান মেয়ে নাবিকদের নিয়ে গেল নিকটবর্তী গুহার মধ্যে। একজন মালিক তাদের রক্ষার জন্যে গুহার দ্বার আগলিয়ে বইল। চল্লিশজন ছুরি আস্ফালন করে তাদের আক্রমণ করতে উদ্যত, মালিক তাদের ঠেকিয়ে রাখলে। তখনো উপর থেকে বোমা পড়ছে, ভিড়ের লোক ঠেলাঠেলি করছে গুহায় আশ্রয় নেবার জন্যে। নিকটবর্তী স্থানের অন্য কয়েকজন মালিক এবং একজন মোল্লা এদের আনুকুল্যে প্রবৃত্ত হল। মেয়েরা কেউ কেউ নিলে এদের আহারের ভার। অবশেষে কিছু দিন পরে মাহ্মুদের ছদ্মবেশ পরিয়ে এরা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।

"এই ঘটনার মধ্যে মানব স্বভাবের দুই বিপরীত দিক চূড়ান্তভাবেই দেখা দিয়েছে। এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণে দেখা যায় মানুষের শক্তির আশ্চর্য সমৃদ্ধি, ভূতল থেকে নভস্তল পর্যন্ত তার সশস্ত্র বাহুর বিপুল বিস্তার। আবার হননে-প্রবৃত্ত শত্রুকে ক্ষমা করে তাকে রক্ষা করতে পারল, মানুষের এই আর-এক পরিচয়। শত্রু-হননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীব ধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে, "শত্রুকে ক্ষমা করো।" একথাটা জীব ধর্মের হানিকর, কিন্তু মানব 'ধর্মের উৎকর্ষ লক্ষণ।"

এক-সময় প্রবল জীবধর্মের বশবর্তী হযে উভয় বঙ্গের আমরা বিভেদ-সৃষ্টিতে মেতে উঠেছিলাম। আজ অর্ধশতাব্দী পরে আমবা আমাদের ভুল ধরতে পেরেছি। আজ উভয বঙ্গের মানুষের মধ্যে যেন মানুষের ধর্ম প্রত্যক্ষ করছি।

ঢাকাব মাঠে মিনি-ওযার্ল্ড কাপের খেলায় ক্রিকেট খেলোয়াব সৌবভ গাঙ্গুলীকে নিযে সে কী মাতামতি ! সৌরভ ঢাকার নয। সৌরভ ইসলাম ধর্মাবলম্বীও নয়। কিন্তু সে যে বাঙ্গালি। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়ার হওয়ার গৌরব প্রত্যক্ষ করতে চায় বাঙালিরা। তাই সৌরভ বাঙালির ঘরেব ছেলে হওয়ার আদব পাচ্ছে সেখানে।

নোবেল পুবস্কার বিজয়ী অমর্ত্য সেন কবে কোন্ ছোটকালে বাংলাদেশের কোন্ একগ্রামে মানুষ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ দলে দলে সেই বাড়িটি দেখতে যাচ্ছে। অমর্ত্য সেন হিন্দু না মুসলমান, বৌদ্ধ না খ্রীস্টান সে প্রশ্ন অবান্তর। তিনি বাঙালি, আমাদের ঘরের ছেলে। তাই বাঙালি মাত্রেই মনে জ্ঞানদাসের ভাবখানি সর্দা গুঞ্জরিত—

বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী আমি
রূপসী তোমাব রূপে।"

ধর্মেব বহিরাবরণ ভেদ কবে অন্তরেব নিত্য ধর্মকে বাঙালি আবিষ্কার করছে ধীরে ধীবে।

যশোরেব মাইকেল মদুসূদন কলেজের তরুণ অধ্যাপক মোঃ ছোল্‌জার রহমান এবং অ. ক. ম. খালিলুর রহমান, কালিয়ার বালিকা বিদ্যালযেব প্রধান শিক্ষকমশাই, মধুমতির খেয়াঘাটের পথে অপরিচিতা বোরখা-ঢাকা আমার সেই মেয়েটি, কুষ্টিয়ার লালন একাডেমির সম্পাদক মিয়া মোঃ রেজাউল হক এবং মোঃ তাইজাল আলী খান শিলাইদহ কুঠি-বাড়ির মালী আজীদ ভাই আমার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যবহারে যে গভীব আত্মীয়তা প্রকাশ করেছেন তার তুলনা কোথায় পাবো ! ঢাকার মোশার্‌রফ্ হোসেন সাহেব এবং বীবেশের তো তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার ! নোয়াখালীর গান্ধী আশ্রমের ঝর্ণাধারা এবং শ্রীহট্টের শ্রদ্ধেয়া সুহাসিনীদির নির্মল স্নেহ-ভালোবাসা আর কোথাও পাবো কিনা জানা নেই আমার। এইসব মানুষের কাছ থেকে পাওয়া দুর্লভ ভ্রাতৃপ্রেম আমার অন্তরে চির অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইলো।

—অ মোশয় ! নামবেন না? চেয়ে দেখি চোখের সামনে বাস-কন্ডাক্টর ভাই দাঁড়িয়ে। ওদিকে নীচের দিগন্তরেখা থেকে আকাশের গা-বেয়ে অনেক উপরে উঠে এসেছেন সূর্যদেব।

সারা আকাশ, সারা দেশ ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদে। কন্ডাক্টর ভাই আবার বললো, আমরা বেনাপোলে আসে পড়ছি।

বেনাপোলে যে এসে পড়েছি সে সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইলো না। স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে নেমে এলাম বাস থেকে। প্রথম গতির মতো শেষ গতিও রিকসা। অতএব রিকসা ধরেই এলাম বাংলাদেশ-ভারত বর্ডারে। বর্ডারের কৃত্য শেষ হতে দেরি হোলো না। তারপর পদব্রজে যাত্রা করলাম ভারতের উদ্দেশে।

খানিক হাঁটতেই সেই সীমারেখাটি যার পূর্বধারে বাংলাদেশ আর পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। লাইনটি পার হতে ডানপা তুলতে বিচিত্র একধরনের রোমাঞ্চ বোধ করলাম। আমার একপা বাংলা দেশে তো আর এক পা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। পায়ের পানে চেয়ে দেখি দু-পায়েই একই মাটি। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় জুড়ে মানুষের জয়ের একটা উল্লাস জেগে উঠলো। বললাম, হে রাজনীতির বিধান কর্তাগণ! তোমরা দেশের রাজনৈতিক বিভাগটুকুই করতে পেরেছো। কিন্তু মা মাটি আর মাতৃভাষা আমাদের বেঁধে রেখেছে একসূত্রে।

———☆———